FINAL REPORT

2012

UGC SPONSORED MINOR RESEARCH PROJECT
NO. F.5-206/2010-11 (MRP/NERO/

TITLE

হাংরি আন্দোলনের ইতিহাস ও তার বহুমুখী অধ্যয়ন

HISTORY OF HUNGRY MOVEMENT AND A STUDY OF ITS DIFFERENT FACETS

Principal Investigator

DR. BISHNU CHANDRA DEY
ASSISTANT PROFESSOR & HOD OF BENGALI
NABINCHANDRA COLLEGE, BADARPUR
DIST:- KARIMGANJ, PIN-788806, ASSAM

NABIN CHANDRA COLLEGE LIBRARY
BADARPUR KARIMGANJ

FINAL REPORT
2012

UGC SPONSORED MINOR RESEARCH PROJECT
NO. F.5-206/2010-11 (MRP/NERO)/5269

TITLE

হাংরি আন্দোলনের ইতিহাস ও তার বহুমুখী অধ্যয়ন

HISTORY OF HUNGRY MOVEMENT AND A STUDY OF ITS DIFFERENT FACETS

Principal Investigator
DR. BISHNU CHANDRA DEY
ASSISTANT PROFESSOR & HOD OF BENGALI
NABINCHANDRA COLLEGE, BADARPUR
DIST - KARIMGANJ, PIN-788 806, ASSAM.

সূচি

* ভূমিকা : i

* প্রথম অধ্যায়
  হাংরি আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্ব ও তার মজাগুলো। : ১

* দ্বিতীয় অধ্যায়
  কলকাতায় হাংরি আন্দোলনের প্রচার ও প্রসার। : ২১

* তৃতীয় অধ্যায়
  পৃথিবীব্যাপী হাংরি আন্দোলনের দামামা। : ৪১

* চতুর্থ অধ্যায়
  হাংরি আন্দোলন সমাপ্তির কারণ গাথা। : ৫৯

* পঞ্চম অধ্যায়
  হাংরি আন্দোলনের বহুচর্চিত সাহিত্যের বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন। : ৮৯

* উপসংহার : ১৪১

* ঋণ স্বীকার : ১৪৪

* সংযোজন : ১৫২
  হাংরি আন্দোলনের সময় কালীন ছবি

ভূমিকা

হাংরি আন্দোলন বললে প্রথমে যে নমস্য ব্যক্তিটির নাম আমাদের মানসপটে ভেসে ওঠে তিনি মলয় রায়চৌধুরী। কেননা তিনি হাংরি আন্দোলনের স্রষ্টা। 'দ্রোহপুরুষ'। 'কৃষ্টিদোগলা'। 'সাংস্কৃতিক জারজ'। 'পেরিফেরির জীব'। 'ছোটলোক'। 'আউটসাইডার'। মাত্র বাইশ বছর বয়সে হাংরি আন্দোলন নামক পৃথিবী কাঁপানো সাহিত্যিক পালাবদলের নায়ক তিনি। প্রতিষ্ঠানের বিরোধীতা করার সাহস ও শক্তি সংগ্রহ করে সঙ্গি হিসেবে সমীর রায়চৌধুরী, শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং দেবী রায়কে আপন মেধায় সংযুক্ত করে বাংলা সাহিত্যের নান্দনিক চিন্তাবিশ্বকে দুমড়ে-মুসড়ে দিয়েছিলেন। তাই ঝাকে ঝাকে যুবক কবি-সাহিত্যিক মলয় রায়চৌধুরীর মেধাকুণ্ডে পবিত্র হয়ে বাংলা সাহিত্যকে নান্দনিক কারাগার থেকে মুক্তি দেবার বাসনা নিয়ে হাংরি আন্দোলনের শরিক হয়েছিলেন।

হাংরি আন্দোলন চলেছিল বিয়াল্লিশ মাস (১৯৬১-র নভেম্বর থেকে ৩ মে ১৯৬৫)। সংখ্যাহীন অনেকগুলো ইশতিহার প্রকাশিত হয় এই সময়টাতে। ইশতিহারগুলোতে কখনও কবিতা বিষয়ক নিজস্ব ভাবনার প্রকাশ থাকত, কখনও ধর্ম, রাজনীতি, জীবন, উদ্দেশ্য, ছোটগল্প, স্বাধীনতা, অশ্লীলতা, আবার কখনও কবিতা, গল্প ইত্যাদি প্রকাশিত হত। কখনও সাহিত্য ছাড়া মজার মজার কিছু কাণ্ডও তাঁরা করতেন। এইজন্য হাংরি আন্দোলন হয়ে ওঠে কৌতুকের বিষয়। তাঁরা কখন কী করছেন, এর প্রতি দৃষ্টি থাকত সাধারণ মানুষ সহ বুদ্ধিজীবী, সরকারী আমলা, রাজনেতা, সংস্কৃতি-প্রেমী সকলের। অ্যালেন গিন্সবার্গ ভারতবর্ষে এলে তিনিও হাংরি আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হন।

হাংরি আন্দোলন-এর ফলে বাংলা সাহিত্যে পালাবদল ঘটে ছিল নিঃসন্দেহে। অনেকে স্বীকার করুন কিংবা না করুন বাংলা সাহিত্যে এমন একটা আন্দোলনের প্রয়োজন ছিল বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নিজেও স্বীকার করেছেন— বাংলা সাহিত্যে এমন একটা আন্দোলনের প্রয়োজন ছিল। গিন্সবার্গের মতে— হাংরি আন্দোলন পৃথিবীর সমস্ত আন্দোলন থেকে স্বতন্ত্র। আমরা লক্ষ্য করি হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গেই 'কৃত্তিবাস' আন্দোলন থেকে স্বতন্ত্র। আমরা লক্ষ্য করি হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গেই 'কৃত্তিবাস' গোষ্ঠীর লেখার ধরন পাল্টে যায়। শুধু 'কৃত্তিবাস' গোষ্ঠীই নয়, সমস্ত প্রতিষ্ঠিত লেখকদের লেখাতেই এক নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়। ঔপনিবেশকে সাহিত্য থেকে দূরে সরিয়ে দেবার জোর চেষ্টা চলে। আধুনিকতা নামক 'ভূষিমাল'-এ মানুষের বিশ্বাস কমে যায়। উত্তর-আধুনিকতার প্রতি বোদ্ধা লেখক গোষ্ঠী আকৃষ্ট হন। বিশ্বায়নের মানদণ্ডে বাংলা সাহিত্যকে বিচার করতে হলে উত্তর আধুনিকতার ভূমিকা সবচেয়ে মূল্যবান। যা হাংরি আন্দোলনের দান।

বাংলা সাহিত্যে হাংরি একটি স্বতন্ত্র আন্দোলন। কারণ,আন্দোলন অর্থে আমরা যা বুঝি তা বিংশ শতাব্দীর ষাট পূর্ববর্তী সময়ে পরিলক্ষিত হয়নি। দু-একটি ক্ষেত্রে একটু আলাদা ধরনের কবিতা লেখার চেষ্টা হলেও হাংরিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আন্দোলন। এই আন্দোলনের ফলে বাংলা সাহিত্যে পদ্য গদ্য সব ক্ষেত্রেই পালাবদল সংগঠিত হয়। হাংরি আন্দোলনের উদ্দেশ্যই ছিল বাংলা সাহিত্যে পালাবদল। যাঁরা এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের সামনে ছিল নগ্ন সমাজের বাস্তব ছবি। সত্যসন্ধানী এই উঠতি যুবকরা সমাজকে উপলব্ধি করে প্রত্যক্ষ সত্যকে কবিতা-সাহিত্যের মাধ্যমে তথ্য করে দেখাতে সচেষ্ট ছিলেন। এঁদের বলার ভঙ্গি ছিল— রাগি। এঁরা ছিল মেধাবী। ধাক্কা দিয়ে কথা বলা এঁদের স্বভাবগত দোষ। এঁরা কোনো প্রতিষ্ঠানের ছত্র-ছায়ায় নিজেদেরকে সুখী করতে নিরুৎসাহ। কারণ, এঁরা দেখেছেন— মন্বন্তর, দেখেছেন— দেশভাগ, দেখেছেন— দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলে মানুষের দুরবস্থা, ইত্যাদি। এঁরা ক্ষুৎকাতর সম্প্রদায়। এঁদের ক্ষুধা দেহের এবং মনের।

হাংরি আন্দোলনকারীরা 'কাব্য এবং জীবনে যুগপৎ সর্বরকমে অঘোরপন্থী মনোভাবাপন্ন'। এঁদেরকে নিয়ে কলকাতায় অনেক জলঘোলা হয়েছে। লোকেরা এই যুবক কবি সম্প্রদায়কে এক রকম ভয় পেতেন। আবার মজাও করতেন। হাংরি কবি-গদ্যকাররা তাই তথাকথিত সাহিত্যের মধ্যমণিদের কু-দৃষ্টির সম্মুখীন হয়ে জেল-হাজত পর্যন্ত ভোগ করেন। তাঁদের কয়েকজন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মামলায় অ্যারেস্ট হন। অশ্লীল কাব্য রচয়িতা হিসেবে আখ্যায়িত করে মলয় রায়চৌধুরী সহ তাঁর কয়েকজন শরিক আন্দোলনকারীকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করান হয়। এভাবে হাংরি আন্দোলনকে স্থিমিত করার চেষ্টা চলে অহরহ। এতে হাংরি আন্দোলন আরো প্রচার লাভ করে। ভারত ছাড়িয়ে এই আন্দোলনের চিৎকার অস্ট্রেলিয়া, ইংলণ্ড, আমেরিকা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আমেরিকা থেকে অ্যালেন গিন্সবার্গ চিঠি লিখে ভারতীয় সংসদ পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলেন। কিন্তু সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে দেখা যায়, হাংরি আন্দোলনের পরই বাংলা সাহিত্যে উপমা, রূপক, আঙ্গিক, শব্দ চয়ন, বাক্য গঠন ইত্যাদি ক্ষেত্রে একটা নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে।

হাংরি আন্দোলনের পূর্বে বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে আমরা কয়েকজন মাত্র কবিকে লক্ষ্য করি, কিন্তু ষাটের দশকে এসে পৌঁছতেই অসংখ্য কবির জন্ম হল। এর মূলে রয়েছে হাংরি আন্দোলনের মেধাবী চিন্তার প্রকাশ। সব ভালো কবি। নতুন বিষয় নিয়ে নতুন চিন্তা ভাবনায় এঁরা মেতে উঠলেন। পরবর্তীতে জন্ম হল আরও অনেকগুলো আন্দোলনের। নতুন স্পেস। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন বর্তমান ভারতবর্ষে অসংখ্য স্পেস। যেমন— দলিত একটা স্পেস, আদিবাসী একটা স্পেস, মারাঠা একটা স্পেস। প্রত্যেকটা শব্দে তৈরি হল একটা স্পেস। কিন্তু অখণ্ড ভারতবর্ষ খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল। সাহিত্যের মধ্যমণি বলে একজনের মাথায় আর মুকুট রইল না। হাংরি আন্দোলন সেই আধিপত্য বা একনায়কত্বের মুকুট দিল পদদলিত করে। কারণ এঁরা এসেছেন ছোটলোকী জীবন-যাপনের আউটসাইডার হিসেবে। হাংরি আন্দোলনকারীরা কলকাতা কেন্দ্রিক বাংলা কবিতার দিন শেষ করে দিয়েছেন অল্প দিনেই। স্বপ্নময় জগৎ থেকে বাস্তব জগতে নামিয়ে এনেছেন নান্দনিক চিন্তাপুষ্ট স্বপ্নাচারী কবিকুলকে।

বাংলা সাহিত্যে হাংরি একটি স্বতন্ত্র আন্দোলন। কারণ,আন্দোলন অর্থে আমরা যা বুঝি তা বিংশ শতাব্দীর ষাট পূর্ববর্তী সময়ে পরিলক্ষিত হয়নি। দু-একটি ক্ষেত্রে একটু আলাদা ধরনের কবিতা লেখার চেষ্টা হলেও হাংরিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ আন্দোলন। এই আন্দোলনের ফলে বাংলা সাহিত্যে পদ্য গদ্য সব ক্ষেত্রেই পালাবদল সংগঠিত হয়। হাংরি আন্দোলনের উদ্দেশ্যই ছিল বাংলা সাহিত্যে পালাবদল। যাঁরা এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের সামনে ছিল নগ্ন সমাজের বাস্তব ছবি। সত্যসন্ধানী এই উঠতি যুবকরা সমাজকে উপলব্ধি করে প্রত্যক্ষ সত্যকে কবিতা-সাহিত্যের মাধ্যমে তথ্য করে দেখাতে সচেষ্ট ছিলেন। এঁদের বলার ভঙ্গি ছিল— রাগি। এঁরা ছিল মেধাবী। ধাক্কা দিয়ে কথা বলা এঁদের স্বভাবগত দোষ। এঁরা কোনো প্রতিষ্ঠানের ছত্র-ছায়ায় নিজেদেরকে সুখী করতে নিরুৎসাহ। কারণ, এঁরা দেখেছেন— মন্বন্তর, দেখেছেন— দেশভাগ, দেখেছেন— দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলে মানুষের দুরবস্থা, ইত্যাদি। এঁরা ক্ষুৎকাতর সম্প্রদায়। এঁদের ক্ষুধা দেহের এবং মনের।

হাংরি আন্দোলনকারীরা 'কাব্য এবং জীবনে যুগপৎ সর্বরকমে অঘোরপন্থী মনোভাবাপন্ন'। এঁদেরকে নিয়ে কলকাতায় অনেক জলঘোলা হয়েছে। লোকেরা এই যুবক কবি সম্প্রদায়কে এক রকম ভয় পেতেন। আবার মজাও করতেন। হাংরি কবি-গদ্যকাররা তাই তথাকথিত সাহিত্যের মধ্যমণিদের কু-দৃষ্টির সম্মুখীন হয়ে জেল-হাজত পর্যন্ত ভোগ করেন। তাঁদের কয়েকজন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মামলায় অ্যারেস্ট হন। অশ্লীল কাব্য রচয়িতা হিসেবে আখ্যায়িত করে মলয় রায়চৌধুরী সহ তাঁর কয়েকজন শরিক আন্দোলনকারীকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করান হয়। এভাবে হাংরি আন্দোলনকে স্তিমিত করার চেষ্টা চলে অহরহ। এতে হাংরি আন্দোলন আরো প্রচার লাভ করে। ভারত ছাড়িয়ে এই আন্দোলনের চিৎকার অস্ট্রেলিয়া, ইংলণ্ড, আমেরিকা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আমেরিকা থেকে অ্যালেন গিন্সবার্গ চিঠি লিখে ভারতীয় সংসদ পর্যন্ত কাঁপিয়ে তুলেন। কিন্তু সূক্ষাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে দেখা যায়, হাংরি আন্দোলনের পরই বাংলা সাহিত্যে উপমা, রূপক, আঙ্গিক, শব্দ চয়ন, বাক্য গঠন ইত্যাদি ক্ষেত্রে একটা নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে।

হাংরি আন্দোলনের পূর্বে বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে আমরা কয়েকজন মাত্র কবিকে লক্ষ্য করি, কিন্তু ষাটের দশকে এসে পৌঁছতেই অসংখ্য কবির জন্ম হল। এর মূলে রয়েছে হাংরি আন্দোলনের মেধাবী চিন্তার প্রকাশ। সব ভালো কবি। নতুন বিষয় নিয়ে নতুন চিন্তা ভাবনায় এঁরা মেতে উঠলেন। পরবর্তীতে জন্ম হল আরও অনেকগুলো আন্দোলনের। নতুন স্পেস। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন বর্তমান ভারতবর্ষে অসংখ্য স্পেস। যেমন— দলিত একটা স্পেস, আদিবাসী একটা স্পেস, মারাঠা একটা স্পেস। প্রত্যেকটা শব্দে তৈরি হল একটা স্পেস। কিন্তু অখণ্ড ভারতবর্ষ খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল। সাহিত্যের মধ্যমণি বলে একজনের মাথায় আর মুকুট রইল না। হাংরি আন্দোলন সেই আধিপত্য বা একনায়কত্বের মুকুট দিল পদদলিত করে। কারণ এঁরা এসেছেন ছোটলোকী জীবন-যাপনের আউটসাইডার হিসেবে। হাংরি আন্দোলনকারীরা কলকাতা কেন্দ্রিক বাংলা কবিতার দিন শেষ করে দিয়েছেন অল্প দিনেই। স্বপ্নময় জগৎ থেকে বাস্তব জগতে নামিয়ে এনেছেন নান্দনিক চিন্তাপুষ্ট স্বপ্নাচারী কবিকুলকে।

এমন দুঃসাহসী ক্ষমতা যাঁরা রাখেন তাঁদের চিন্তায় যে-সমস্ত কবিতা বেরিয়ে আসে সেগুলোকে বলা হয় হাংরি কবিতা। বাস্তব জীবনে মানুষের পারিপার্শ্বিক ও জৈবিক ক্ষুধার কথা প্রথাগত রোম্যান্টিক সাহিত্যের চিন্তাবিশ্বকে বিরোধীতা করে অবহেলিত নতুন শব্দের পিরামিড গড়ে তুচ্ছ, যৌনশব্দ, অশ্লীলশব্দ, গ্রাম্যশব্দ, ইত্যাদির মাধ্যমে কথন ব্যায়াম অভ্যাসে যে চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয় এককথায় তাকেই বলা হয় হাংরি কবিতা। জীবনের রূঢ় সত্যকে বাক্যরশ্মিতে তুলে ধরাই হাংরি কবিতা।

সমস্ত কিছুতে অবিশ্বাসই হাংরি জেনারেশন-এর কবিদের একমাত্র বিশ্বাস। নিয়ম ভাঙার আত্যন্তিক অভীপ্সা। অপরিচিত মূল্যবোধগুলোকে ভেঙে নস্যাৎ করা। জীবন ও সভ্যতার অতীত ভবিষ্যৎ-কে অস্বীকার করে কেবল বর্তমানকে অতিমাত্রিক প্রাধান্য দেওয়া। উত্তেজনাকে আশ্রয় করা। যৌবন থেকে যৌনতাকে সদর্পে গুরুত্ব দেওয়া— এই সবই হল হাংরি জেনারেশন কবিতার মূল ভাবনা। যা জীবন্ত, যা বাস্তব তারই নগ্ন রূপ হুবহু চিত্রিত করাই হাংরি কবিতার দর্শন।

যদিও হাংরি আন্দোলনের পুরো ইতিহাস তুলে ধরা গবেষণা সন্দর্ভের আওতার পড়ে না তবুও ঐতিহাসিক মানদণ্ড ও তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা বাদ দিতে কার্পণ্যতা আমাদেরকে বিদ্ধ করেছে। তাই অনেক তথ্য বাদ দিলেও কোথাও কোথাও অতিরিক্ত তথ্যভারাক্রান্ত বলে মনে হতে পারে। কিন্তু 'হাংরি আন্দোলনের ইতিহাস' আলোচনা করতে গিয়ে ইতিহাসটা যথাযথ রাখতে চাওয়া আমাদের প্রধান গবেষণা।

হাংরি আন্দোলনের ইতিহাস ছাড়া উক্ত আন্দোলকারীদের কবিতা-গল্পের আলোচনা সাহিত্যের দরবারে একেবারে নেই বললেই চলে। বিশেষ করে হাংরি শরিক এবং মলয় রায়চৌধুরীর কবিতা আলোচনার ক্ষেত্রে নিজস্ব চিন্তার বিশ্লেষণ একমাত্র ভরসা। এর মূল সত্য সন্ধান। পালাবদলের গূঢ় রহস্য আবিষ্কার। হাংরি আন্দোলনের গভীরে আত্মনিবিষ্ট হওয়া। আমরা যত্নবান হয়েছি— হাংরি আন্দোলনকারীদের লেখার মধ্যে যে চিন্তাবিশ্ব ধরা পড়েছে তা আমাদের মেধার রঞ্জনরশ্মি দ্বারা ভালোভাবে পরীক্ষা করতে। এর মূলে রয়েছে বাংলা সাহিত্যের প্রতি আমাদের ভালোবাসা এবং হাংরি আন্দোলনের স্রষ্টা মলয় রায়চৌধুরী ও শরিক সকল কবি-সাহিত্যিকদের প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা।

* * *

NABIN CHANDRA COLLEGE LIBRARY
BADARPUR KARIMGANJ

প্রথম অধ্যায়

হাংরি আন্দোলনের প্রস্তুতপর্ব ও তার মজাগুলো

নভেম্বের ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত একটি ইংরেজি ইশতিহার প্রকাশের মাধ্যমে হাংরি আন্দোলনের জন্ম। কিন্তু সময়টা হাংরি আন্দোলনের জন্মক্ষণ হলেও তার গর্ভাবস্থার কথা কৌতূহলপ্রদ। ইতিহাস সাক্ষ্য মতে হাংরি আন্দোলনের স্রষ্টা মলয় রায়চৌধুরী। হাংরি আন্দোলন যখন শুরু হয় তখন মলয় রায়চৌধুরী পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে সবে মাত্র স্নাতকোত্তর পাশ করে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের চাকরিতে যোগদান করেন। অর্থনীতির ছাত্র হলেও পৃথিবীর বিভিন্ন সাহিত্য অধ্যয়নে নিমগ্ন থেকে বাংলা সাহিত্য অধ্যয়নে পালাবদলের চেষ্টায় নানান চিন্তাভাবনা করতে থাকেন। পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে তিনি মার্কসবাদের দর্শন নিয়ে মগজের শোধন ক্রিয়ার অভ্যাস করেন। লিখে ফেলেন 'মার্কসবাদের উত্তরাধিকার'। ডায়েরিতে লিখে রাখেন কবিতা। বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ান নানা জায়গায়। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে তাঁর বুদ্ধির জট খুলতে থাকে। কখনও বন্ধু তরুণ সুরের সঙ্গে চলে যান এলাহাবাদ, স্টিমারে শোনপুর, ট্রাকে কলকাতা, বাসে রাঁচি ইত্যাদি। আবার কখনও দাদা সমীর রায়চৌধুরীর চাকুরি স্থল চাইবাসায়। কখনও নিঃসঙ্গভাবে শালমহুলের জঙ্গলে সানথাল গ্রামে উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়ান। অবশেষে ফিরে আসেন পাটনা ইমলিতলার বাড়িতে।

বাইশ বছরের মলয় রায়চৌধুরীর মস্তিষ্ক নানাদিক দিয়ে পরিপক্ব। কারণ তিনি বহুপড়ুয়া। মেধাবী। জ্ঞানপিপাসু মলয় রায়চৌধুরী পৃথিবীর বিভিন্ন আন্দোলন, দর্শন ও ইংরেজি সাহিত্য ভালোভাবে অধ্যয়ন করে নিজেকে প্রস্তুত করতে থাকেন। বাংলা সাহিত্যে পালাবদলের নেশা তাঁর মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে। অনেকদিন ধরে তিনি ভাবছেন একটা আন্দোলনের জন্ম দেওয়া আবশ্যক। ইতিপূর্বে তাঁর চারটে কবিতা কৃত্তিবাস (১৯৫৩) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে গেছে। মৌলিক কবিতা লেখার মাধ্যমে একটা কিছু করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন মনে মনে। কবিতা তাঁকে যেন আলাদা জগতে নিয়ে যেতে চাইছে। এমন সময় একদিন তিনি আবিষ্কার করলেন জিওফ্রে, চসারের (১৩৩৯-১৪০০ খ্রিঃ) 'In the sowre hungry tyme' বাক্যটি। তিনি বলছেন— "হাংরি টাইম, তাও আবার সাওয়ার হাংরি টাইম। খাওয়া— এই শব্দটা বাংলা ভাষাতেও দেখলুম চোরাগোপ্তা ভাবে চারিদিক থেকে চালানো হয়েছে ঃ হাওয়া খাওয়া ঘুষ খাওয়া খাবি খাওয়া চুমু খাওয়া মার খাওয়া মাথা খাওয়া। মগজে চেপে বসে গেল হাংরি কথাটা। ভারতীয় সংস্কৃতির আত্মসাৎ প্রক্রিয়ায় খাপ খেয়ে গেল হাংরি, চসার-এর সাওয়ার হাংরি টাইম।"[১] আর মলয় রায়চৌধুরী মস্তিষ্কে শাণিয়ে নিলেন 'হাংরি আন্দোলন' নামক ভাবনা।

আন্দোলনের রূপ সম্পর্কে মলয় রায়চৌধুরীর মাথায় খসরা তৈরি হতে লাগল। তিনি ১৯৫৬ থেকে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে 'ইতিহাসের দর্শন' এবং 'মার্কসবাদের উত্তরাধিকার' লিখতে গিয়ে একটা আন্দোলনের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। ওই দুটো লেখা রচনার সময় জার্মান দার্শনিক ওসওয়ালড স্পেংলার (১৮৮০-১৯৩৬)এর 'The Decline of the West'

(১৯৩২) বইটি তাঁর হাতে এসে পৌঁছয়। যার প্রধান বক্তব্য থেকে হাংরি আন্দোলনের কাঠামোটি তৈরি করতে সাহায্য পেয়েছিলেন মলয় রায়চৌধুরী। মলয় রায়চৌধুরী স্পেংলারের আদর্শকে মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। স্পেংলারের যে কথাগুলো গ্রহণযোগ্য মনে করেছিলেন তার সংক্ষিপ্ত হল— একটি সংস্কৃতির ইতিহাস বিভিন্ন দিকে প্রসারিত হয়, তার গতিতে বারবার ব্যাঘাত ঘটে ; এর মূলে জৈবক্রিয়া। তাই সমাজে নানা দিকের মধ্যে কোন দিকে বাঁকবদল হবে তা আগে থেকে বলা যায় না। নিজের সৃজনক্ষমতাকে আত্মবিশ্বাসের প্রখরতায় আলোড়িত করতে থাকলে সেই সংস্কৃতি সার্বিক ভাবে বিকশিত, সমৃদ্ধ এবং প্রসারণের মাধ্যমে নিত্যনতুন স্ফুরণ ঘটাতে থাকবে। অবশেষে একটি সংস্কৃতি অবলুপ্তির পথে তখনই এগিয়ে যায় যখন সেই সংস্কৃতি নিজের সৃজনক্ষমতা ফুরিয়ে অন্য সংস্কৃতিকে গ্রহণ করে, কিন্তু তার তৃপ্তি আসে না, তার ক্ষুধার অবসান ঘটে না। মলয় রায়চৌধুরী তাই মনে করেছিলেন "দেশভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গ এই ভয়ংকর অবসাদের মুখে পড়েছে, এবং উনিশ শতকের মনীষীদের পর্যায়ের বাঙালির আবির্ভাব আর সম্ভব নয়।"[২] তাই মলয় রায়চৌধুরী মনে মনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে একটি আন্দোলনের জন্ম দেওয়ার কথা স্থির করেন।

মলয় রায়চৌধুরীর বয়স যখন একুশ বছর তখন তিনি অভিমান করে বলেছেন— তাঁর চারপাশে দেখা বাস্তবের সঙ্গে বাংলা কবিতার কোনো মিল নেই। তখন বাংলা সাহিত্যে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিলেন অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দিনেশ দাশ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আলোক সরকার, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। মলয় রায়চৌধুরী বলেন— "কবিতাগুলির বোধসত্তা সেই অভিজাত সমাজেই, বড়ো লোকদের আদরখাওয়া ভাষা, ভোকাবুলারির নব্বইভাগ রবীন্দ্রনাথের, এমন কি অভিধান ঘেঁটে শব্দ তৈরির বাহবা। উঠতি কবিদের হিরো সে সময় নাইটগাউন পরা চায়ে শুগারকিউব-খাওয়া 'কবিতা' পত্রিকার সুপারপ্রেমিক সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু। ঘৃণা পৈশুন্য ক্রোধ হিংসা নেশা লাম্পট্য অসূয়া কবিতার দার্শনিক স্যাক্রিলেজ। পাঠককে ভুলিয়ে রাখার জন্যে কবিতায় নানারকম কেতাবী ছন্দ ব্যবহার। ছন্দের মাধ্যমে পাঠককে আক্রমণ করাটা ভাবাও চলে না, এমন পাতিবুর্জোয়া আবহাওয়া। বিদেশি কবিদের অনুবাদেও কবির নিজস্ব ভাষা, নিজস্ব বাংলা। এরকমের ভেতো এবং জেনানা কবিত্বের ঢালাও কারবার।"[৩] বাংলা কবিতায় যেন একটা অকাল অনুভব করছিলেন মলয় রায়চৌধুরী তাই হাংরি আন্দোলন আবশ্যক হয়ে পড়ে।

আন্দোলন করতে গেলে মানুষ, দরকার, তাই জেদি যুবক মলয় রায়চৌধুরী আত্মহারা হয়ে একদিন দাদা সমীর রায়চৌধুরীকে হাংরি আন্দোলনের প্রয়োজন সম্পর্কে বিস্তারিত জানালেন। তিনি তাঁকে নানা পরামর্শ দিলেও সেটা তাঁর মন মতো হয় নি। এমন সময় একদিন চোখে পড়ল 'ছোটগল্প' নামক একটি লিটিল ম্যাগাজিন। যে পত্রিকার সম্পাদক লালমোহন দাস। সেখানে হারাধন ধাড়া নামে 'আনকোরা' নাম। মলয় রায়চৌধুরী চিঠি মারফত যোগাযোগ করে পাটনা থেকে এসে উপস্থিত হলেন হাওড়া নেতাজি সুভাষচন্দ্র রোডে হারাধন ধাড়ার বাড়ি। হারাধন ধাড়ার ঘর আবিষ্কার করার পর তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ হলে মলয় রায়চৌধুরী জানলেন— তিনি কার্যবাহী দণ্ডাধীশের দ্বারা অনুমোদিত শপথনামা মারফত নাম পাল্টে দেবী রায় (জন্মঃ ১৯৩৮–)

হয়ে গেছেন। তখন দেবী রায়ের অর্থনৈতিক অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। সেই সময় তিনি সামান্য রোমান্টিক কবিতা লেখেন এবং কিছু ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকা পড়েন। দেশি-বিদেশি সাহিত্য অধ্যয়নের মানসিকতা তাঁর গড়ে ওঠেনি।

অনেক কথার পর মলয় রায়চৌধুরী হাংরি আন্দোলনের কথা বিস্তারিত ভাবে দেবী রায়কে জানালেন। দেবী রায়ের কাছে আন্দোলনটা কেমন অবাস্তব মনে হচ্ছিল, কারণ— পত্রিকা প্রকাশ না করে হ্যাণ্ডবিলের মতো ফালি কাগজে লেখা কেমন যেন ছেলেখেলা মনে হচ্ছিল। তাঁর মনে হচ্ছিল একটা হাসির কাণ্ড যেন ঘটতে পারে। লোকে তা কিনে পড়বে না। বিজ্ঞাপনের কাগজ মনে করে চোখ বুলিয়ে ফেলে দেবে। তবুও মলয় রায়চৌধুরী নাছোড়বান্দা। তিনি দেবী রায়ের কোনো যুক্তিকেই গ্রাহ্য করলেন না। কেননা তাঁর মাথায় একটা বড় ভাবনা সত্য হবার অপেক্ষায়। ফালি কাগজে আন্দোলনের কথা বলতে সুবিধে। প্রয়োজনে মাসে, সপ্তাহে এমন লিফলেট প্রকাশ করা সহজ হবে। একেক সময় একেক রকম রঙের কাগজে আন্দোলনের নমুনাগুলো প্রকাশ করা যাবে। দেবী রায় শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন।

সিদ্ধান্ত হল— পাটনা থেকে ইশতিহার ছাপা হবে। আর ঠিকানা থাকবে হাওড়া দেবী রায়ের বাড়ির। লেখা ও আন্দোলনের শরিক সংগ্রহের ভার দেবী রায়ের ওপর অর্পণ করে মলয় রৌয়চৌধুরী কলকাতা থেকে সহজ পথে জামশেদপুর হয়ে চাইবাসা দাদা সমীর রায়চৌধুরীর আস্থানায় চলে গেলেন। সমীর রায়চৌধুরী এই আন্দোলনে শরিক হবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তারপর তন্ময় দত্ত-র সঙ্গেও এ-বিষয়ে কথা বললেন, কিন্তু তিনি এই প্রস্তাবে রাজি হলেন না। সমীর রায়চৌধুরীর বন্ধু শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে (১৯৩৪-১৯৯৫) হাংরি আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার কথা জানালে তিনি শরিক হবার সম্মতি দিলেন। তখন শক্তি চট্টোপাধ্যায় পাটনায় ছিলেন। সে সময় শক্তি ও সমীর 'কৃত্তিবাস' গোষ্ঠীর অন্যতম লেখক।

পাটনা লেখা ছাপাতে গিয়েই সমস্যা দেখা দিল। প্রথম সমস্যা— পাটনায় বাংলা প্রেসের অভাব। দ্বিতীয় সমস্যা— নতুন রাজনৈতিক দলের মুখপত্র মনে করে প্রেস মালিকরা ইশতিহার ছাপাতে প্রস্তুত নন। তৃতীয়ত— অশ্লীলতার অজুহাতে ছাপাখানা থেকে পাণ্ডুলিপি ফিরিয়ে দেওয়া হল। এভাবে নানান সমস্যা দেখা দিলে মলয় রায়চৌধুরী ঠিক করলেন ইংরেজিতেই ইশতিহার ছাপাবেন। 'জব প্রেস' নামক দরিয়াপুরে মলয় রায়চৌধুরীর বাড়ির কাছে একটি প্রেসে প্রথম ইংরেজি ইশতিহার ছাপতে দেওয়া হল। সেই প্রেসে সাধারণত মিষ্টির প্যাকেট, মিষ্টির ডিবে ইত্যাদি ছাপা হয়ে থাকে। আর্ট পেপারে ১/৮ ডিমাই সাইজে ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রথম ইংরেজি বুলেটিন প্রকাশ পেল। তারপর সেগুলো মিস্টির ডিবেতে প্যাকিং করে মলয় রায়চৌধুরী কলকাতায় দেবী রায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

ইতিহাস সাক্ষ্য মতে হাংরি আন্দোলনের শুরু পাটনাস্থিত মলয় রায়চৌধুরীর বাড়ি। ইশতিহারে লেখা হল— ক্রিয়েটার মলয় রায়চৌধুরী, লীডার শক্তি চট্টোপাধ্যায়, এডিটর দেবী রায়। প্রথম অবস্থায় ছাপা এবং ছাপার খরচ মলয় রায়চৌধুরীকে বহন করতে হয়েছে। প্রথম বুলেটিন ইংরেজিতে হওয়ার ফলে ঐতিহাসিকতার দিক থেকে এর গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে বুলেটিন সম্পূর্ণ তুলে ধরা হল ঃ

"

WEEKLY MANIFESTO OF THE HUNGRY GENERATION
Editor : Debi Roy. Leader : Shakti Chatterjee **Creator : Malay Roy Choudhury**
Poetry is no more a civilizing manoeuvre, a replanting of the bamboozled gardens; it is a holocaust, a violent and somnambulistic jazzing of the hymning five, a sowing of tempestual hunger. Poetry is an activity of the narcissistic spirit. Naturally, we have discarded the blankely-blank school of modern poetry, the darling of the press, where poetry does not resurrect itself in a orgasmic flow, but words come up bubbling in an artificial muddle. In the prosed-rhyme of those born-old half-literates, you must fail to find that scream of desperation of a thing wanting to be man, the man wanting to be spirit. Poetry of the younger generation too has died in the dressing room, as most of the younger prosed-rhyme writers afraid of the satanism, the vomitous horror, the self-elected crucification of the artist that makes a man poet, fled away to hide in the hairs. Poetry from Achintya to Ananda and from Alokranjan to Indraneel, has been cryptic, short-hand, cautiously glamours, flattered by own sensivity like a public school prodigy. Saturated with self-consciousness, poems have begun to appear from the tomb of ligic or the lier of unsexed rhetoric.
Published by Haradhan Dhara from 269 Netaji Subhas Road, Howrah, West Bengal, India.

"৪

এটি কবিতা বিষয়ক ইশতিহার। শক্তি চট্টোপাধ্যায় উক্ত বুলেটিনের বিশেষ দায়িত্বে থাকায় গত প্রজন্মের চারজন কবির নাম দেখে ক্ষেপে যান এবং ডিসেম্বর মাসে কিছু পরিবর্তন করে দ্বিতীয়বার ইশতিহারটি প্রকাশ করেন। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে বর্ধিত সদস্য সংখ্যাদের নাম সহ প্রথম ইশতিহারটি তৃতীয়বার আত্মপ্রকাশ করে।

শিল্প-সাহিত্যে নব আন্দোলনের ভাবনা থেকেই হাংরি আন্দোলনের জন্ম। তাই হাংরি আন্দোলনের প্রথম বুলেটিনেই চেষ্টা চলল— "সময় তাড়িত চিন্তাতন্ত্র থেকে আলাদা হয়ে স্পেস-স্পেসিফিক বা পরিসরলব্ধ গড়ে তুলতে।"[৫] ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'সম্প্রতি' নামক একটি পত্রিকায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় 'কবিতা বিষয়ক প্রস্তাব' নামক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে সেটাই প্রথম আলোচনা। শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রবন্ধটিতে লিখেছেন— 'এ-আন্দোলনের মূল কথা সর্বগ্রাস।' তারপরই হাংরি আন্দোলনের প্রচার বেড়ে যায়। কলকাতায় তখন হাংরি আন্দোলন নিয়ে নানা রকমের জল্পনা-কল্পনা। সমস্ত খবর দেবী রায় পোস্টকার্ড মারফত মলয় রায়চৌধুরীর কাছে পৌঁছে দেন।

এখন ইশতিহার কলকাতায় ছাপা ও প্রকাশ হয়। কিন্তু ছাপা ও প্রচারের খবর বহন করেন মলয় রায়চৌধুরী। ধীরে ধীরে অনেকেই আন্দোলনে যোগদান করেন। তাঁদের মধ্যে প্রধানরা হলেন— উৎপলকুমার বসু, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার, সুবিমল বসাক, প্রদীপ চৌধুরী, করুণানিধান মুখোপাধ্যায়, ফালগুনী রায়, ত্রিদিব মিত্র, আলো মিত্র, সুবো আচার্য, বাসুদেব দাশগুপ্ত, রবীন্দ্র গুহ, সুভাষ ঘোষ, শৈলেশ্বর ঘোষ, অনিল করঞ্জাই, অশোক চট্টোপাধ্যায়, অমৃততনয় গুপ্ত, শম্ভু রক্ষিত, অরণি বসু, অরূপরতন বসু, সৈয়দ মুসতফা সিরাজ, অমিত সেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত চক্রবর্তী, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে।

অনেকেই হাংরি আন্দোলনে যুক্ত থাকলেও তাঁরা হাংরি বুলেটিন বা পত্রিকায় লেখালেখি করেননি, কিংবা ছবি আঁকেননি। তাঁরা হাংরি আন্দোলনকে সমর্থন করে জয়জয়কার ধ্বনি তুলতেন, প্রচার করতেন, আড্ডা দিতেন। যেমন— ভানু চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্র ভৌমিক, হরনাথ ঘোষ, নীহার গুহ, অজিতকুমার ভৌমিক, সুব্রত চক্রবর্তী, শচীন বিশ্বাস, শংকর সেন, যোগেশ পণ্ডা, মনোহর দাশ, আপ্পা বন্দ্যোপাধ্যায়, শুকদেব সেন, কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়, তপন দাশ (অমল রায়), মিহির পাল এবং অন্যান্যরা। সে সময় প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অনেকেই হাংরি আন্দোলনের শরিক হলেও তাঁদের নাম আজ সময়ের রথের চাকায় পিষ্ট হয়ে গেছে।

হাংরি আন্দোলন করতে গিয়ে ইশতিহার প্রকাশ করার সুবাদে মলয় রায়চৌধুরী এবং সমীর রায়চৌধুরী এবং দেবী রায় প্রতিষ্ঠিত অনেক সাহিত্যিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ইশতিহার দেন। পরামর্শ চান। লেখার প্রয়োজন জানান। এরফলে বিভিন্ন জন বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। মলয় রায়চৌধুরী আর দেবী রায় একদিন বুদ্ধদেব বসুর বাড়িতে বন্ধ দরজায় কড়া নাড়ালে দরজা খুলে ইশতিহার হাতে নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়েই চোখ বুলিয়ে রাগসূচক 'হুম' শব্দ করে দরজা বন্ধ করে দেন। একদিন আবু সয়ীদ আইয়ুব সাহেবের বাসায় মলয় রায়চৌধুরী এবং সমীর রায়চৌধুরী দেখা করতে গেলে হাবভাবে বোঝালেন তিনি এখনও রেগে আছেন। কারণ, তাঁকে দুটো নিমন্ত্রণ কার্ড পাঠিয়েছিলেন এঁরা। একটায় বিয়ের নিমন্ত্রণের পরিবর্তে ছিল— 'গাঙশালিখ কাব্যস্কুলের জারজদের ধর্ষণ করো।' অন্যটায় ছিল — 'লিণ্ডসে স্ট্রীটে টপলেস প্রদর্শনী দেখতে আসুন।' শেষে জানান, তিনি হাংরিদের কোনো লেখা পড়েন না। মলয় রায়চৌধুরী একদিন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর বাড়িতে গেলে ভেতর থেকে খবর পাঠিয়ে জানালেন, অন্যদিন আসতে, আজ তাঁর সময় নেই। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে মলয় রায়চৌধুরী সাক্ষাৎ করতে গেলে বিকেল থেকে সন্ধে পর্যন্ত বসিয়ে রেখে যখন দর্শন দিলেন তখন মদের বুঁদ গন্ধে বৈঠকখানা উত্তেজিত হয়ে উঠল। ইশতিহার দিলে তিনি জানান— এসব পড়ে এবং করে কিছু হবার নেই। হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে বহরমপুরে মলয় রায়চৌধুরীর সঙ্গে মণীশ ঘটক-এর কথা হলে তিনি সমর্থন করেন এবং বলেন, আরও বড় ভাবে করলে কিছু একটা ঘটান যেতে পারে।

হাংরি আন্দোলনের যাঁরা শরিক তাঁদের বেশিরভাগেরই বয়স আঠারো থেকে বত্রিশ। সবাই নিজের ইচ্ছে মতো পত্রিকা ও লেখালেখি করলেও মলয় রায়চৌধুরী একটি ইশতিহারে হাংরি আন্দোলনের শরিকদের উদ্দেশে চোদ্দো ধারার নিয়ম নীতি বেঁধে দিলেন। গ্রহণযোগ্যও হল। এই চোদ্দোটি নিয়মবিধিকে মান্য করেই হাংরি শরিকদের পথ চলা। তাই হাংরি আন্দোলনের ঐতিহাসিকতার বিচারে মলয় রায়চৌধুরী রচিত চোদ্দোটি নিয়মবিধি জানতে আমাদের কৌতূহলী মন আগ্রহ প্রকাশ করে। যথা ঃ

1. "The merciless exposure of the self in its entirety.
2. To present in all nakedness all aspects of the self and thing before it.
3. To catch a glimpse of the exploded self at a particular moments.
4. To challenge every value with a view to accepting or rejecting the same.
5. To consider everything at the start to be nothing but a 'thing' with view to testing whether it is living or lifeness.
6. Not to take reality as it is but to examine it in all its aspects.
7. To seek to find out a made of communication, by abolishing the accepted modes of Prose and Poetry which would instantly establish a communication between the poet and his reader.
8. To use the same words in poetry as are used in ordinary conversation.
9. To reveal the sound of the word, used in ordinary conversation more sharply in poem.
10. To bresk loose the traditional association of words and to coin unconventional and here-to-fore unaccepted combination of words.
11. To reject traditional forms of property and allow poetry to take its original forms.
12. To admit without qualification that poetry is the ultimate religion of man.
13. To transmit dynamically the massage of the restless existance and the sense of disgust in a rezor sharp language.
14. Personal ultimatum."[৬]

প্রত্যহ মজার মজার ঘটনা ঘটতে লাগল। মানুষকে আক্রমণ এবং অপমান করার নতুন নতুন কৌশল। হাংরি আন্দোলনের প্রক্রিয়ায় সিভিল সোসাইটির ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে ত্রিদিব মিত্র আর আলো মিত্র যে প্রতিবাদী কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন সেটা সত্যই আশ্চর্যের। ঘন কালো বর্ডারে ত্রিদিব মিত্র আর আলো মিত্র একটা বিয়ের কার্ড ছাপিয়েছিলেন। সুন্দর প্রজাপতির পাশে শুভবিবাহ কথাটিও লেখা ছিল। নিমন্ত্রণের জন্য খামের গায়ে হলুদ মাখান হয়েছিল। কার্ডটির নমুনা তুলে দেওয়া হল ঃ

"

ওঁ গঙ্গা

আলো মিত্র (হিন্দু ও রেজিস্টিরি মতে ত্রিদিব মিত্রের
অবিবাহিতা স্ত্রী) আয়োজিত
হাংরি জেনারেশনের শোকসভা
২৫ বৈশাখ দুপুর বারোটায়
॥ মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবরে ॥
মানুষের অকাল মৃত্যুতে।

"[৭]

উক্ত কার্ডটি পৌঁছেছিল রবীন্দ্র সংগীত বিশেষজ্ঞ গায়ক-গায়িকা এবং বিশ্বভারতীর অধ্যাপকদের কাছে। হৈ চৈ হয়েছিল প্রচুর। অনেকে নিজের সম্মান রক্ষার্থে কোনো ধরনের শব্দই করেননি। এমনতর নিত্য-নতুন ঘটনা একের পর এক সাহিত্য-সংস্কৃতি-বুদ্ধিজীবী মহলে চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াল। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ভারত-চিন যুদ্ধের সময় হাংরি আন্দোলনকারীরা কলকাতার দেয়ালে দেয়ালে একটা পোস্টার টাঙিয়ে দিয়েছিলেন। মলয় রায়চৌধুরী লিখেছেন— "একটা হোটেল থেকে এক বালতি ভাতের ফ্যান নিয়ে কাপড়ের ন্যাতা দিয়ে লাগালুম পোস্টোরটা, রাত্তির বেলায়—

THE HUNGRY GENERATION OFFERS
a Rs. 100,00,00,000 poem
To the saint who would bring
Mao Tse Tung"[৮]

তাছাড়া রাস্তায় কারও বাড়ির সামনে চেঁচিয়ে হাংরি কবিতা পড়ার মতো দুঃসাহসী কাজও মলয় রায়চৌধুরীরা করেছিলেন. তিনি বলছেন— কখনও, "একটাকা দিয়ে গোড়ের মালা ভাড়া করে তাকে পরিয়ে আবার মালাটা ফেরত দিয়ে দিতুম মালাওলাকে।"[৯]

ত্রিদিব মিত্র এবং আলো মিত্র যে ধরনের বিয়ের কার্ড ছেপেছিলেন তারও বেশ কিছু আগে মলয় রায়চৌধুরী ঠিক তেমনই একটি নিমন্ত্রণ পত্র প্রকাশ করেছিলেন। তখন মলয় রায়চৌধুরীরা পাটনায় থাকতেন। সেই নিমন্ত্রণ পত্রগুলো সুবিমল বসাক মারফত ডাকে একশোজন কবি-লেখক-সাংবাদিক-অধ্যাপক-সম্পাদক প্রমুখকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। "কার্ডের একদিকে লেখা 'গাঙশালিখ কাব্যস্কুলের জারজদের ধর্ষণ করো'। ব্যাস। তিরিশ-চল্লিশ-পঞ্চাশের কবিরা রাগে ফেটে পড়তে লাগলেন।"[১০] আসলে এমন ধরনের স্কুল বাস্তবিক ছিল না। নিমন্ত্রণ পত্রের অন্যদিকে লেখা ছিল— "লিণ্ডসে স্ট্রিটে টপলেস প্রদর্শনী দেখতে আসুন।"[১১] অনেকের ধারণা ছিল— এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য রাস্তায় বুক-খোলা মেয়ে মানুষের উপস্থিতি। এমন ভাবনার ফলে রাস্তার দু'পাশে ওয়ারলেস গাড়ি নিয়ে পুলিশ পাহারা দিতে লাগল। এ ব্যাপারে আবু সয়ীদ আইয়ুব অ্যালেন গিন্সবার্গের কাছে নালিশ জানালেন— "রিসেণ্টলি দে হায়ার্ড আ উওম্যন টু এগজিবিট হার বুজম ইন পাবলিক অ্যাণ্ড ইনভাইটেড আ লেট অব্ পিপল ইনক্লুডিং মাইসেল্ফ টু উইটনেস দিস ওয়াণ্ডারফুল আভাঁগার্দ একজিবিশান।"[১২]

একের পর এক কাণ্ড মানুষকে আতঙ্ক করারই কথা। সাহিত্য রচনার চেয়ে নতুন নতুন কাণ্ড করতেই যেন হাংরি আন্দোলনের শরিকরা ব্যস্ত ছিলেন। তার প্রমাণ স্বরূপ— "মলয় রায়চৌধুরীর একটি বইয়ের দাম রাখা হয় ১৪৪৩৫০০ টাকা। অথবা ৫০ টি. টি. বি. সিল।"[১৩] আরও আশ্চর্য ঘটনা স্বরূপ দেখা যায়— একদিন মলয় রায়চৌধুরী 'দেশ' পত্রিকা অফিসে গিয়ে সম্পাদক বিমল কর মহাশয়কে একটি জুতোর বাক্স দিয়ে বলেছেন— পুস্তকটি সমালোচনা করতে। অ্যাক্সিডেণ্টের দরুণ বিমল কর-এর ছেলে রাস্তায় ভীষণভাবে ক্ষতবিক্ষত, একথা মলয় রায়চৌধুরী ফোন মারফত জানালে তিনি সঙ্গে সঙ্গে ছুটে আসেন। এমনতর ঘটনায়

যে-কেউই অপমানবোধ করার কথা। অপমান এবং ঘৃণা থেকেই পাল্টা অপমান এবং ঘৃণা। এতেও শেষ হয় নি, মলয় রায়চৌধুরী একদিন 'দেশ' পত্রিকা অফিসে কয়েক পৃষ্ঠা সাদা কাগজ পাঠিয়ে দিয়ে বলে এসেছেন— গল্পটি ছাপতে হবে।

মলয় রায়চৌধুরী একদিন রাস্তাদিয়ে যেতে যেতে একটা আইডিয়া মাথায় আসতেই তা করার জন্য উৎসুক হয়ে উঠলেন। বাঘ, সিংহ, জোকার, রাক্ষস, কাকাতুয়া, শেয়াল, মিকিমাউস ইত্যাদি ধরনের মুখোশ কিনে তার ওপর লিখে দিলেন— 'দয়া করে মুখোশ খুলে ফেলুন— হাংরি জেনারেশন'। তাঁরা মুখোশগুলো পাঠিয়ে দিলেন— মুখ্যমন্ত্রী সহ পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন মন্ত্রীকে। জেলাশাসক, সংবাদপত্রের সম্পাদক, কিছু প্রতিষ্ঠিত কবি-লেখক, হাওড়া-শেয়ালদার স্টেশন মাস্টার প্রমুখকে। যাঁদেরকেই কেউকেটা মনে করেছেন তাঁদেরকেই মুখোশ পাঠিয়েছিলেন এঁরা। উদ্দেশ্য ছিল— এঁদেরকে উত্তেজিত করা এবং এক ধরনের ভয় দেখানো। প্রায় সকলই এই ঘটনায় অপমান বোধ করেছেন। এ-ব্যাপারে অনেকেই থানায় এজাহার দিয়েছিলেন। তারফলে মলয় রায়চৌধুরী, সুবিমল বসাক আর দেবী রায় 'হাংরি ট্রোইকা' নামে খ্যাত এবং কুখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন।

হাংরি আন্দোলনকে প্রচারমুখী করার জন্য মলয় রায়চৌধুরী আরও একটি মজার ঘটনা করেন। সাইক্লোস্টাইল করে সুবিমল বসাকের হাত দিয়ে বঙ্গীয় কবিদের কুলপঞ্জি ছড়িয়ে দেন মলয় রায়চৌধুরী। যেমন—

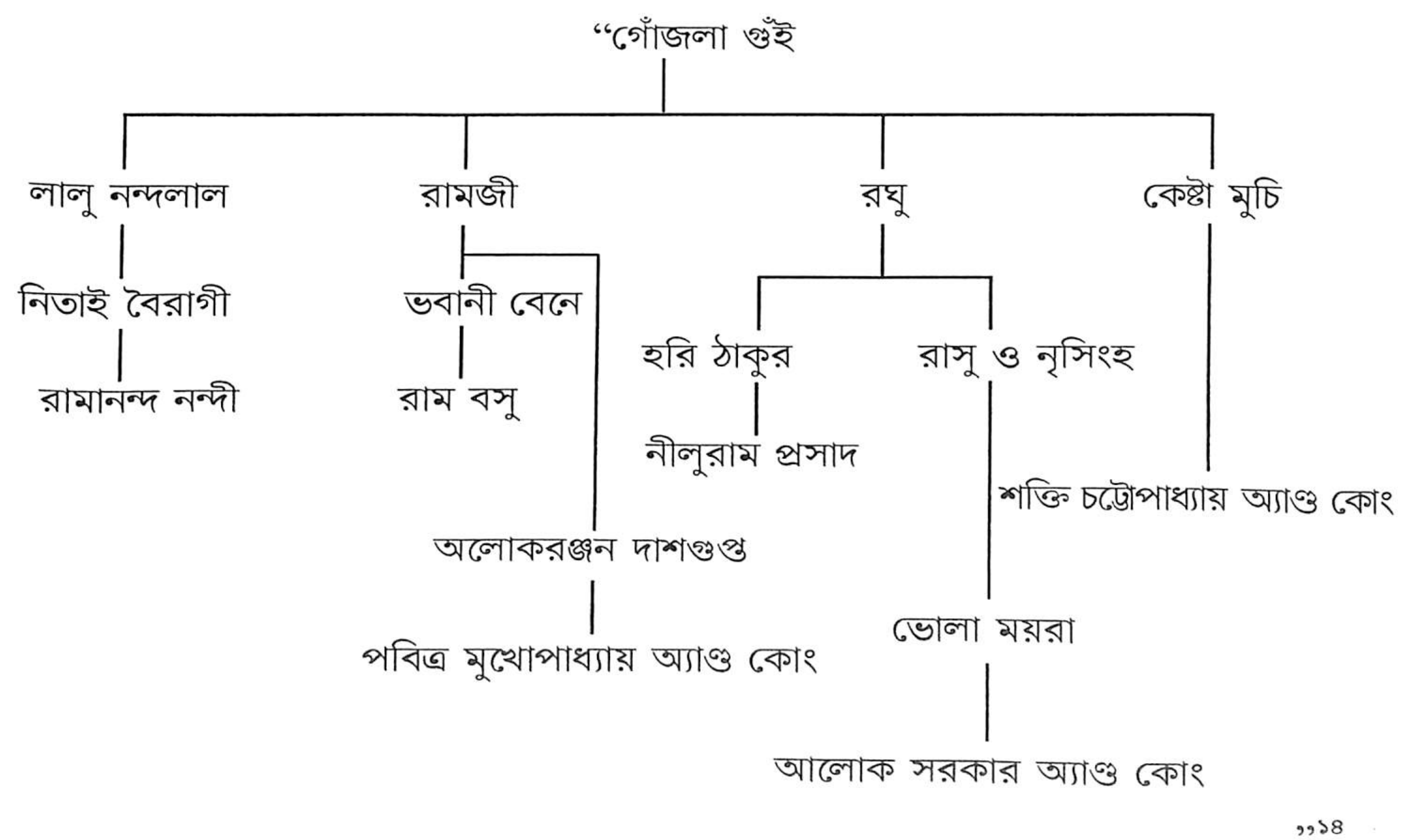

হাংরি আন্দোলনে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন এবং যাঁরা সমর্থক— তাঁদের অনেকেই সরকারী অফিসে চাকরি করতেন ; কেউ অধ্যাপক, কেউ লেখক, কেউ সম্পূর্ণ রোজগারহীন, কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, ইত্যাদি। সবারই মনে এসট্যাবলিশমেন্টের প্রতি চাপা ঘৃণা বিরাজমান। তাঁদের বিভিন্ন ধরনের উদ্ভট কাণ্ড করার মূলে— ঘৃণা এবং হতাশা।

বাস্তব জীবনে এঁরা যে অনেকটাই উচ্ছৃঙ্খল ছিল একথা সত্য। এঁরা অ্যালেন গিন্সবার্গ, গ্রেগরি কোরসো, উইলিয়াম বারোজ'দের জীবনযাত্রার মতো নিজেদের জীবনযাত্রাকে পরিচালিত করতে দ্বিধাবোধ করেননি। এঁরা নিজেরাই তা স্বীকার করেন। তাঁরা স্বীকার করেন যে— গাঁজা, ভাঙ্গ, সুরা, এমন-কি নারী-সঙ্গেও তাঁদের ঔৎসুক্য কম ছিল না। জীবনকে উপলব্ধি করার সকল পথই এঁদের কাছে আকর্ষণীয়। অনেক ব্যাপারে এঁরা মস্তানি করলেও এই মস্তানি ইনটেলেকচুয়াল সাহিত্যের মস্তানি।

হাংরি আন্দোলনে যুক্ত প্রায় সকলই ছিলেন উচ্চশিক্ষিত, কিন্তু নিম্ন শ্রেণির অপরিচিত লেখক। তাঁদের চিন্তাশক্তি ছিল বড় প্রখর। চিন্তার প্রখরতাকে কাজে লাগিয়ে এঁরা যে যেখান থেকে পেরেছেন, যে-ভাবে পেরেছেন ইশতিহার প্রকাশ করেছেন। হাংরি আন্দোলনের কোনো অফিস বা হেড কোয়াটার ছিল না। সেখানে সবাই সমান মর্যাদা পেতেন। তাই ঝাঁকে ঝাঁকে যুবকরা আমি আছি আমি আছি বলে ঠেলা ঠেলি করে হাংরি আন্দোলনের শরিক হয়েছিলেন। এঁদের চিন্তায় ছিল বাস্তাব অভিজ্ঞতা। এঁদের প্রধান উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠানকে ধাক্কা দেওয়া। সাহিত্য রচনার মাধ্যমে নিজের ও সমাজের কথা বলা। বলার মধ্যে ছিল নতুনত্ব। এই বলার ধরন পৃথিবীর কোনো সাহিত্যে এর পূর্বে দেখা যায় নি। তাই অ্যালেন গিন্সবার্গও হাংরি আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে হাংরি ইশতিহারগুলো সংগ্রহ করে আমেরিকা নিয়ে গিয়েছিলেন। হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অধিকাংশ শরিকরা কলকাতার বাইরের। মফস্বলের। কেউ চাষার ছেলে— অন্ত্যজ, কেউ বাস্তুভিটাহারা, কেউ হত-দরিদ্র, নিম্নবর্গের ইত্যাদি। এই পিছিয়ে পড়া এক শ্রেণির স্বাধীন সাহিত্যিক ধাক্কা দিয়ে বসলেন প্রতিষ্ঠানের পোষা খাঁচার পাখিদের গায়ে। এঁদের ভাবনায় হাংরি আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য, ক্ষুধা ইত্যাদি কেমন চৌচির হয়ে ফেটে বেরোয় তা লক্ষ্য করার মতো। হাংরি আন্দোলনের ক্ষুধা—

১। পেটের এবং দেহের।
২। মনের, আত্মার, জ্ঞানের ক্ষুধা।
৩। হাংরি আন্দোলনের ক্ষুধা প্রতিবাদের।
৪। হাংরি কবিতার বলাটা ক্ষুধার্তের।
৫। হাংরি আন্দোলনের ক্ষুধা জ্ঞানের নবপর্যায়ের।
৬। বিদ্যায়তনিক সংজ্ঞাকে ফাটিয়ে চৌচির করার ক্ষুধা।
৭। ভাঙচুরের প্রবণতার ক্ষুধা।
৮। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কবিতা সৃষ্টির ক্ষুধা।
৯। নিজেকে খুঁচিয়ে জখম করার ক্ষুধা।
১০। ইচ্ছাকৃত মৃত্যুর দিকে নিজেকে ঠেলে দেবার ক্ষুধা।
১১। উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের ক্ষুধা।

১২। যে জিনিস নিষিদ্ধ সেই জিনিসকেই আঁকড়ে ধরার ক্ষুধা।
১৩। নিজের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার ক্ষুধা।
১৪। প্রতিষ্ঠানের ক্ষমতা প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার ক্ষুধা।
১৫। নিজের জৈবিক চাহিদাকে আত্মপ্রকাশের ধ্বংসময় ক্ষুধা।
১৬। নিজেকে দেখার এবং দেখানোর ক্ষুধা।
১৭। একটি কবিতা রচনার জন্য নিজের ওপর প্রচণ্ডভাবে অত্যাচার করার ক্ষুধা।
১৮। জীবনের ক্ষুধাকে কবিতার রসায়নে দাঁড় করাবার ক্ষুধা।
১৯। বহুবিধ সাবজেক্ট পজিশান উপস্থাপন করবার ক্ষুধা।
২০। সমাজে, নিচু তলার মানুষের দ্বারা ব্যবহৃত শব্দাবলীকে সাহিত্যে স্থান দেবার যন্ত্রণাময় ক্ষুধা।
২১। বাস্তবের সমস্ত স্বাদকে চেখে দেখার ক্ষুধা।
২২। নারীর দেহকে ছুঁয়ে দেখার ক্ষুধা।
২৩। শিল্পের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার ক্ষুধা।
২৪। কবিতা রচনার সমস্ত শখকে উড়িয়ে দেবার ক্ষুধা।
২৫। রক্ত, মাংস, কফ, যৌনতা ইত্যাদিকে মুঠোকরে ধরার ক্ষুধা।
২৬। আন্দোলনের জন্য সৃষ্টি করা শব্দ ও বাক্যকে কবিতায় ছড়িয়ে দেবার ক্ষুধা।
২৭। সমস্ত আক্রমণকে তুচ্ছ করে এগিয়ে যাবার ক্ষুধা।
২৮। আধুনিক কবিতা নামক ছাঁচ ভাঙার ক্ষুধা।
২৯। কবিতায় ছন্দের লীলা খেলার অবসান ঘটানোর ক্ষুধা।
৩০। কবিতায় আঙ্গিকহীন আঙ্গিক রচনা করার ক্ষুধা।
৩১। নান্দনিক সাহিত্য সৃষ্টিকারীদের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করার ক্ষুধা।
৩২। ঈশ্বরকে সন্দেহের আওতায় রাখার ক্ষুধা।
৩৩। ঔপনিবেশকে সাহিত্য থেকে বিতাড়নের ক্ষুধা। ইত্যাদি।

হাংরি আন্দোলনকারীরা যে ক্ষুধার কথা বললেন তা ব্যক্তি মানুষের দেহ সংক্রান্ত ক্ষুধা নয়, তারা প্রকৃতি সংসারের অন্তশীল সার্বিক আত্মসাৎ প্রক্রিয়ার ক্ষুধার কথা বলতে চেয়েছিলেন। এই ক্ষুধার প্রেক্ষিতেই মানব প্রকৃতি ও বিশ্বপ্রকৃতি একাত্ম হয়। ঔপনিবেশিক আধুনিকতার দিক থেকে অনেক আলোচক এই বিষয়টিকে কেবলমাত্র পেটের ক্ষুধা ও যৌনতার ক্ষুধা রূপে দেখতে চেয়েছেন ও ব্যাখ্যা করেছেন যা সঠিক নয়।

'হাংরি' শব্দটি বাংলা সাহিত্যে সম্পূর্ণ একটি আন্দোলনের নাম ; এটা কোনো গোষ্ঠী নয়, কোনো প্রতিষ্ঠান নয়, কোনো পত্রিকাও নয়। লেখাকে লেখকের অভিজ্ঞতালব্ধ চিন্তার বুননে আত্মপ্রকাশ করে পাঠকের চিন্তার সঙ্গে জুড়ে দিতে হাংরি কবি-সাহিত্যিকরা সচেষ্ট হয়েছেন। নান্দনিক 'সীমাস্বর্গের সাংস্কৃতিক ইন্দ্রাণী'র রাজনাধী ছেড়ে এঁরা চেষ্টা করেছেন জনতার ভাঙা ঘরে উঁকি দিয়ে তাদের হৃদয়ের যন্ত্রণাকে নতুনভাবে বলতে। যে বলাটা 'হাংরি' অর্থাৎ ক্ষুধার্ত ভাবকল্প। এসট্যাবলিশমেন্টের সস্তা চিন্তার বাট-কে বাছুরবিহীন করে দিয়েছিলেন হাংরি আন্দোলনকারীরা। তাই আতঙ্ক সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল প্রাতিষ্ঠানিক মসিহস্তীদের চিন্তাবিশ্বে।

"এস্টাব্লিশমেন্টের সাহিত্য মানে অ-পুস্তক নিয়ে ঢালাও ব্যবসা। আর তাকে সাহিত্য হিসেবে ফতোয়া দেওয়ার সত্যিকারের সাহিত্য গড়ে ওঠার যে প্রতিবন্ধকতা তার বিরুদ্ধে কব্জি কষার জন্যেই ঐতিহ্যসূত্রে আন্দোলন শুরু করেছেন এস্টাব্লিশমেণ্ট বিরোধী তরুণ কবি সাহিত্যিকরা। ...সাম্প্রতিক কালে তরুণদের আন্দোলন কেবল লেখা ছাপানোর সুযোগ পাওয়া এবং অর্থনৈতিক সমস্যা মেটানোর আন্দোলন না হয়ে বাংলা সাহিত্যে সত্যিকারের বিপ্লব ঘটিয়ে নতুন কিছু সৃষ্টির বিদ্রোহী তৎপরতা। ...তবে 'হাংরি জেনারেশন' আন্দোলনটাই এদের মধ্যে পুলিশী তৎপরতার ফলে সাধারণ মানুষের কাছে নামমাত্র একটু বেশী পরিচিত। এ আন্দোলনের প্রচার পাবার অন্য কারণও অবশ্য আছে। সাহিত্য সম্পর্কিত এই আন্দোলন সুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই বড় ও বহুল প্রচারিত পত্রিকাগুলো তরুণ লেখকদের লেখালেখিকে অশ্লীল এবং ব্যাভিচারী রচনা বলে আখ্যা দিয়ে আক্রমণ করে তাদের ভিটেয় পুলিশ চড়ায় এবং পুলিশী তৎপরতার ফলাও প্রচার করে। লোকে তাদের রচনা বড় একটা পড়েনি ; কেবল 'ইসলাম বিপন্ন' গোছের রেওয়াজেই সামাল সামাল বর তুলে হাংরি জেনারেশনের দাঁত থেকে সাহিত্য সরস্বতীর অতিশুদ্ধ ক্ষীণ সতীত্বকে রক্ষা করতে পুলিশ আদালত করেছে। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সাহিত্য করার জন্যে মলয় রায়চৌধুরী দণ্ডিত হয়েছেন এবং অন্যান্য কয়েকজন হাজতবাস করেছেন।"[১৫]

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের তরুণ কবিদের উদ্দেশ্য ছিল বাংলা সাহিত্যে পালাবদল। কিন্তু তাঁরা ছিলেন অনেকটা ত্রিশ ও চল্লিশের কবি-সাহিত্যিকদের আলোয় আলোকিত। বিশেষ করে বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকার দ্বারা বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের অনেক কবি হাংরি আন্দলনের তরুণদের দ্বারা আনা পালাবদলে আকৃষ্ট হয়ে তাঁদের সঙ্গে শরিক হতে ভিড় করেছিলেন। এঁদের অন্যতমরা হলেন— শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সমীর রায়চৌধুরী, বিনয় মজুমদার, উৎপলকুমার বসু, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

হাংরি আন্দোলনের উৎস সম্পর্কে অরবিন্দ প্রধান দ্বিমুখী কারণ আবিষ্কার করেছেন। তাঁর মতে— "একদিকে স্বাধীন ভারতবর্ষে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ভারতীয় পুঁজির নবরূপায়ণ, এবং অপরদিকে দেশ ভাগে পশ্চিমবাংলার পুঁজি-কাঠামোয় তীব্র আঘাত, প্রথমত পাটখেতগুলো পূর্বপাকিস্থানের অন্তর্গত হবার ফলে চটকলগুলোর ক্রমঅসুস্থতা, যা আর সারেনি, এবং দ্বিতীয়ত, অকস্মাৎ লক্ষ লক্ষ উদবাস্তুর আগমন, যাঁদের জীবনে সৎমূল্যবোধ ও নীতি ঐতিহ্যের পরিসর ছিল অসম্ভব, যে রোগ থেকে পশ্চিমবঙ্গ আর বেরিয়ে আসতে পারেনি। হাংরি আন্দোলনে তাই দুটি ভিন্ন চিন্তাধারা বইতে দেখা গিয়েছিল। একটি ধারা তাঁদের, যাদের পরিবার দেশভাগের আগে থাকতে ভারতবর্ষে ছিলেন। এই দুটি ধারাতেও বিভাজন ছিল বর্গের, বর্ণের, সামাজিক পৃষ্ঠপটের, পারিবারিক ঐতিহ্যের, পঠন-পাঠনের বাড়ির কথ্য ভাষার, নিবাসগৃহের, পরিবেশের, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের, নিজস্ব আয়ের এবং আরও বেশ কিছু প্রতিস্ব-নির্মাণ উপাদানের।"[১৬] হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে শক্তি চট্টোপাধ্যায় ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে 'সম্প্রতি' পত্রিকায় লিখেছেন— "বিদেশে সাহিত্যকেন্দ্রে যে সব আন্দোলন বর্তমান হচ্ছে, কোনোটি বিট জেনারেশন, অ্যাংরি বা সোভিয়েত রাশিয়াতেও সমপর্যায়ী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে যদি বাংলাদেশেও কোনো অনুক্ত বা অপরিষ্কার আন্দোলন ঘটে গিয়ে থাকে তবে তা আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক বা সামাজিক পরিবেশে 'ক্ষুধা আক্রান্ত' আন্দোলনই হওয়া সম্ভব। ওদিকে এদেশে সামাজিক অবস্থা অ্যাফলুয়েণ্ট,

এরা বিট বা অ্যাংরি হতে পারে। আমরা কিন্তু ক্ষুধার্ত। যে কোনো রূপের বা রসের ক্ষুধাই একে বলতে হবে। কোনো রূপ বা কোনো রসই এতে বাদ নেই, বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। একে যদি বিট বা অ্যাংরি দ্বারা প্রভাবিত বলার চেষ্টা হয় তবে ভুল বলা হবে। কারণ এ-আন্দোলনের মূল কথা 'সর্বগ্রাস'।"[১৭] অরবিন্দ প্রধানের চিন্তা আংশিক গ্রহণযোগ্য হলেও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতে হাংরি আন্দোলনের ক্ষুধা 'সর্বগ্রাস' সেটা সম্পূর্ণ সত্য।

আধুনিকতা নামক শব্দটাকে অস্বীকার করেছেন হাংরি আন্দলনকারীরা। তাই শৈলেশ্বর ঘোষ বলেন— 'আধুনিকতার শরদেহের উপর উল্লাসময় নৃত্যের নাম হাংরি জেনারেশন।' হৃদয়ের সত্যকে আবিষ্কার করতেই এঁরা 'ক্ষুধা' শব্দটাকে বেছে নিয়েছিলেন। তাই উত্তরাধিকার সূত্রে যুগ যুগ চলে আসা মূল্যবোধকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তাঁরা চেষ্টা করেছেন সমস্ত কিছু উলঙ্গ সত্যের সহজাত চিন্তায় প্রস্ফুটিত করতে। নান্দনিক চিন্তাবীজ বয়ে আনা হাজার হাজার বছরের নির্যাতনের প্রতিবাদকল্পে আন্দোলনের জন্ম দিলেন হাংরি-কবি-সাহিত্যিক সম্প্রদায়। তাই তাঁরা অন্ত্যজ, ছোটলোক ইত্যাদি। হাংরি আন্দোলনকারীরা বাস্তবিক মানুষ হিসেবে নিজেদেরকে আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন বলে অবিশ্বাস থেকে বিশ্বাসে, ভণ্ডামী থেকে সত্যের সন্ধানে উত্তরণের জন্য জীবনকে নানাভাবে ভোগ-সুখ-দুঃখ দ্বারা পরিচালিত করেছেন। এঁরা ব্যক্তি 'আমি'কে অস্বীকার করেও আমিত্বের মাধ্যমে সর্বজনীন নগ্ন সত্যকে উদ্ঘাটিত করতে আছড়ে পড়েছিলেন সমাজ নামক অঘোষিত ঘোষণা পত্রে। এখান থেকেই এঁদের যাত্রা এগিয়ে গেছে বাংলা সাহিত্যের তৎকালীন কারখানা ঘর চুরমার করে।

ইশতিহার ভিত্তিক আন্দোলন কিংবা ইশতিহার ভিত্তিক সাহিত্য একথা হাংরি আন্দোলনের পূর্বে কেউ ভাবেননি। একটা কবিতা নিয়ে ইশতিহার। কয়েকটা বিবেচ্য বিষয় নিয়ে ইশতিহার। কবিতা সম্পর্কিত কয়েক বাক্যের কথা নিয়ে ইশতিহার। রাজনীতি, ছোটগল্প, ধর্ম, জীবন, ছবি, অশ্লীলতা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর খণ্ড কথার ইশতিহার প্রকাশ করেন হাংরি আন্দোলনকারীরা। তাক-লেগে যায় সাহিত্য জগতে। যে জিনিস সারা বিশ্ব কেউ ভাবেনি, সে জিনিস ভাবতে সক্ষম হয়েছিলেন 'আউটসাইডার' তরুণ কয়েকজন যুবক। এর ফলেই পৃথিবীর ইতিহাসে হাংরি আন্দোলনকারীরা যুগান্তকারী হয়ে উঠলেন, আর কলকাতার প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্যিকদের কাছে এঁরা অশ্লীল কবি আখ্যায়িত হন।

হাংরি আন্দোলনের চেষ্টা ছিল প্রতিষ্ঠানের বিরোধীতা করা। যেমন 'কল্লোল' এবং তার পরবর্তী 'কালিকলম', 'পরিচয়', 'প্রগতি', 'কবিতা', ইত্যাদি পত্রিকা গোষ্ঠীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল— সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের বিরোধীতা করা। হাংরি আন্দোলন প্রতিষ্ঠান বিরোধী হিসেবে জানা যায় তাঁদের বিলিকরা ইশতিহার দেখে। তাঁরা কোনো দিনও ইশতিহার বা পত্রিকা বিক্রি করার চেষ্টা করেননি। এই টার্ন পরবর্তী অনেক আন্দোলনই বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। অনেক পত্রিকা গোষ্ঠীও পরবর্তীতে তাঁদের প্রকাশিত সকল প্রয়াসকে বিনামূল্যে বিলি করেছেন। হাংরি আন্দোলনকারীদের মধ্যে যাঁরা সে সময় গ্রন্থ প্রকাশ করেন সেগুলোও তাঁরা বিনামূল্যে নিজের খরচে ডাকে অথবা নিজে বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসতেন। এঁদের মধ্যে অনেকের গ্রন্থের স্বত্বও পর্যন্ত ছিল না এবং এখনও স্বত্ব বিহীন গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁদের মধ্যে মলয় রায়চৌধুরী অন্যতম।

হাংরি আন্দোলনকারীরা দ্বিমুখ চিন্তার বেড়াজাল ভেঙে দেবার চেষ্টা করেছেন বাস্তব জীবনে এবং সাহিত্যে। তাই তাঁদের জীবন সাহিত্য সম্পর্কযুক্ত। হাংরি আন্দোলনকারীর অনেকেই স্টেশনে ভিখারির বিছানায় রাত কাটিয়ে দেখেছেন। কেউ মদ, গাঁজা, ভাঙ্গ, চরস সব কিছুর নেশা অনুভব করেছেন। বেশ্যালয়ে রাত্রি যাপন করে তাকে চুমু দিয়েছেন। বড় (স্টার) হোটেলে খেয়েছেন। কয়েকদিন অনাহারে থেকে দেখেছেন। ঝোপড় পট্টির নিষিদ্ধ ঘরে উঁকি দিয়েছেন। রাস্তায় চিৎকার করে কবিতা পড়েছেন, ইত্যাদি। যৌবনের সকল আনন্দ ও বিষাদ উপলব্ধি করেছেন। তাঁরা ভালো-মন্দের তফাত বোঝেন না। তাঁদের কাছে ভগবান-শয়তানের পার্থক্য নেই। তাঁরা বোঝেন না— সৃষ্টি-ধ্বংস, শক্ত-দুর্বল, সংস্কৃতি-অপসংস্কৃতি, সতী-অসতী, নায়ক-খলনায়ক, প্রিয়-অপ্রিয়, আসল-নকল, সুস্থ-অসুস্থ, সাদা-কালো, ছোট-বড় ইত্যাদি।

হাংরি আন্দোলনকে অনেকে নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু হাংরি হচ্ছে সম্পূর্ণ সাহিত্য আন্দোলন। কেউ-বা হাংরি আন্দোলনকে নকশাল আন্দোলনের পূর্ববর্তী পর্যায় বলে উল্লেখ করতে চেষ্টা করেছেন। এ ক্ষেত্রে অনেকের বিচার এই যে, হাংরি আন্দোলনকারীরা রাজনৈতিক ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু ভালোভাবে চিন্তা করলে— সেই ম্যানিফেস্টোর মধ্যে রাজনীতি সম্পর্কে ঘৃণনীয় চিন্তারই বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা গেছে।

হাংরি আন্দোলন কবিতা ভিত্তিক এবং সেই কবিতার প্রধান কারিগর মলয় রায়চৌধুরী। হাংরি আন্দোলনকারী কবিদের রচনায় যে বিস্ফোরক ধাক্কাতন্ত্র ঘোষিত হয়েছে— তা স্বভাবতই শব্দব্রহ্ম। সে শব্দ অশ্লীল, ঘৃণনীয়। তাই সেই সময়কার বুদ্ধিজীবী, প্রতিষ্ঠিত, নান্দনিক চিন্তারোগে বিকারগ্রস্থ ব্যক্তিদের কাছে এঁদের কবিতা মূর্খের প্রলাপ মাত্র। স্বভাবতই প্রথম পাঠে সকলকেই একটা ঝাকুনি দেয়, কবিতার মৌলিকত্ব ওইখানেই। হাংরি আন্দোলনকারীদের কবিতা পাঠে বোঝা যায় এঁরা সকলে সমান চিন্তায় চিন্তিত হতে খাগঅস্ত্র হাতে নিয়ে একটা পরিবর্তন চেয়েছিলেন, যা সম্পূর্ণ সফল। কিন্তু হাংরি শরিক কবিদের কবিতায় বলার ধরনটা অশ্লীল হলেও কাব্য নির্মিতির ক্ষেত্রে এক নতুন শিল্প সংযোজন সন্দেহ নেই। এতে বাস্তব জীবনে নিচু তলার মানুষদের দৈনন্দিন জীবন চিত্র নাট্যরূপ পেয়েছে বলা যায়।

হাংরি আন্দোলনে আনা পালাবদলের মধ্যে প্রধান হচ্ছে— ভাষা, বিষয় এবং আঙ্গিক। তাই এই ভাষা এবং বিষয়কে অতিক্রম করে যাবার সাহস ও শক্তি পরবর্তী সকল সাহিত্যিক আন্দোলন ও আন্দোলনকারীর ক্ষমতা বহির্ভূত। আর তার ফলেই হাংরি আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে যুক্ত হয় নতুন মাত্রা। চলে ভাঙা-গড়া। শুরু হয় আক্রমণের পালা। তাই অনেকে হাংরি আন্দোলনকে অন্তর্ঘাতমূলক সাহিত্য আখ্যায়িত করেন। 'অন্তর্ঘাতমূলক' বলার মূলে রয়েছে— সাহিত্য রচনার মাধ্যমে আক্রমণ। সেই আক্রমণ সমাজের নিম্নস্তরের মানুষের প্রাত্যহিক জীবনলিপি। হাংরি আন্দোলনকারীর অনেকেই ঘোষণা করেছেন, তাঁরা কবি নন। জীবন সম্পর্কে নিজস্ব কিছু চিন্তাকে যাঁরা কবিতা নাম দিয়ে কল্পনার মধু ঝরান তাঁদের ভাবনায় আঘাত হানাই হাংরি আন্দোলকারীদের উদ্দেশ্য ছিল। যা বাস্তব সত্য তাকে অস্বীকার করে আধুনিক নাম দিয়ে যারা সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে অক্ষরের বোঝা বাড়ান তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণাই হাংরি আন্দোলন বা হাংরি আন্দোলন ভাবনা। সমীর চৌধুরী তাঁর 'হাংরি জেনারেশন

কেন’ রচনায় উল্লেখ করেছেন— “Jeff Nuttal ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর ‘Bomb Culture’ গ্রন্থে হাংরি জেনারেশন আন্দোলনকে পৃথিবীর অন্যতম উল্লেখযোগ্য সাহিত্য আন্দোলন স্বীকার করে নিয়ে এই আন্দোলনকে Underground আখ্যা দিয়েছেন ‘Under-ground has its own aristocracy an aristrocracy of absence.’”[১৮]

পৃথিবীর সমস্ত কিছু পরিবর্তনশীল। সেই অর্থে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসা স্বাভাবিক। বাংলায় সেই পরিবর্তনের ভগীরথ হাংরি আন্দোলনকারী শরিকবৃন্দ। এঁরা চেষ্টা করেছেন বাস্তব সমাজ ও সাহিত্যে সমস্ত ভণ্ডামির বিরুদ্ধে তলোয়ার চালাতে। কলমরূপ তলোয়ারের শান তথাকথিত উত্তরাধিকার সূত্রে বহন করে আনা নান্দনিক চিন্তার মুণ্ডচ্ছেদন করতে সক্ষম হয়েছেন হাংরি আন্দোলনকারীরা। এরাই প্রথম সার্থক হয়েছেন এস্ট্যাবলিশমেন্টের বিরুদ্ধে মসিযুদ্ধ করতে। বাংলা সাহিত্যে এমন আন্দোলনের প্রয়োজন ছিল সেটা আজ আমরা অনুভব করছি। শুধু আমরাই নয়, সমস্ত সৎ সাহিত্য প্রেমী গবেষক হাংরি আন্দোলনের শক্তিশালী মতবাদের কাছে ঋণী। তাঁদের প্রায় সকল ইশতিহারই উদ্দেশ্য প্রণোদিত। তবুও আমরা সেই ইশতিহারের মধ্যে মজাই অনুভব করি। হাংরি আন্দোলনের ৪৮ নং ইশতিহারে অনিল করঞ্জাই এবং করুণানিধান মুখোপাধ্যায় লিখছেন—

“

হাংরি জেনারেশন নং ৪৮

অনিল করঞ্জাই এবং করুণানিধান মুখোপাধ্যায় লিখিত
হাংরি আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত ইশতিহার

সৃজনের প্রধান কাজ হল মানুষকে তার জীবন-সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করা। একজন চিত্রকর বিভিন্ন উপায়ে তাঁর সৃজনের মাধ্যমে এ-কাজ করতে পারেন। আমাদের প্রধান কাজ হল জীবনের সেই দিকগুলোর দিকে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেগুলো আর্থসামাজিক অবস্থার জন্য অবহেলিত। একজন চিত্রকর অন্য সবায়ের মতই জনগণের অংশ। তাই তিনি একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব।

সম্মিলিতের সমর্থন ছাড়া একজন চিত্রকর তাঁর কর্তব্য পালন করতে পারেন না। আমাদের বর্তমান সমাজে যেখানে ছবি-আঁকার পৃষ্ঠপোষকতা প্রধানত ধনিক বর্গের কাছ থেকে আসে, বহু চিত্রকর তাঁদের পৃষ্ঠপোষকদের তত্ত্ববিশ্বে বশীভূত হয়ে আত্মসমর্পণ করেন। চিত্রকরের নৈতিক সাহস প্রয়োজন। তাঁর উচিত এই সমাজের ক্ষমতাধারীদের পৃষ্ঠপোষকতা বর্জন করে নিজের লক্ষ্যে স্থির থাকা।

ছবি আঁকা এমন একটি লোকায়ত মাধ্যম যার দ্বারা কোনো প্রকার আপোস না করে সৃজনকর্মকে বৃহত্তর জনগণের কাছে পৌঁছে দিয়ে শিল্পের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরা যায়। একটি পেইনটিং বা ড্রইংয়ের প্রতিলিপি সূচনা হিসাবে কার্যকর হতে পারে কিন্তু তাতে মূল ছবির সমস্ত বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে না। তা ছবিটির বাস্তবকে বিকৃত করে। অন্যদিকে, চিত্রকর যেহেতু একটি বিশেষ প্রভাব সৃষ্টির জন্য সম্মোহন ও কল্পনা করেন, তাতে সেরকম সুপ্ত বিবাদ থাকে না।

আত্মসম্মানবোধহীন চিত্রকর, নিজের কথা ভুলে গিয়ে, ধনীপুত্রকন্যাদের কথা মাথায় রেখে কেবল পার্থিব স্বাচ্ছন্দ্য সুনিশ্চিত করেন, তাদের রুচি ও প্রয়োজন আয়ত্ত করেন। হাংরি জেনারেশনের চিত্রকর সম্পূর্ণ স্বাধীন। তাঁর তুলির ডগায় আছে আলো। চিত্রকর হলেন আমাদের সমাজের বিবেকে রক্ষক, দ্রষ্টা, জাদুকর, অশুভের বিনাশকারী। ছবি আঁকায় ভান করা অমার্জনীয়।”[১৯]

মলয় রায়চৌধুরী, সুবিমল বসাক, প্রদীপ চৌধুরী, সমীর রায়চৌধুরী প্রমুখের ভাষ্য মতে হাংরি আন্দোলনের সময়-সীমায় প্রায় ১০৭-টি ইশতিহার বা বুলেটিন প্রকাশিত হয়। তারমধ্যে বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি, ইংরেজি-হিন্দি-বাংলা, বাংলা-হিন্দি ইত্যাদি দ্বিভাষা, ত্রিভাষার বুলেটিনও রয়েছে। হাংরি আন্দোলনের বুলেটিন প্রকাশের নির্দিষ্ট সময় ছিল না, তাই কখনও অর্ধ-সপ্তাহে, কখনও সপ্তাহে, কখনও পনেরোদিনে, কখনও মাসে প্রকাশিত হত। বুলেটিন বা ইশতিহারগুলো যে একদিন ইতিহাসের মহামূল্যবান জায়গা দখল করে বসবে সেই চিন্তাও কারো মাথায় আসেনি। শুধু সাহিত্যে পালাবদল করার জন্যই আন্দোলন— একথা মাথায় রেখে ইশতিহারগুলো প্রকাশ হতে থাকে। সবচেয়ে বড় কথা— হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত সকলেরই অধিকার ছিল ইশতিহার বা বুলেটিন প্রকাশ করার। তাই অফিস অথবা সম্পাদকীয় কোনো দফতর না থাকায় সেগুলো সংগ্রহে থাকেনি।

মজার মজার ঘটনার মধ্যে হাংরি আন্দোলনের ইশতিহারগুলোতে ধর্ম-বিষয়ক মতামত, রাজনৈতিক মতামত, আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মতামত, হাংরি প্রতিসন্দর্ভের সঙ্গে তুলনা করে প্রথাগত সাহিত্য সন্দর্ভমূলক মতামত প্রকাশ হয়। হাংরি আন্দোলনের ইতিহাস এবং তার মজাগুলো আলোচনা করতে গিয়ে হাংরি আন্দোলনের ধর্ম সম্পর্কিত ইশতিহার হুবহু তুলে দেওয়া হল ঃ

"

হাংরি জেনারেশন নং ৬৫

হাংরি আন্দোলনের ধর্ম সম্পর্কিত ইশতিহার

১. ঈশ্বর জঞ্জাল।
২. মানুষের ভেতর ও বাইরের স্বখাদক – প্রণালীর দ্বন্দ্ব হল ধর্ম যা আত্মরেতঃপাত থেকে ঘোর কাণ্ডজ্ঞানহীনতায় মানুষকে নিয়ে যায়।
৩. ধর্ম ওরফে গারদস্থিত আমি, যে, ঈশ্বরকে মুণ্ডু দিয়ে হাঁটতে শেখায়।
৪. ধর্ম হল খুন, ধর্ষণ, আত্মহত্যা, নেশা, অজাচার, বিষ, বলাৎকার, মস্তিষ্ক-বিকৃতি, আসক্তি, অনিদ্রা, রূপান্তর এবং 'আমি চালিয়ে যাই'।
৫. ধর্ম হল বস্তু ও অবস্তুকে দখলে রাখার মন্তর, তাদের সঙ্গে লেপটে থেকে মানিয়ে নেবার চালাকি। শ্রেষ্ঠ মানুষই নিজেকে শূন্যগর্ভ করে রাখে যাতে সমস্ত কিছু তার প্রতি আকৃষ্ট হয়, সে ততক্ষণ সবই গ্রহণ করতে থাকে যতক্ষণ না সে নিজেই তাদের নায়ক হয়ে উঠছে।
৬. ধর্ম হল নঙদাসের আত্মফোঁপর।
৭. ধর্ম হল একটা বিশাল যৌনগহ্বর যা থেকে বের হয় আত্মহত্যার ক্ষিপ্ত অসুস্থতা যা আমার নিজত্বকে গেঁথে তোলে।
৮. ধর্ম একরকমের আইন যা ঘোষণা করে ঃ যে নিজের রক্ত মাংস না বেঁচে অন্যের বানানো বিশ্বাসে বাঁচে সে কুকুর।
৯. ধর্ম মানে আমার সঙ্গে আমি, আমার আমি, আমার থেকেই আমি, আমার দ্বারা আমি, আমাকে বাদ দিয়ে আমি, এবং আমিই আমি।

সম্পাদক ঃ দেবী রায়। হারাধন ধাড়া কর্তৃক ২৬৯ নেতাজি সুভাষ রোড, হাওড়া হইতে প্রকাশিত। ",[২০]

হাংরি জেনারেশনের ১৫ নং ইশতিহারটি রাজনীতি সম্পর্কিত। হাংরি আন্দোলনকারীরা রাজনীতিকে কীভাবে দেখতেন তা ফুটিয়ে তুলেছেন উক্ত ইশতিহারে। রাজনৈতিক মতবাদ এবং

তা যে বেশ্যার থেকে অধম তাই মজাকরে ইশতিহারটিতে প্রকাশ করা হয়েছে। ইশতিহারটি নিম্নরূপ ঃ

"

হাংরি জেনারেশন নং ১৫
হাংরি আন্দোলনের রাজনৈতিক ইশতিহার
১. প্রতিটি ব্যক্তিমানুষের আত্মাকে রাজনীতিমুক্ত করা হবে। ২. প্রাতিস্বিক মানুষকে বোঝান হবে যে অস্তিত্ব প্রাক-রাজনৈতিক। ৩. ইতিহাস দিয়ে বোঝান হবে যে, রাজনীতি আহ্বান করে আস্তাকুড়ের মানুষকে তার সেবার জন্যে টানে নান্দনিক ফালতুদের। ৪. এটা খোলসা করে দেয়া হবে যে গান্ধির মৃত্যুর পর এলিট ও রাজনীতিকদের মধ্যে তুলনা অসম্ভব। ৫. এই মতামত ঘোষণা করা হবে যে রাজনৈতিক তত্ত্ব নামের সমস্ত বিদগ্ধ বলাৎকর্ম আসলে জঘন্য দায়িত্বহীনতা থেকে চাগিয়ে-ওঠা মারাত্মক এবং মোহিনী জোচ্চুরি। ৬. বেশ্যার মৃতদেহ এবং গর্দভের লেজের মাঝামাঝি কোথাও সেই স্থানটা দেখিয়ে দেয়া হবে যেটা বর্তমান সমাজে একজন রাজনীতিকের। ৭. কখনও একজন রাজনীতিককে শ্রদ্ধা করা হবে না তা সে যে-কোনো প্রজাতি বা অবয়বী হোক না কেন। ৮. কখনও রাজনীতি থেকে পালান হবে না এবং সেই সঙ্গে আমাদের কান্তি-অস্তিত্ব থেকে পালাতে দেওয়া হবে না রাজনীতিকে। ৯. রাজনৈতিক বিশ্বাসের চেহারা পালটে দেয়া হবে।
সম্পাদক ঃ দেবী রায়। হারাধন ধাড়া কর্তৃক ২৬৯ নেতাজি সুভাষ রোড, হাওড়া থেকে প্রকাশিত।

"[২১]

হাংরি আন্দোলনের ১০ নং ইশতিহারটি ইতিহাসের প্রামাণিকতার জন্য উল্লেখযোগ্য। এই ইশতিহারটি মজা করে লেখা হলেও এর মধ্যে হাংরি আন্দোলনের উদ্দেশ্যই ঘোষিত হয়। সম্পাদক বিহীন ইশতিহারটি দেখে নেওয়া যাক ঃ

"

হাংরি জেনারেশন নং ১০
হাংরি আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত ইশতিহার
১. অ্যারিস্টটলের বাস্তবকে কখনও নকল করা হবে না, কিন্তু বলাৎপ্রস্তুতির মাধ্যমে আচমকা জাপটে ধরতে হবে অপ্রস্তুত ছেনালি অস্তি। ২. নৈঃশব্দকে অটুট রেখে নির্বাককে বাঙ্‌ময় হয়ে উঠতে হবে। ৩. ঠিক সেই-রকম সৃষ্টি উন্মার্গে চালিত হতে হবে যাতে আগে থাকতে তৈরি পৃথিবীকে চুরমার করে পুনর্বার বিশৃঙ্খলা থেকে শুরু করা যায়। ৪. লেখকের চেতনাকে বর্জন করে প্রতিটি অন্য বোধ-জরায়ুকে কাজে লাগান হবে। ৫. ফাঁস করে দেয়া হবে যে, কেবল কান্তি-সত্তা হিসেবেই জীবন ও অস্তিত্ব স্বীকৃত। ৬. অন্যের প্রদত্ত বোধ-জ্ঞানের চেয়ে বরং সমস্তরকম সন্দেহ ও অসহায়তাকে গ্রহণ করা হবে। ৭. দ্বিপদ উন্নতিকামী প্রাণীদের তাবৎ মূল্যবোধকে আক্রমণ করে ছারখার করা হবে। ৮. চরম সততার উদ্দেশ্য সব রকম চাটুকারদের মাগিদের শপথপূর্বক পরিত্যাগ করা হবে। ৯. আত্ম-আবিষ্কারের পর লেখা আর আঁকা ছেড়ে দেয়া হবে।

"[২২]

হাংরি জেনারেশনের বেশিরভাগ ইশতিহার আন্দোলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত। কিন্তু হাংরি জেনারেশনের ১০৭ নং ইশতিহারে প্রথগত সাহিত্য সন্দর্ভের তুলনা প্রকাশিত হয়। ইতিহাসের তথ্য নির্বাচনে নিম্নোল্লিখিত ইশতিহারের গুরুত্ব সীমাহীন। সুবিমল বসাক হিন্দি কবি রাজকমল চৌধুরীর সঙ্গে যৌথভাবে একটি বাংলা-হিন্দি-ইংরেজি ভাষায় সাইক্লোস্টাইল করা ত্রিভাষিক ইশতিহার প্রকাশ করেন। এটিই হাংরি আন্দোলনের সর্বশেষ ইশতিহার। নক্‌শাকারে ইশতিহারটি দেখে নেওয়া যাক ঃ

“

হাংরি জেনারেশন নং ১০৭

প্রথাগত সাহিত্য সন্দর্ভ	হাংরি প্রতিসন্দর্ভ
প্রাতিষ্ঠানিক	প্রতিষ্ঠানবিরোধী
শাসক সম্প্রদায় (টিরানি)	শাসক বিরোধী (প্রটেস্টার)
ভেতরের লোক (অন্দরুনি)	বহিরাগত (হামলাবোল)
এলিটের সংস্কৃতি (ঢাকোস্‌লা)	জনসংস্কৃতি
তৃপ্ত	অতৃপ্ত
আসঞ্জনশীল (কোহেসিভ)	খাপছাড়া (ব্রিটল)
লোকদেখানে (দিখাওয়া)	চামড়া ছাড়ানো (র বোন)
জ্ঞাত যৌনতা (পরিচিত)	অজ্ঞাত যৌনতা (অপরিচিত)
সোশিয়্যালাইট	সোশিয়েবল
প্রেমিক (দুলারা)	শোককারী (মোর্নার)
একসট্যাসি	অ্যাগনি
নিশ্চল (আনমুভড)	তোলপাড় (টার্বুলেন্ট)
ঘৃণার ক্যামোফ্লাজ	খাঁটি ঘৃণা
আর্ট ফিল্ম	জনগণ (সিনেমা)
শিল্প	জীবন সমগ্র
রবীন্দ্র সংগীত (সুগম সংগীত)	যে কোনো গান
স্বপ্ন (ড্রিম)	দুঃস্বপ্ন (নাইট মেয়ার)
শিষ্ট ভাষা (টিউর্ড)	গণভাষা (গাট ল্যাংগুয়েজ)
রিডিমড (দায়মুক্ত)	আনরিডিমড (দায়বদ্ধ)
ফ্রেমের মধ্যে	ফ্রেমহীন (কনটেক্সটেটরি)
কনফরমিস্ট (অনুগত)	ডিসিডেন্ট (ভিন্নমতাবলম্বী)
উদাসীন (ইনডিফারেন্ট)	এথিকস-আক্রান্ত
মেইনস্ট্রিম (মূলস্রোত)	ওয়াটারশেড (জলবিভাজিকা)
কৌতূহল	উদ্‌বেগ
আনন্দ (এন্ডোক্রিন)	উৎকণ্ঠা (অ্যাড্রেনালিন)
পরিণতি অবশ্যম্ভাবী	উন্মেষের শেষ নেই
সমাপ্তি প্রতিমা (অনুষ্ঠান)	সতত সৃজ্যমান (উৎসব)
ক্ষমতাকেন্দ্রিক (সিংহাসন)	ক্ষমতাবিরোধী (সিংহাসন ত্যাগী)
মনোহরণকারী (এন্টারটেইনার)	চিন্তাপ্রদানকারী (থটপ্রোভোকার)
আত্মপক্ষ সমর্থন	আত্মআক্রমণ
আমি কেমন আছি (একপেশে)	সবাই কেমন আছে
প্রতিসম	অসম্বন্ধ (ট্যাটার্ড)
ছন্দের অ্যাকাউন্টেন্ট	বেহিসেবি ছন্দ খরচ
কবিতা নিখুঁত করতে কবিতা রিভাইজ	জীবনকে প্রতিনিয়ত রিভাইজ
কল্পনার খেলা	কল্পনার কাজ

সম্পাদক ঃ সুবিমল বসাক এবং রাজকমল চৌধুরী ”২৩

পোস্টার-কবিতা এবং কোলাজ-কবিতার জন্ম হাংরি আন্দোলনকারীদের হাতে। বাংলা সাহিত্যে যাঁদের নাম পোস্টার-কবিতা এবং কোলাজ-কবিতার ইতিহাসে প্রথম স্থান দেবার যোগ্য তাঁরা হলেন হাংরি আন্দোলনের দুই বিশিষ্ট পুরুষ— অনিল করঞ্জাই ও করুণানিধান মুখোপাধ্যায়। হাংরি আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগকারী চিত্রকর অনিল করঞ্জাই। তিনিই ভারতীয় পেইনটিং এবং ইন্সটলেশনে প্রথম মর্ফোলজিকাল ইলিউশান, মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউণ্ড রেডিয়েশান, মাল্টিস্কেলিভ, ডিপ্রোপোরশনিভ, ডিপার্সপেক্টিভাইজেশান ইত্যাদির জন্মদাতাও। কিন্তু পশ্চিমবাংলা তাঁকে যোগ্য সম্মান দেয়নি। আমেরিকায় অনিল করঞ্জাইয়ের ছবি দেখে আর্টদক্ষ চিত্রকররা স্বীকার করেছিলেন যে, হাংরি আন্দোলনে সামিল হয়ে আঁকা তাঁর 'সাইকেডেলিক' চিত্রগুলো পৃথিবীখ্যাত। তাই বলা যায়— "হাংরি কাউন্টার-ডিসকোর্স একটি মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল।"[২৪]

দেবী রায় এবং মলয় রায়চৌধুরীর সম্পাদনায় শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি মাত্র কবিতা নিয়ে হাংরি জেনারেশন ইশতিহার প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত ইশতিহারগুলো দেখে তখন কলকাতায় বুদ্ধিজীবীরা রীতি মতো আতঙ্কিত। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মজাদার কবিতা সহ হাংরি আন্দোলনের তিন নম্বর ইশতিহারটি প্রকাশিত হয়। ইশতিহারটির খণ্ডাংশ আলোকপাত করা যাক ঃ

" হাংরি জেনারেশন নং ৩

শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখিত

সীমান্ত প্রস্তাব ১-মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি নিবেদন

একটি ভিখারি ছেলে ভালোবেসে দেখেছিল ভাত
আর পরখ করেছিল
জ্যোৎস্নায় ছড়ানো ধানগাছগুলি, ধানের গোড়ায়
স্তব্ধ জলভরা মাখনের
মাটির সাবলীলতার চিকন-ফাঁপানো ধান,
ধানগুলি ভাত হতে পারে ?
নির্বাক দেবতা কথা বলতে পারে
লোহা বলতে পারে
কাঠের ভূভাগ পারে চিৎ হতে নারীদের মতো ?
তবু সে ভিখারি ছেলে ভালোবেসে দেখেছিল ভাত।
ভালোবেসে দেখেছিল, বহুতর দর্শন জীবনে
জীবন ছেড়েও কতো, গাঁজায় আক্রান্ত হয়ে কতো
জীবনেও ধান ছাড়া, নারী ছাড়া, জ্যোৎস্নাটুকু ছাড়া
ওপরে কি যেন আছে ?
সবারই ওপরে আছেন ভগবান পান্থ-নির্যাতনে
সবারই ওপরে আছেন ভগবান পরিব্রহ্মাভার
সবারই ওপরে আছেন ভগবান মানুষের হয়ে
ভিখারির ছেলেটিকে দুটি ভাত দেবার ব্যস্ততায়
ঘাসের মতন সমসাময়িক, ঘাসের চেয়েও মত্ত
পৌঁছে দিতে সব।

ভিখারির ভালো ছেলে ছাড়া ছিল বহু মন্দ ছেলে
তারা ভালোবাসা নিয়ে মাখামাখি করেনি কখনো
তারাও তো বেঁচে আছে তারাও তো আছে অনাবিল
আমলকির মতো কত ভালো ধরনের ফলই
পৃথিবীতে আছে
ভিখারির ভালো ছেলে মন্দ ছেলে ঝরে গেছে
ভিখারির বাবার পেট থেকে
অপরূপ উলোট-পালট হয়ে পৃথিবীতে ঘটনা এখন
চীনাদের শান্তি মুক্তি বিষণ্ণতা।

সম্পাদক ঃ দেবী রায়, মলয় রৌয়চৌধুরী ”[২৫]

হাংরি আন্দোলন যখন চরমে তখন এই আন্দোলনকে দমিয়ে দেবার জন্য নানান প্রচেষ্টা চলে। পুলিশ দিয়ে ভয় দেখানো হয়। সেই সময় কলকাতার বুকে প্রতিভার দাপট দেখান কিছু এসট্যাবলিশমেন্টের পোষা সাহিত্যিকরা। কলেজ স্ট্রিটে দাঁড়িয়ে হাংরি কবি-সাহিত্যিকদের লেখা না পড়ার জন্য চিৎকার করে ভয় দেখান তাঁরা। এঁদের লেখা না ছাপানোর জন্য প্রকাশকদের ওপর ফতোয়া জারি করেন। মলয় রোয়চৌধুরী সম্পাদিত ‘জেব্রা’ প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হবার পর কলেজ-স্টিটে কোনো কোনো স্টলে বিক্রি করার জন্য রেখে গেলে একদল ‘মুখোশধারী’ এসে আধঘণ্টার মধ্যে সব তুলে নিয়ে যায়। হাংরি মকদ্দমার সংবাদের কাটিং দেখিয়ে বিমল রায়চৌধুরী এবং সত্যেন্দ্র আচার্য স্টল মালিকদের নানা ভাবে ভয় দেখান।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও পরোক্ষে মলয় রায়চৌধুরীকে ভয় দেখান। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তখন আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়ার্কশপ পোগ্রামে আমেরিকায়। সেখান থেকে তিনি ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের প্রথম দিকে মলয় রায়চৌধুরীকে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিতে কোনো তারিখ ছিল না। আমেরিকার IOWA City-র Postal বিভাগের যে সিলমোহর ছিল সেটা ১০ জুন ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের। চিঠিটি মলয় রায়চৌধুরীর হাতে এসে পৌঁছয় ১৬ জুন ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে। এভাবে অনেক মজাদার ঘটনাকে সাক্ষী করে হাংরি আন্দোলন এগিয়ে চলে।

হাংরি আন্দোলন বাংলা সাহিত্যে বাঁকবদল করতে সক্ষম হয়েছিল একথা নিরপেক্ষ ব্যক্তি মাত্রেই স্বীকার করেন। ‘বাঁকবদল’কে স্বীকার করার মানে— হাংরি আন্দোলন সকল। কিন্তু হাংরি আন্দোলনকারীরা সে সময় ভাবেননি যে, এই আন্দোলনটি এক সময় এত সাড়া জাগাতে সক্ষম হবে, প্রবীণ সাহিত্যিকদের অতিরিক্ত চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। নইলে এঁরা তাঁদের প্রকাশিত ইশতিহারগুলো যত্নসহকারে বাঁধাই করে রাখতেন বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। তবে যতগুলো ইশতিহার ও পত্রিকা বিভিন্ন জনের সংগ্রহে রয়েছে তা থেকে এখন হাংরি আন্দোলনের জ্বালামুখী লাভা বেরিয়ে আসে আমাদের চিন্তাকুণ্ডে। বিশেষ করে হাংরি আন্দোলনের সময় প্রকাশিত ইশতিহারগুলো যখন খুশি যেমন খুশি যার খুশি যেখান থেকে খুশি প্রকাশ হবার ফলে সেগুলো সংগ্রহে রাখা সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি কারও পক্ষে। এমন কি হাংরি আন্দোলনের সময় সর্ব মোট কতটি ইশতিহার প্রকাশিত হয়েছিল তাও সঠিকভাবে আবিষ্কার সম্ভবপর হয়নি। তবে ১০৭ নম্বর ইশতিহারটির বিষয়ে আমরা অবগত হই। কিন্তু মলয় রায়চৌধুরী, সমীর রায়চৌধুরী, দেবী রায়, প্রদীপ চৌধুরী প্রমুখের মতে হাংরি আন্দোলনের

সময় সর্বমোট ১০৮ টি ইশতিহার প্রকাশিত হয়। অনেকগুলো আবার সংখ্যাবিহীন। একথা ঠিক যে কোনো ধরনের নিয়ম বা নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় না থাকায় ইশতিহার প্রকাশ করতে বাধা ছিল না। তবে সবারই উদ্দেশ্য ছিল আন্দোলন। যাঁরাই ইশতিহার ও পত্রিকা প্রকাশ করেছেন তাঁরা সকলই নিজেদেরকে হাংরি আন্দোলনের শরিক হিসেবে ঘোষণা করতেন. পরে যদিও অনেকে মতানৈক্য ও বিভিন্ন ভয়-ভীতি এবং লোভের বশবর্তী হয়ে নিজেদেরকে সরিয়ে নেন।

উল্লেখপঞ্জি

১. রায়চৌধুরী মলয়, 'হাংরি কিংবদন্তী' দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : জুলাই ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-৪
২. রায়চৌধুরী মলয়, 'হাংরি প্রতিসন্দর্ভ', হাওয়া ৪৯, সম্পাদক : সমীর রায়চৌধুরী, বি ২৪ ব্রহ্মপুর নর্দার্ন পার্ক, কলকাতা-৭০, তেত্রিশতম সংকলন মাঘ ১৪১২ বইমেল ২০০৬, পৃষ্ঠা-১৩
৩. রায়চৌধুরী মলয়, 'হাংরি কিংবদন্তী', পৃষ্ঠা-৪,৫
৪. রায়চৌধুরী মলয়, 'হাংরি প্রতিসন্দর্ভ', হাওয়া ৪৯, পৃষ্ঠা-১৬
৫. রায়চৌধুরী মলয়, 'হাংরি আন্দোলন', দৈনিক যুগশঙ্খ, পূজা বার্ষিকী, সম্পাদক : বিকাশ সরকার, ১৪১২, গুয়াহাটি-৫, পৃষ্ঠা-৬৮
৬. দাশ উত্তম, 'হাংরি জেনারেশন : একটি সমীক্ষা', হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, প্রকাশক : মহাদিগন্ত, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, দ্বিতীয় প্রকাশ : বইমেলা, জানুয়ারি ২০০২, পৃষ্ঠা-১৩
৭. রায়চৌধুরী মলয়, 'হাংরি আন্দোলন', হাওয়া ৪৯, পৃষ্ঠা-৯৮
৮. রায়চৌধুরী মলয়, 'হাংরি কিংবদন্তী', হাওয়া ৪৯, পৃষ্ঠা-৮
৯. তদেব, পৃষ্ঠা-১০
১০. তদেব, পৃষ্ঠা-১৭
১১. তদেব, পৃষ্ঠা-১৭
১২. রায়চৌধুরী মলয়, 'হাংরি আন্দোলনের মজাগুলো', হাওয়া ৪৯, পৃষ্ঠা-৯৯
১৩. শর্মা নন্দলাল, 'বাংলা সাহিত্যে একটি সম্ভাবনার অপমৃত্যু : হাংরি জেনারেশন' মিশন, প্রকাশক ও সম্পাদক : বিশ্বজিৎ নন্দী, শিলং, মেঘালয়, বার্ষিক সংকলন ২০০৭, পৃষ্ঠা-২২
১৪. রায় অজিত, 'হাংরি জেনারেশন : গেরো ফাঁসগেরো' বিনির্মাণ, এইচ. বি. ২১০, সল্টলেক, কলকাতা-৯১, গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা ২০০৫, পৃষ্ঠা-১৬
১৫. গুহ সত্য, 'একালের গদ্যপদ্য আন্দোলনের দলিল', ধৃতি, ১৫০৩/১০ কল্যাণগড়, উত্তর ২৪ পরগণা, পিন-৭৮৩২৭২, দ্বিতীয় সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-২৯,৩০
১৬. রায়চৌধুরী মলয়, 'হাংরি অ্যাংরি বিট : প্রতিসন্দর্ভের বৈভিন্ন্য', হাওয়া ৪৯ পৃষ্ঠা-৮৯
১৭. তদেব, পৃষ্ঠা-৮৯
১৮. চৌধুরী সমীর, 'হাংরি জেনারেশন কেন', হাংরি জেনারেশন রচনা সংকলন, সম্পাদনা : সমীর চৌধুরী, কথা ও কাহিনী, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-নয়
১৯. রায়চৌধুরী মলয়, 'হাংরি আন্দোলনের মজাগুলো', হাওয়া ৪৯, পৃষ্ঠা-৮৮
২০. তদেব, পৃষ্ঠা-৮৬
২১. তদেব, পৃষ্ঠা-৮৪
২২. তদেব, পৃষ্ঠা-৮৭
২৩. রায়চৌধুরী মলয়, 'হাংরি প্রতিসন্দর্ভ', হাওয়া ৪৯, পৃষ্ঠা-২১
২৪. তদেব, পৃষ্ঠা-২৩
২৫. চট্টোপাধ্যায় শক্তি, 'সীমান্ত প্রস্তাব ১-মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি নিবেদন', স্বপ্ন, সম্পাদক : কুমার বিষ্ণু দে, হরুলংপার কলোনি, লামডিং, আসাম-৭৮২৪৪৭, ১৪ বর্ষ প্রথম সংখ্যা ২০০৭, পৃষ্ঠা-১ □

দ্বিতীয় অধ্যায়

কলকাতায় হাংরি আন্দোলনের প্রচার ও প্রসার

বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে কলকাতায় অনেকগুলো সাহিত্য আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। তারমধ্যে প্রধান প্রধান আন্দোলন হল— হাংরি, শ্রুতি, শাস্ত্রবিরোধী, বিশুদ্ধ, ধ্বংসকালীন ইত্যাদি। সমস্ত আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল— সাহিত্যে পালাবদল। প্রায় সবগুলো আন্দোলনই তেমন সফলতা লাভ করতে সক্ষম না হলেও, অল্পতেই তাদের আস্থা হারিয়ে ফেললেও, হাংরি আন্দোলন বাংলা সাহিত্যের ভিত নাড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। কারণ এই আন্দোলন ছিল মূলত ইশতিহার ভিত্তিক। প্রথম ইশতিহারটি প্রকাশিত হয় পাটনা থেকে, ইংরেজি ভাষায়। দ্বিতীয় ইশতিহার প্রকাশিত হয় বাংলায়।

পশ্চিমবঙ্গে ঐতিহাসিক বাঁকবদলের প্রথম বাংলা ইশতিহারটি প্রকাশিত হয় ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে, হাওড়া থেকে। তখন পর্যন্ত মলয় রায়চৌধুরী, দেবী রায়, সমীর রায়চৌধুরী এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায়— এই চারজনই হাংরি আন্দোলনের 'নিউক্লিয়াস'। এই চারজনের পরিকল্পনা স্বরূপ সম্পাদনা ও বিতরণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়— দেবী রায়কে ; নেতৃত্বের ভার দেওয়া হয় শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে ; সংগঠিত করার দায়িত্ব দেওয়া হয় সমীর রায়চৌধুরীকে। ছাপা এবং ছাপার খরচের দায়িত্ব সহ স্রষ্টার আসনে রইলেন মলয় রায়চৌধুরী।

হাংরি আন্দোলনের বুলেটিনগুলো ছিল হ্যাণ্ডবিল আকারের। ছাপানো হত আড়াইশ থেকে তিনশ কপি। বিলি করা হত— কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাতে, পাতিরামের দোকানের সামনে এবং কফি হাউসে। ইশতিহারগুলো প্রকাশের জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রঙের কাগজ ব্যবহার করতেন হাংরি আন্দোলনকারীরা। দেখলে মনে হবে যৌনরোগ কিংবা গুপ্তরোগের সূচিকিৎসার জন্য কেউ হ্যাণ্ডবিল বা লিফলেট বিলি করছে। তাই অনেকেই হ্যাণ্ডবিল আকারের ইশতিহারগুলো হাতে নিতে চাইতেন না। যাঁরা নিতেন তাঁরা পড়ে একটা মজা অনুভব করতেন। কেউ কৌতূহল বশত হ্যাণ্ডবিল আকারের ইশতিহারগুলো চেয়ে নিয়ে পড়তেন। এরফলে কেউ অপমান বোধ করতেন. অনেকে দুঃখিত হতেন। কেউ-বা শরিক মনোভাব দেখাতেন, ইত্যাদি।

ঐতিহাসিকতার মানদণ্ড চিন্তা করে বাংলা প্রথম হাংরি ইশতিহারটি সম্পূর্ণ তুলে ধরা হল ঃ

"**হাংরি জেনারেশন**

স্রষ্টা ঃ মলয় রায়চৌধুরী সম্পাদনা ঃ দেবী রায় **নেতৃত্ব ঃ শক্তি চট্টোপাধ্যায়**

কবিতা এখন জীবনের বৈপরীত্যে আত্মস্থ। সে আর জীবনের সামঞ্জস্যকারক নয়, অতিপ্রজ অন্ধ বল্মীক নয়, নিরলস যুক্তিগ্রন্থন নয়। এখন, এই সময়ে, অনিবার্য গভীরতার সন্ত্রস্তদৃক ক্ষুধায় মানবিক প্রয়োজন এমন ভাবে আবির্ভূত যে, জীবনের কোনো অর্থ বের করার প্রয়োজন শেষ। এখন প্রয়োজন অনর্থ বের করা, প্রয়োজন মেরু বিপর্যয়, প্রয়োজন নৈরাত্মসিদ্ধি। প্রাগুক্ত ক্ষুধা কেবল পৃথিবী-বিরোধিতার নয়, তা মানসিক, দৈহিক এবং শারীরিক। এ-ক্ষুধায় কেবলমাত্র লালনকর্তা কবিতা, কারণ কবিতা ব্যতীত কী আছে আর জীবনে ! মানুষ, ঈশ্বর, গণতন্ত্র ও বিজ্ঞান পরাজিত হয়ে গেছে। কবিতা এখন একমাত্র আশ্রয়।

কবিতা থাকা সত্ত্বেও, অসহ্য মানব-জীবনের সমস্ত প্রকার অসম্বদ্ধতা, অন্তর-জগতের নিষ্কুন্ঠ বিদ্রোহ, অন্তরাত্মার নিদারুণ বিরক্তিতে, রক্তের প্রতিটি বিন্দুতে রচিত হয় কবিতা। উঃ তবু মানবজীবন কেন এত নিষ্প্রভ ? হয়তো, কবিতা এবং জীপনকে ভিন্নভাবে দেখতে যাঁরা অভ্যস্ত তাঁদের অপ্রয়োজনীয় অস্তিত্ব এই সংকটের নিয়ন্ত্রক।

কবিতা বলে যাকে আমরা মনে করি, জীবনের থেকে মোহমুক্তির প্রতি ভয়ংকর আকর্ষণের ফলাফল তা কেবল নয়। কর্মের খাঁচায় বিশ্ব-প্রকৃতির ফাঁদ পেতে রাখাকে আর কবিতা বলা হয় না। এমন কী প্রত্যাখ্যাত পৃথিবী থেকে পরিত্রাণের পথ রূপেও কবিতার ব্যবহার এখন হাস্যকর। ইচ্ছে করে, সচেতনতায়, সম্পূর্ণ রূপে আরণ্যকতার বর্বরতার মধ্যে মুক্ত কাব্যিক প্রজ্ঞার নিষ্ঠুরতার দাবির কাছে আত্মসম্পর্ণই কবিতা। সমস্ত প্রকার নিষিদ্ধতার মধ্যে তাই পাওয়া যাবে অন্তরজগতের গুপ্ত-ধন। কেবল, কেবল কবিতা থাকবে আত্মায়।

ছন্দে গদ্য লেখার খেলাকে কবিতা নাম দিয়ে চালাবার খেলা এবার শেষ হওয়া প্রয়োজন। টেবল-ল্যাম্প ও সিগারেট জ্বালিয়ে, সেরিব্রাল কর্টেকসে কলম ডুবিয়ে, কবিতা বানাবার কাল শেষ হয়ে গেছে। এখন কবিতা রচিত হয় অরগ্যাজমের মতো স্বতঃস্ফূর্তিতে। সেহেতু এস্নু বলাৎকারের পরমুহূর্তে কিংবা বিষ খেয়ে অথবা জলে ডুবে 'সচেতনভাবে বিহ্বল' হলেই, এখন কবিতা সৃষ্টি সম্ভব। শিল্পের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কবিতা সৃষ্টির প্রথম শর্ত। শখ করে, ভেবে ভেবে, ছন্দে গদ্য লেখা হয়তো সম্ভব, কিন্তু কবিতা রচনা তেমন করে কোনোদিনই সম্ভব নয়। অর্থব্যঞ্জনা ঘন হোক অথবা ধ্বনি-পারমপর্যে শ্রুতিমধুর, বিক্ষুব্ধ প্রবল চঞ্চল অন্তরাত্মার ও বহিরাত্মার ক্ষুধার নিবৃত্তির শক্তি না থাকলে, কবিতা সতীর মতো চরিত্রহীনা, প্রিয়তমার মতো যোনিহীনা ও ঈশ্বরীর মতো অনুন্মোষিণী হয়ে যেতে পারে।

হারাধন ধাড়া কর্তৃক ২৬৯ নেতাজি সুভাষ রোড, হাওড়া হইতে প্রকাশিত। ”[১]

প্রথম ইংরেজি বুলেটিন বিলি হবার পর একটা উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এই উত্তেজনা সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী মহলে। কী কারণে যে উত্তেজনা সেটা দেবী রায় বুঝে উঠতে পারছিলেন না। কেননা প্রথম ইংরেজি বুলেটিনগুলো বিলি করেছিলেন দেবী রায়। হ্যাণ্ডবিল আকারের ইশতিহার পড়ে মুখে মুখেই তার প্রতিক্রিয়া। এমন মজা এমন তরতাজা উত্তর একটা আশ্চর্যের ব্যাপার। সাহিত্য করার নতুন পন্থা।

হাংরি আন্দোলনের প্রথম বাংলা ইশতিহারটিরও প্রচারক দেবী রায়। বাংলা ইশতিহার প্রচার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটা ভীতিপ্রদ জল্পনা-কল্পনা হতে থাকে। নব প্রজন্মের লেখক সম্প্রদায় বাংলা ইশতিহারটি হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খুশি হয়ে শরিক হওয়ার জন্য যোগাযোগ আরম্ভ করে দিলেন। অনেকে বাংলা ইশতিহারটি পড়ে নিজের পরিচিত মহলে প্রচার করতে লাগলেন। যারা পড়েনি তারা ইশতিহার পড়ার আগ্রহে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। প্রথম বাংলা ইশতিহার প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এতটা সাড়া আশা করেননি মলয় রায়চৌধুরী। হাংরি আন্দোলনের 'নিউক্লিয়াস' বলে চিহ্নিত চারজনের উৎসাহ অসংখ্যগুনে বেড়ে গেল। তারপর একে একে ইশতিহার প্রকাশ হতে লাগল। সেই সঙ্গে শিক্ষিত যুবক সম্প্রদায় হাংরি আন্দোলনে যোগদান করতে লাগলেন। হাংরি আন্দোলনের

সমস্ত শর্তকে স্বীকৃতি দিয়ে দূর দূরান্ত থেকে শরিকরা এসে নিজের উপস্থিতি জাহির করলেন। এমন কি হাংরি আন্দোলনে আকৃষ্ট হয়ে বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের বিখ্যাত কয়েকজন লেখক পর্যন্ত হাংরি আন্দোলনের ঘোষণাকে মজবুত করতে 'কৃত্তিবাস' গোষ্ঠীকে পেছনে ফেলে চলে এলেন। এঁদের কয়েকজনের মধ্যে সমীর রায়চৌধুরী এবং শক্তি চট্টোপাধ্যায় তো আগে থেকেই রয়েছেন। পরবর্তীতে যোগদান করলেন— উৎপলকুমার বসু, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার প্রমুখ।

অল্পদিনেই হাংরি আন্দোলন কলকাতার বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিক সংস্কৃতি মহলে একটা আতঙ্কের ঘোর সৃষ্টি করে ফেলেছে। উৎপল দত্ত মহাশয়কে একদিন একটি বুলেটিন ধরিয়ে দিলে তিনি চেঁচিয়ে উঠে বলেছিলেন— "মাই গড়, হাংগরি জিন্নাড়িশন।"[২] দেবী রায় কলকাতার প্রতিক্রিয়া পোস্টকার্ড মারফত লিখে পাটনায় মলয় রায়চৌধুরীর কাছে সময় মতো পাঠিয়ে দিতেন। যাঁরাই হাংরি আন্দোলনে যোগ দিতে চাইতেন তাঁরাই অবাধে আসতে পারতেন। কেননা, এর কোনো হেডকোয়ার্টার, হাইকমাণ্ড, পলিটব্যুরো বা সম্পাদকীয় দপ্তর বলতে কিছু ছিল না। মলয় রায়চৌধুরী তখনও পাটনায়।

কলকাতা বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার প্রধান কেন্দ্রস্থল। তাই এখানেই হাংরি আন্দোলনের ভিত মজবুত করার একটা উপায় খোঁজার আগেই তা প্রচার পেয়ে বসল। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে হাংরি আন্দোলনের দল ভারি। এই ভারির ধাক্কা গিয়ে ঠেকল প্রতিষ্ঠানের কর্তাদের মস্তিষ্কে। এঁদের ভয় হয়ে দাঁড়াল কী জানি কোন কাণ্ড ঘটিয়ে ফ্যালে হাংরিরা। ইশতিহার, কবিতা, গদ্য, ছবি, কার্টুন, পোস্টার ইত্যাদি প্রকাশ হতে লাগল সদ্য সদ্য। ঘুম কেড়ে নিল প্রতিষ্ঠানের বাবুদের। এবার মুখোশ পাঠাবার চিন্তা চলল। প্রচার এবং প্রতিবাদের নতুন ধরনের কৌশল। মলয় রায়চৌধুরী জানাচ্ছেন— "কলকাতার আঁতেল আর সমাজ কর্তাদের ধড়িবাজি দেখে-দেখে সিভিল সোসাইটির ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে প্রতিবাদের এই অস্ত্রটা ছিল মোক্ষম।"[৩]

সেই সময় হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নানান সংবাদ প্রকাশ পায়। সেই সংবাদ গুলোর শিরোনাম অনেকক্ষেত্রে সমর্থনযোগ্য এবং অনেকক্ষেত্রে তাচ্ছিল্যপূর্ণ হওয়ার ফলে হাংরি আন্দোলনকে প্রচারমুখী করে দেয়। শিরোনামগুলোর কয়েকটি হল— দূতেরা কি ভয়ংকর (চতুষ্পর্ণা) ; ইহা কি বেহুদা পাগলামি (দর্পণ) ; সাহিত্যে বিটলেমি (যুগান্তর) ; সাহিত্যে বিটলেমি কি এবং কেন (অমৃত) ; কাব্যচর্চার নামে বিকৃত যৌনলাসসা (জনতা) ; অশ্লীল পুস্তক রচনার অভিযোগ (আনন্দবাজার) ; কাব্যচর্চায় অবাধ যৌনভেজাল (জনতা) ; হা-ঘরে সম্প্রদায় (জলসা) ; Erotic lives and loves of the Hungry Generation (BLITZ) ইত্যাদি।

১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুলাই 'দৈনিক যুগান্তর' পত্রিকায় স্টাফ-রিপোর্টার কর্তৃক যে সংবাদটি প্রকাশিত হয়, তার শিরোনাম 'সাহিত্যে বিটলেমি'। ইতিহাসের বিশালতায় সংবাদটির গুরুত্ব অপরিসীম। সংবাদটি হল ঃ

“আধুনিক সমাজে রাজনীতিকদের প্রকৃত স্থান নির্দেশ করা হবে— সেই স্থান হচ্ছে গণিকার মৃতদেহ ও গর্দভের লেজের মাঝামাঝি কোথাও। ঘোষণাটি একটি গোষ্ঠীর যাঁরা নিজেদের সাহিত্য গোষ্ঠী বলে পরিচয় দেন। তবে এঁদের রাজনীতিও আছে এবং সেই রাজনীতির যে-দশদফা উদ্দেশ্য ঘোষণা করা হয়েছে তার অন্যতম একটি হচ্ছে উপরের এই উদ্ধৃতিটি। কাব্য সম্পর্কে এঁদের ঘোষণাটি আরো চমকপ্রদ— ‘কবিতাগ্রন্থ স্ত্রীর চেয়ে মনোরম ও টেঁকসই। বিবাহিত নারী দুদিনেই পুরনো বই-এর তলতলে মলাট বনে যায় কিন্তু কবিতার নারী দিনের পর দিন আঁট হয়ে চেপে বসে আপনাকে’। দুবছর আগে কলকাতার যে তরুণরা এই অতিরিক্ত সাহসের এবং অভিভাবক সমাজ সাহিত্যিক শালীনতা এমন কি পুলিশকেও উপেক্ষা করার এই আন্দোলন শুরু করেন, নিজেদের তাঁরা হাংরি জেনারেশন বা ক্ষুৎকাতর নাম দিয়েছেন। এঁদের মুখপত্রের কথা যদি ধরি তাহলে গত দু’বছরে এই আন্দোলন কলকাতার অন্তত অর্ধশত তরুণকে আকৃষ্ট করেছে। এঁদের বয়স ১৮ থেকে ৩২-এর মধ্যে। এইসব তরুণদের মধ্যে চাকুরিজীবী অধ্যাপক ছাত্র প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরের মানুষ আছে। মধ্য কলকাতার কয়েকটি রেস্তোরাঁয় পান্থশালায় কখনও পথেরই উপর দাঁড়িয়ে তাঁরা আড্ডা দেন। গাঁজা ভাঙ ইত্যাদি নেশায়ও তাঁদের অরুচি নেই। নর্দমা-প্যাণ্টালুন ও ছুঁচলো জুতাপরা যে সব মস্তানের সন্ধানে পুলিশ হালে পাড়ায় পাড়ায় নজর রাখছে, অথবা নিজেদের বিটলস বলে পরিচয় দিয়ে যারা গঙ্গার ধারে গাঁজার ছিলিম টানতে যাচ্ছে তাদের সঙ্গে একগোত্রে ফেললে হাংরিরা আপত্তি করেন (কেননা তাঁরা ইনটেলেকচুয়াল), কিন্তু প্রথমোক্তদের মত এঁরাও পোষাকে ও চলাফেরায় উদ্ভটের উপাসক এবং পুলিশ এঁদেরও সুনজরে দেখে না। এই গোষ্ঠীর যোগাযোগ নাকি বিশ্বব্যাপী। নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরি এবং ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এঁদের বুলেটিনের ফোটোস্ট্যাট কপি দেখা যায়। লণ্ডনের এক বিখ্যাত প্রকাশক এঁদের কবিতার একটি পেপারব্যাক সংকলন বার করবেন বলে স্থির করেছেন। সানফ্রানসিসকোর ‘সিটি-লাইট’ জার্নাল এঁদের কবিতা সম্পর্কিত ম্যানিফেস্টো ছেপেছে। মেক্সিকোর এলকর্নো এমপ্লুমাদো স্প্যানিশ ভাষা-ভাষীর সমক্ষে এঁদের পেশ করেছে। ইংলণ্ড ও ইউরোপের অ্যাংরিরা যোগাযোগ করে বাহবা জানিয়েছে হাংরিদের। এই আন্দোলন চালানোর জন্য টাকা যোগায় কে ? এঁরা বলেন টাকা আসে শাড়ি-পরা মন্ত্রী, ঝরিয়া খনি শ্রমিক সংস্থা, বারুইপুর ব্যায়াম সমিতি, যোগমায়া ক্লাব, জনৈকা একট্রেস, পাকিস্থানের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ও হিন্দু মহাসভার জনৈক সেকরেটারির কাছ থেকে। এঁদের খেদ চালু কোন সাহিত্য পত্রিকায় এঁদের রচনা ছাপা হয় না। তাই এঁরা একদিন কোনো কাগজের অফিসে গিয়ে কয়েক-তা সাদা ফুলস্ক্যাপ কাগজ দিয়ে বলে এসেছেন— এটা একটা গল্প, ছাপতে হবে। তাঁরা জুতোর বাক্সো পাঠিয়েছেন পুস্তক সমালোচনা স্তম্ভে রিভিউ করার জন্যে।”[৪]

হাংরি আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে ‘যুগান্তর’ পত্রিকার উক্ত সংবাদটি অতি সংক্ষিপ্তানুসারে অনেক মূল্যবান দলিল তুলে ধরেছে। হাংরি আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্য, ব্যক্তিগত জীবন, আন্দোলন করার কৌশল, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে যোগাযোগ, পৃথিবী ব্যাপী সমর্থন, সরকার কিংবা পুলিশের নজরে এঁদের স্থান, এসট্যাবলিশমেণ্ট সম্বন্ধে এঁদের ধারণা, আন্দোলনের ধন কীভাবে সংগ্রহ হয় তার হিসেব, কবিতা সম্পর্কে এঁদের দর্শন, এঁদের শরিকদের বয়স, আন্দোলনে যুক্ত সকলের পেশা, আন্দোলনে যুক্ত তরুণ-তরুণীদের সংখ্যা,

রাজনৈতিক নেতাদের মনোভাবের প্রতি ঘৃণা ইত্যাদি একটা স্পষ্ট রেখাচিত্র হাংরি আন্দোলনকে চিনে নিতে সাহায্য করে।

পোস্টার-কবিতা এবং কোলাজ-কবিতার জন্ম হাংরি আন্দোলনকারীদের হাতে। বাংলা সাহিত্যে যাঁদের নাম পোস্টার-কবিতা এবং কোলাজ-কবিতার ইতিহাসে প্রথম স্থান দেবার যোগ্য তাঁরা হলেন হাংরি আন্দোলনের দুই বিশিষ্ট পুরুষ— অনিল করঞ্জাই ও করুণানিধান মুখোপাধ্যায়। হাংরি আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগকারী চিত্রকর অনিল করঞ্জাই। তিনিই ভারতীয় পেইনটিং এবং ইনস্টলেশনে প্রথম মর্ফোলজিকাল ইলিউশান, মাইক্রোওয়েভ ব্যাকগ্রাউণ্ড রেডিয়েশান, মাল্টিস্কেলিভ, ডিপ্রোপোরশনিভ, ডিপার্সপেস্টিভাইজেশান ইত্যাদির জন্মদাতাও। কিন্তু পশ্চিমবাংলা তাঁকে যোগ্য সম্মান দেয়নি। আমেরিকায় অনিল করঞ্জাইয়ের ছবি দেখে আর্টদক্ষ চিত্রকররা স্বীকার করেছিলেন যে, হাংরি আন্দোলনে সামিল হয়ে আঁকা তাঁর 'সাইকেডেলিক' চিত্রগুলো পৃথিবী বিখ্যাত। তাই বলা যায়— "হাংরি কাউণ্টার-ডিসকোর্স একটি মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচ নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল।"[৫]

হাংরি আন্দোলন কলকাতায় এত বেশি প্রচারিত হয়েছিল যে এই আন্দোলনকে দুর্বল করতে হলে তাদের মধ্যে একটা বিরোধ বাঁধতে চেষ্টা করলেন অনেকে। আবার কেউ কেউ চেষ্টা করলেন হাংরি আন্দোলনের শরিকদের অপদস্ত করতে। দুই ব্যাপারেই দুষ্ট চক্র সফল হয়ে গেল। তার উলেখযোগ্য ঘটনাগুলোর মধ্যে অন্যতম—

১) বিশ্বভারতী থেকে প্রদীপ চৌধুরীর রাষ্টিকেট হওয়া।
২) অধ্যাপক হিসেবে 'যোগমায়া দেবী' কলেজে চাকরিরত উৎপলকুমার বসু নিলম্বিত।
৩) হাংরি বুলেটিনের প্রকাশক হওয়ার ফলে সমীর রায়চৌধুরী চাকরি থেকে বরখাস্ত।
৪) কবিতায় অশ্লীলতার অভিযোগ এনে মলয় রায়চৌধুরীকে কোর্টে টানা-হেঁচড়া।
৫) কফিহাউসের সামনে সুবিমল বসাকের ওপর অতর্কিতে একদল যুবকের হামলা।
৬) দেবী রায় হাংরি বুলেটিনের সম্পাদক হওয়ার ফলে কলকাতা থেকে বর্ধমানে বদলি।
৭) হাংরি আন্দোলন ভেঙে দিতে পারেন বলে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমেরিকা থেকে চিঠি লিখে ভয় দেখান।
৮) হাংরি আন্দোলনকারীরা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলে অভিযোগ করা হয়।
৯) গোপনে হাংরি আন্দোলনকারীদের পুলিশ দিয়ে শাসানোর মামলা উঠে এসেছে একাধিকবার।
১০) কলেজ-স্ট্রিটে সুবিমল বসাকের ওপর একদল সাহিত্যিক অতর্কিতে হামলা চালায়।
১১) বিভিন্ন পত্রিকা অফিসে গিয়ে হাংরি আন্দোলনকারীদের ছাপা কোনো কিছু বিক্রি না করার নিষেধাজ্ঞা জারি করেন কেউ কেউ।
১২) প্রেস মালিকদের ভয় দেখিয়ে বলা হয়— হাংরি ইশতিহার না ছাপাবার জন্য।
১৩) হাংরি শরিকদের চাকরি দিয়ে আন্দোলনকে দুর্বল করে দিতে নানারকম ষড়যন্ত্র করা হয়, ইত্যাদি।

হাংরি আন্দোলনকারীরা প্রচারের শীর্ষে থাকার ফলে তাঁদেরকে দেখে অনেকেই ভয়ে কথা বলা বন্ধ করে দেন। আবার অনেকে বিভিন্ন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসেন। তাঁদের মধ্যে শরদ দেওড়া, জ্যোতি দত্ত, খুশবন্ত সিং বিভিন্নভাবে সহায় করেন। শরদ দেওড়া টাকা দিয়ে প্রায়ই সাহায্য করতেন। তরুণ সান্যাল হাংরিদের সঙ্গে নানাভাবে পরামর্শ করেন। হাংরি আন্দোলনকারীদের কীভাবে সমর্থন করা যায় সে ব্যাপারেও অনেক চেষ্টা করতে লাগলেন।

হাংরি আন্দোলনের পালাবদল সম্পর্কে মলয় রায়চৌধুরী বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মত পোষণ করেছেন বারবার। তিনি বলেন— "রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগটিকে যাঁরা তখন হালকা করে দেখেছিলেন, তাঁরা হাংরি আন্দোলনকারীদের আনা পালাবদলটিকে আঁচ করতে পারেননি, সাহিত্য জগতে ঘটে যাওয়া নান্দনিক বিষয়টি টের পাননি, পাঠবস্তুর অন্তর্গত ও আঙ্গিক মুক্তিকে নিজেদের বোধবুদ্ধির সঙ্গে মেলাতে পারেননি, লেখসন্দর্ভের আধিপত্যবিরোধী চারিত্র্যকে চিহ্নিত করতে পারেননি, অভিব্যক্তির খাঁজে খাঁজে পুরে দেয়া অনেকার্থ প্রতিস্পর্ধার হদিশ পাননি।"[৬]

ভারতবর্ষে বাংলা সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় একমাত্র আন্দোলনের স্বীকৃতি হিসেবে হাংরিকেই চিহ্নিত করার যৌক্তিকতা স্বরূপ বলা যায়, তাঁরা সাহিত্যের ক্ষেত্রে চেষ্টা করেছেন— "নিজেদের তহবিল সমৃদ্ধ করার পরিবর্তে ভাষার তহবিল, সন্দর্ভের তহবিল, বাচনের তহবিল, বাকবিকল্পের তহবিল, অন্ত্যজ শব্দের তহবিল, শব্দার্থের তহবিল, নিম্নবর্গীয় বুলির তহবিল, সীমালঙ্ঘনের তহবিল, অধঃস্তরীয় বাগবৈশিষ্ট্যের তহবিল, স্পষ্টধ্বনির তহবিল, ভাষিক ইর্‌ র‍্যাশনালিটির তহবিল, শব্দোদ্ভটতার তহবিল, প্রভাষার তহবিল, ভাষিক ভারসাম্যহীনতার তহবিল, রূপধ্বনির প্রকরণের তহবিল, বিপর্যাস সংবর্তনের তহবিল, স্বরন্যাসের তহবিল, পংক্তির গতিচাঞ্চল্যের তহবিল, সন্নিধির তহবিল, পরোক্ষ উক্তির তহবিল, নিহিত স্বরধ্বনির তহবিল, পাঠবস্তুর অন্তঃস্ফোটী ক্রিয়ার তহবিল, তাড়িত ব্যঞ্জনার তহবিল"[৭] ইত্যাদি। এমন তহবিলের অসংখ্য চিহ্ন ফুটে উঠেছে হাংরি আন্দোলনকারীদের চিন্তায় সাহিত্যে সংস্কৃতিতে। যেমন— "অপস্বর-উপস্বরের তহবিল, সাংস্কৃতিক সন্নিহিতির তহবিল, বাক্যের অধোগঠনের তহবিল, বাক্য-নোঙরের তহবিল, শীৎকৃত ধ্বনির তহবিল, সংহিতা বদলের তহবিল, যুক্তিচ্ছেদের তহবিল, আপতিক ছবির তহবিল, সামঞ্জস্য ভঙ্গের তহবিল সমৃদ্ধ করেছিলেন হাংরি আন্দোলনকারীরা। পালাবদল যে ঘটেছে তা বুদ্ধদেব বসুর ডিসকোর্সে প্রতিপালিত কবিরা নির্ঘাৎ টের পেয়েছিলেন, নয়তো ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ বিদ্বজ্জনেরা তাঁতি বাড়ির উঠতি সাহিত্যিককে পিটতেন না।"[৮]

আসলে সমস্ত আন্দোলনের জন্মই হচ্ছে— সকল রকম অধিপত্য প্রণালীর বিরুদ্ধে। সেই আধিপত্য রাজনৈতিক সামাজিক ধার্মিক আর্থিক সাংস্কৃতিক নান্দনিক সাহত্যিক যে কোনো হতে পারে। মহৎ আন্দোলনের উদ্দেশ্য মহৎ হয়ে ওঠে। মূল কারণ স্বরূপ বলা যেতে পারে— ছাঁচের পরম্পরাকে ভেঙে নতুন আঙ্গিক দান করা।

কলকাতায় হাংরি আন্দোলন যখন চরমে, তখন হাংরি আন্দোলনকারীরা যে সমস্ত কবিতা, গদ্য ইত্যাদি রচনা করতে আত্মনিমগ্ন তা থেকে আমরা হাংরি আন্দোলন এবং কবিতার বৈশিষ্ট্যকে যদি স্তুপিকৃত করি তাহলে এক নতুন ধরনের ভাব ও বিষয় আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে। যেমন—

১। প্রতিষ্ঠানের বিরোধীতা করা।
২। নান্দনিক সাহিত্য রচয়িতাদের আক্রমণ।
৩। অ্যারিস্টটলের বাস্তবকে অস্বীকার।
৪। শাসকদের মূল্যবোধের বিরোধীতা।
৫। প্রতিটি মানুষের আত্মাকে রাজনীতিমুক্ত করা।
৬। সকল মানুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখা।
৭। সকল ছোট-বড় লেখককে এক মঞ্চের ভাবা।
৮। মানুষের অন্তরের ঈশ্বরকে খোঁজে বের করা।
৯। কল্পনাকে কবিতা সাহিত্যে প্রত্যাখান।
১০। বাংলা ভাষার খোলশ ঝেড়ে ফেলা।
১১। আধিপত্য প্রণালীর বিরোধীতা করা।
১২। কবিতায় পালাবদল।
১৩। ব্যাকরণের দেওয়াল ভাঙা।
১৪। কোনো নেতৃত্ব এবং সম্পাদকীয় দপ্তর ধরনের ক্ষমতাকেন্দ্র না থাকা।
১৫। আধুনিকতার মূল জায়গা থেকে সরে আসা।
১৬। দূরদৃষ্টির সন্ধান।
১৭। সাহিত্যকে অহেতুক সংশোধন করার চেষ্টার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা।
১৮। বিগ্রহ ভাঙার কাজ।
১৯। সামাজিক দায়বদ্ধতার সৎচিন্তা প্রকাশ।
২০। কুক্ষিগত ক্ষমতাকেন্দ্রের ধারণাকে ভেঙে প্রান্তবর্তী ডিসকোর্সে ছড়িয়ে দেওয়া।
২১। আত্মপরিচয়ের ভঙ্গুরতা বাংলা কবিতায় মেলে ধরা।
২২। কোনো কবিতা শরীরে বহুবিধ সাবজেক্ট পজিশান ছড়িয়ে দেওয়া।
২৩। কবিতায় গণভাষা ব্যবহার।
২৪। পদ্য ও গদ্য ছন্দের অবলুপ্তি এবং একটি সহজ-সরল নতুন শৈলী ব্যবহার।
২৫। বাস্তব কথা বলার শব্দ অবিকল কবিতায় ব্যবহার করা।
২৬। যৌনশব্দ অশ্লীলশব্দ ইতরশব্দ ইত্যাদির বেসামাল প্রয়োগ।
২৭। নান্দনিক সমস্ত চিন্তাকে কবিতায় প্রশ্রয় না দেওয়া।
২৮। কবিতায় নিজেকে মেলে ধরা।
২৯। কবিতাকে ঈশ্বর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।
৩০। কবিতায় কৌম ‘আমি’-কে খোঁজা।
৩১। শিল্পের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।
৩২। ইতিহাস নয়, সমাজের নগ্ন চিত্র চিত্রায়ন।
৩৩। ব্যক্তিগত ও অনন্য এক প্রচলনমুক্ত বাকরীতির নির্মাণ কৌশল ব্যবহার।
৩৪। গোপনতা মুক্ত ও খুল্লমখুল্লা জীবনলিপি চিত্রণ।
৩৫। কবিতায় প্রচলিত আঙ্গিক ভেঙে আঙ্গিকহীন আঙ্গিক সৃষ্টি।
৩৬। জীবনের বাস্তব নগ্ন রূপকে কবিতায় হুবহু তুলে ধরা।

৩৭। ঔপনিবেশিক অচলায়তন ফাটিয়ে বেরিয়ে পড়া।
৩৮। বাংলা কবিতার একটি বিশেষ কাঠামোকে সর্বজনীন করে তোলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।
৩৯। ভাষার সন্ত্রাস সৃষ্টি।
৪০। কবিতায় চিত্রকল্পের বদলে চিত্রহীনতা নির্মাণ।
৪১। মস্তানের ভাষা ব্যবহার।
৪২। ক্ষেপে ক্ষেপে কথা।
৪৩। অদৃশ্য এবং দৃশ্যের খেলা।
৪৪। বক্তব্যের ক্রমবিহীনতা।
৪৫। কবিতায় শব্দের বদলে মাঝে মাঝে গণিত ব্যবহার।
৪৬। বাক্যখণ্ডের হেরাফেরি।
৪৭। মডার্ন পোয়েট্রি নামক ঔপনিবেশিক ডিসকোর্সকে আক্রমণ।
৪৮। ঔপনিবেশিক মননবিশ্বকে বিদায় ঘোষণা করা।
৪৯। যে কোনো কবি-লেখক যেমন খুশি লিখবেন।
৫০। সমস্ত কিছুতে সন্দেহ।
৫১। ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রশ্ন।
৫২। বঙ্গসংস্কৃতির ভিত কাঁপিয়ে দেওয়া।
৫৩। বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার জটিলতা ও অস্পষ্টতার বিরুদ্ধে কথা বলা।
৫৪। আধুনিকতার মানদণ্ডে যা ছিল অধঃপতিত এবং অবক্ষয়িত তাকে আত্মসাৎ করা।
৫৫। সাহিত্য সংস্কৃতিতে বিষয় ভাঙন।
৫৬। সভ্যতার সমস্ত কৃত্রিমতাকে বর্জন।
৫৭। শিল্প নামক অশ্রাব্য বস্তুতে বিশ্বাসহীনতা।
৫৮। লেখক নয়, পাঠবস্তুর বিচার্যতা।
৫৯। ব্যক্তিকেন্দ্রিক সাহিত্যের রাজত্বকে উপড়ে ফেলে যৌথ সংগঠিত সাহিত্য চিন্তা।
৬০। সাহিত্যের কালোবাজারে হামলা করা।
৬১। নিজেকে সমৃদ্ধ করতে বিচিত্র অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো।
৬২। কবিসত্ত্বাকে কলুষমুক্ত করা।
৬৩। প্রতিটি বিদ্যায়তনিক সংজ্ঞাকে ফাটিয়ে চৌচির করা।
৬৪। বিশ্বস্তরীয় সাহিত্য আস্বাদন করে বাংলা সাহিত্যে নিজস্ব মেধাশক্তি ছড়িয়ে দেওয়া।
৬৫। কবিতায় কবিত্ব থাকবে না।
৬৬। যৌগিক বাক্যের প্রয়োগ।
৬৭। সকল ধরনের বিরতি চিহ্নকে প্রত্যাখ্যান।
৬৮। শব্দের সংকরায়ন।
৬৯। আঙ্গিকগত দিক থেকে উক্তিসন্দর্ভ একক মনে হলেও তাতে একাধিক কন্ঠের প্রকাশ।
৭০। স্বসৃষ্ট শব্দ প্রসব, ইত্যাদি।

কলকাতায় হাংরি আন্দোলন যখন সফলতার শীর্ষে তখন কলকাতার বাইরে থেকে অনেক প্রতিভাধর তরুণ কবি-সাহিত্যিক নিজেকে হাংরি আন্দোলনকারী বলে ঘোষণা করে কবিতা লিখতেন, পত্রিকা প্রকাশ করতেন। তার কারণ— হাংরি আন্দোলনকারীদের চিন্তাচেতনায় প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গিকে ভাঙার শক্তি এঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অনুভব করেছিলেন নতুনত্বের আভাঁগার্দ সাহিত্য। যেমন খুশি, যেখান থেকে খুশি নবীন মেধাবী সাহিত্যিকরা মলয় রায়চৌধুরীর দ্বারা সৃষ্ট চোদ্দোধারার বিধি মান্য করে পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। এতেই এঁরা খুশি। এঁরা যৌবনের অনুভব প্রকাশ করার মতো ভাষা খুঁজে পেয়েছেন হাংরি আন্দোলনের ইশতিহার ও পত্র-পত্রিকায়।

কলকাতায় হাংরি আন্দোলনে যুক্ত শরিকরা মেধাবী হলেও, তাঁদের আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকায় ইশতিহার কিংবা পত্রিকা প্রকাশের খরচ মলয় রায়চৌধুরী এবং সমীর রায়চৌধুরী বহন করতেন। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার, উৎপলকুমার বসু প্রমুখরা নিজের খরচে বুলেটিন প্রকাশ করেছেন। এর মূল কারণ— পঞ্চাশের পরিচিতি ভেঙে আরও একটু মেধাবী, আরও একটু নিজেকে ধারালো করতে ষাটের হাংরি আন্দোলনে যোগদান করেন পঞ্চাশের কবিরা। বয়সের দিক থেকে পঞ্চাশ ও ষাটের কবিদের মধ্যে মাত্র পাঁচ-ছয় বৎসরের পার্থক্য। কিন্তু এই স্বল্পকালের আয়ুগত পার্থক্য একটা যুগান্তকারী সাহিত্য আন্দোলনের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। আসলে এর পেছনে বিশ্ববীক্ষার পঠন মেধার মননক্রিয়া। হাংরি আন্দোলনকারীদের পালাবদলটি ছিল ঔপনিবেশিক মূল্যবোধপ্রসূত স্বত্বাধিকারবোধকে জাবর-কাটা প্রণালী থেকে মুক্ত করা।

কলকাতায় হাংরি আন্দোলন নিয়ে হৈ চৈ যখন চরমে তখন কেউ কেউ হাংরি আন্দোলনকারীদের চিন্তাবিশ্বকে বিকারগ্রস্ত, যৌনগন্ধী, অশ্লীল, রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী, অবক্ষয়ী ইত্যাদি আখ্যায় আখ্যায়িত করেছেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই হাংরি আন্দোলনের উৎস ভূমিতে বিচরণ করে নিজেকে শানিয়ে নিয়েছেন। আসলে এঁরা বৃন্তচ্যুত তারকা মণ্ডলীর মতো ক্ষসে গিয়ে আবার নতুন উৎস সন্ধানে আশ্রয় কামনা করেছেন। তাছাড়া 'শতভিষা', 'কৃত্তিবাস' গোষ্ঠী এবং তার পূর্ববর্তী প্রবীণ সাহিত্যিকরাও হাংরি আন্দোলনকারীদেরকে সুচক্ষে দেখতেন না। বাস্তবিক নন্দনচিন্তাপুষ্ট একদল সাহিত্যিক তাঁদের গণ্ডির বাইরে গিয়ে কোনো কিছু ভাবতে নিজেকে প্রস্তুত করেননি, কিংবা চেষ্টাও করেননি। যদিও-বা কোনো নবীন গোষ্ঠী বাংলা সাহিত্যে নতুনত্বের সন্ধানে তৎপর হলেন, সে ক্ষেত্রে প্রবীণরা মেনে নিতে প্রস্তুত হন না। এখানেই তো নবীন এবং প্রবীণের দ্বন্দ্ব। প্রবীণদের বিদ্রোহ নবীনদের বিরুদ্ধে ছিল বলেই হাংরি আন্দোলন বেশি ভাবে প্রচারমুখী হয়ে উঠেছে।

হাংরি আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠান বিরোধী হিসেবে জানা যায় তাঁদের বিলিকরা ইশতিহার দেখে। তাঁরা কোনো দিনও ইশতিহার বা পত্রিকা বিক্রয় করার চেষ্টা করেন নি। এই টার্ন পরবর্তী অনেক আন্দোলনই বজায় রাখার চেষ্টা করেছে। পরবর্তীতে অনেক পত্রিকা গোষ্ঠীও তাঁদের প্রকাশিত সকল প্রসায়কে বিনামূল্যে বিলি করেছেন। হাংরি আন্দোলনকারীদের মধ্যে যাঁরা সে সময় গ্রন্থ প্রকাশ করেন সেগুলোও তাঁরা বিনামূল্যে নিজের খরচে ডাকে অথবা বাড়িতে গিয়ে দিয়ে আসতেন। এঁদের মধ্যে অনেকের গ্রন্থের স্বত্ব-ও পর্যন্ত ছিল না।

শৈলেশ্বর ঘোষ জোর গলায় ঘোষণা করেন— "বাংলা সাহিত্যে হাংরি জেনারেশন আন্দোলন এই জন্যই যে, জীবনের আনন্দসূত্রকে নতুন করে খুঁজে দেখা, সত্য বাস্তবের পুনরাবিষ্কার করা, আধুনিকতার বন্ধ্যা কানা গলি থেকে মানুষের চেতনাকে মুক্তি দেয়া...।"[৯] তাঁরা মনে করেন— জীবন অভিজ্ঞতার সকল সত্য প্রকাশই কবিতা। "ছন্দে গদ্য লেখার খেলাকে কবিতা নাম দিয়ে চালাবার খেলা এবার শেষ হওয়া প্রয়োজন।"[১০] সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন— "হাংরি আন্দোলন তো সাহিত্যের আন্দোলন হিসেবেই শুরু হয়েছিল। কতটা সাহিত্য তারা সৃষ্টি করতে পেরেছিল সে বিষয়ে আমি কোনো মতামত দেব না।... তবে নতুন কোনো একটা সাহিত্য তারা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল এটা ঠিক।"[১১] হাংরি আন্দোলন যে একটা নতুন সাহিত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে তা সুস্থ এবং নিরপেক্ষ বিচারক মাত্রই সমর্থিত। কিন্তু কতটা সাহিত্য তাঁরা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন সে বিষয়ে সন্দিহান হলে বলতে হয়— এঁদের উদ্দেশ্য ছিল আন্দোলন করা। সাহিত্যের আন্দোলন। যার নাম হাংরি আন্দোলন। সফল সাহিত্য সৃষ্টি করা হাংরি আন্দোলনকারীদের বিন্দুমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না বলেই আমাদের অভিমত। এঁরা বাংলা সাহিত্যে পালাবদল চেয়েছিলেন এবং সফলও হয়েছেন বীরদর্পে।

বাংলা সাহিত্যে হাংরি যে যথার্থই প্রথম ঘোষিত আন্দোলন। আন্দোলনের জন্য উচ্চমানের ফসল আবশ্যক সেটা আমরা মেনে নিতে পারি না। হাংরি আন্দোলন তৎকালীন বাংলা সাহিত্যের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছিল। কবিতায় নতুনত্ব আনতে সক্ষম হয়েছিল। প্রতিষ্ঠানের বিরোধী ফসল ফলিয়েছিল বলে হাংরিকে সফল আন্দোলনের আখ্যা দেওয়ার যুক্তি রয়েছে। আধুনিকতা ও ঔপনিবেশিক কালখণ্ডকে সাহিত্যের ওমবিছানা থেকে হেঁচড়ে বের করতে সক্ষম হয়েছিল হাংরি আন্দোলন।

হাংরি আন্দোলন করার পেছনে উদ্দেশ্য ছিল, যে সমস্ত নবীন কবি-সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানের গণ্ডিভুক্ত খোঁয়াড়ে নিজেদের মতকে প্রকাশ করতে নানাভাবে অবজ্ঞায়িত— তাঁরা যাতে হাংরির প্রেক্ষাপটে যা খুশি, যেমন খুশি, যেভাবে খুশি লেখার বাণ ছুটাতে পারেন। তাঁরা জীবন অভিজ্ঞতার সকল নগ্ন সত্য তুলে ধরতে যেন কোনো দ্বিধাবোধ না করেন। এই জন্যই বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের অনেক কবি ষাটের হাংরি আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁদের একজন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। তিনি সুমিতাভ ঘোষালকে বলেছেন— "সে সময় আমাদের কেউই পাত্তা দিত না, তা যারা হাংরি আন্দোলন সুরু করে সেই মলয় রায়চৌধুরী এবং সমীর রায়চৌধুরী আমাকে জানায় যে আমার লেখা ওদের ভালো লেগেছে, ওরা যে ধরনের লেখা ছাপাতে চায় তা নাকি আমার লেখায় ওরা দেখতে পেয়েছে, তাই আমার লেখা ওরা ছাপাতে চায়। ওদের কাছে পাত্তা পেয়ে আমি খুবই আহ্লাদিত।... আমি হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে ভীষণভাবেই জড়িত ছিলাম। হাংরি আন্দোলনের আদর্শ আমার ভালো লেগেছিল এবং তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছিলাম বলেই আমি ওদের সঙ্গে ছিলাম। এ-ব্যাপারে আমার কোনো দ্বিমত নেই।"[১২] হাংরি আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন তাঁরাই যাঁরা বাংলা সাহিত্যে নতুন ভাবে নতুন কিছু বলতে চেয়েছেন।

কলকাতায় হাংরি আন্দোলন সফল হবার ফলে অনেকে হাংরি আন্দোলনকে নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু হাংরি হচ্ছে সম্পূর্ণই সাহিত্য আন্দোলন। কেউ বা হাংরি আন্দোলনকে নকশাল আন্দোলনের পূর্ববর্তী পর্যায় বলে উল্লেখ করতে চেষ্টা করেছেন।

এ-ক্ষেত্রে অনেকের বিচার এই যে, হাংরি আন্দোলনকারীরা রাজনৈতিক ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু ভালোভাবে বিচার করলে— সেই ম্যানিফেস্টোর মধ্যে রাজনীতি সম্পর্কে ঘৃণনীয় চিন্তারই বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়।

বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যায়— হাংরি আন্দোলনকারীদের হাতেই বোধহয় বাংলা সাহিত্যে উত্তর আধুনিকতার সূত্রপাত হয়েছিল। আচার্য শঙ্খ চৌধুরী বলেছেন— "জনপ্রিয়তা সব সময় যে বড় মাপের শিল্পী পান তা নয়। নিজের সময় বাহবা বা হাততালি পেলেন, কাল তার নাম ব্ল্যাকবোর্ড থেকে মুছে দিতে পারে। যিনি পান নি তিনি পরবর্তীকালে মহৎ শিল্পী বলে চিহ্নিত হতে পারেন। ঐ হিসাবটা অন্যরকম। সংগ্রহকারীদের সংখ্যালঘু তাঁরাই যাঁদের চোখ আছে।"[১৩] হাংরি আন্দোলনকারীদের যোগ্যতম প্রতিনিধিদের বেলায় এ-কথাটা যথার্থই সমর্থনযোগ্য। কারণ হাংরি আন্দোলনের স্রষ্টা মলয় রায়চৌধুরীর সাহিত্যকীর্তি তাই প্রমাণ করে।

দেবী রায় হাংরি আন্দোলনের শুরু থেকেই ছিলেন। তিনি মনে প্রাণে হাংরি আন্দোলনের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে চেষ্টা করেছেন কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেননি। তার পেছনে ভয়। তিনি হাংরি আন্দোলনকে নিশ্চিত সাহিত্য আন্দোলন হিসেবে অন্তরে স্থান দিয়ে শরিক হয়েছিলেন। আজও হাংরি আন্দোলন নিয়ে কথা হলে তার ইতিহাস আওড়াতে ভুলেন না। প্রদীপ চৌধুরী আজ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানকে অবজ্ঞা করে চলেন। শৈলেশ্বর ঘোষ মলয় রায়চৌধুরীর সঙ্গে জ্ঞাতিশত্রু হিসেবে ব্যবহার করলেও তিনি নিজে প্রতিষ্ঠানকে সাহিত্য করার আওতায় স্থান দিতে পারেননি। সুবিমল বসাক তো সম্পূর্ণই প্রতিষ্ঠান বিরোধী হিসেবে পরিচিত।

হাংরি আন্দোলন বাংলা সাহিত্যে এক বিস্ফোরণ। বাংলা সাহিত্যে হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে কোনো আন্দোলনেরই তুলনা হয় না। অনেকগুলো নতুন ভাবনার মাল্যযোজনা করে হাংরির যুবক কবি সাহিত্যিকরা আন্দোলনে নেমেছিলেন। সেই বিস্ফোরণের বিষক্রিয়া নবীন কবিদের মাথায় যোদ্ধাতন্ত্রের প্রক্ষেপণ ঘটিয়ে ছিল বলেই কলকাতায় হাংরি আন্দোলন প্রচারমুখী হয়ে ওঠে, সেই সঙ্গে একটা বৃহৎ পরিবর্তন বাংলা সাহিত্যকে উন্নতির চরম শিখরে ঠেলে দেয়। আসলে হাংরি আন্দোলন এমন একটি 'কালচার বণ্ড' যা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে পড়ুয়ার হৃদয় ও মনকে বহুগামী চিন্তার সত্য সন্ধান দেয়।

'আণ্ডারগ্রাউণ্ড' শিল্প সম্পর্কে অনেকের ধারণা থাকতে পারে, কিন্তু 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড' সাহিত্য বলতে অনেক সমালোচক বাংলা সাহিত্যে হাংরি আন্দোলনকেই চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড' শব্দটা বিশেষ করে এক সময় রাজনীতির ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হত। পরবর্তীতে বিপ্লবীদের ক্ষেত্রে 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড' শব্দটি ব্যবহৃত হতে থাকে। বোধহয় হাংরি আন্দোলনকারীরা বাংলা সাহিত্যে যে বিপ্লব আনতে চেয়েছিলেন তার প্রেক্ষিতকে 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড' হিসেবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন অনেকে। কিংবা বন্দুকের নলের সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতার যে সম্পর্ক হয়ত সেই চিন্তাকে কাল্ট-এর মাধ্যমে 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড' শিল্প সাহিত্য এবং শিল্প আন্দোলনকে দেখার চেষ্টা হয়ে থাকবে। অবশেষে হাংরি আন্দোলন 'আণ্ডারগ্রাউণ্ড' সাহিত্য হিসেবে চিহ্নিত হয়ে উঠল পৃথিবীর ইতিহাসে। হাংরি আন্দোলন ইতিহাসের বিচারে যেন আশীর্বাদ স্বরূপ। হাংরি

আন্দোলন ভাবনায় যা ছিল অবচেতন স্তরের বুদ্ধিদীপ্ত আলোড়ন তা সংক্রমিত হল ষাটের দশকে বাংলা সাহিত্যে পালাবদল করে।

হাংরি আন্দোলন মূলত কবিতাভিত্তিক। তাই কবিতার মধ্যেই আন্দোলনকারীরা শক্তি ও সকল রকম পালাবদলের স্ফূরণ ঘটান। সুভাষ ঘোষ, বাসুদেব দাশগুপ্ত এবং সুবিমল বসাকের গদ্য হাংরি আন্দোলনকে নতুন মাত্রা যোগালেও অনিল করঞ্জাই, করুণানিধান মুখোপাধ্যায় প্রমুখের চিত্র হাংরি আন্দোলনকে বহুমুখী চিন্তার জগতে ছড়িয়ে দিলেও কবিতাই ছিল হাংরি আন্দোলনকারীদের প্রধান অস্ত্র। কয়েকটি কবিতার বিস্ফোরক অংশ উপস্থাপন করে তার সত্যতা যাচাই করা যেতে পারে। যেমন—

ক) "মা, তুমি আমায় কঙ্কালরূপে ভূমিষ্ঠ করলে না কেন ?
তাহলে আমি দুকোটি আলোকবর্ষ ঈশ্বরের পোঁদে চুমু খেতুম
কিন্তু কিছুই ভালো লাগে না আমার কিছুই ভালো লাগছে না
একাধিক চুমো খেলে আমার গা গুলোয়
ধর্ষণকালে নারীকে ভুলে গিয়ে শিল্পে ফিরে এসেছি কতদিন
কবিতার আদিত্যবর্ণা মূত্রাশয়ে"[১৪]
(প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার / মলয় রায়চৌধুরী)

খ) "দুঃসাহসী কেউ নেই যে এসে পেচ্ছাব করবে মুখে
জানে কামড়ে দেবো, জানে অঙ্গহানি হলে বুদ্ধদেব
কে পুনর্গঠিত করবে, পাগলা রামকিংকর বেইজ ছাড়া ?
জীবনেই একবার শিল্প-অনুরাগিণীর কাছে
ন্যাংটার উদ্বৃও অংশ হাতড়ে বলেছিলুম, কী ভাবো
শিল্পই যথেষ্ট ! কেন কার্তুজ লটকানো হলো দেহে ?"[১৫]
(শিল্প ও কার্তুজ / শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

গ) "মা তোমার গর্ভের চেয়ে সংঘাতিক মনে হচ্ছে সভ্যতা ও ব্লাস্টফার্নেস,"[১৬]
(ফিনাম্পলের ককটেল / প্রদীপ চৌধুরী)

ঘ) "আমার মাতাল মধ্যরাতের ডাক শুনে তুমি সাড়া দিয়েছ
বিমান ধ্বংসের মুখে যে রকম রাডার যন্ত্র
রক্ষা কর রক্ষা কর বলে মেলে ধরে বুক
একটি স্ত্রীলোকের উরুর বিদ্যুৎ লেগে
কেঁপে ওঠে হাত দ্রুত মাথায় রক্ত উঠে আসে"[১৭]
(জন্মনিয়ন্ত্রণ / শৈলেশ্বর ঘোষ)

ঙ) “মাতালের সঙ্গে রাস্তাদিয়ে হেঁটে যাওয়া অপরাহ্নে
বেশ্যাপাড়ার দিকে আমাকে ক্রমশ তন্দ্রাচ্ছন্ন করে তোলে
এবং মাছির কথা ভুলিনি— সেজন্য দু'মুহূর্ত 'মিষ্টান্ন
ভাণ্ডারে' দাঁড়াতে হল— বেলার জন্য কচুরি এবং অপরাহ্নেই
আমি ব্রণসমেত বেলাকে পেতে চাই বাথরুমের ভিতরে”[১৮]
(কুসংস্কার / উৎপলকুমার বসু)

চ) “কি রকম বিচ্ছিরি দ্যাখো পেচ্ছাপের কথা
প্রেমের সময়
চুমু'র শব্দে”[১৯] (০৯৮৭৬৫৪৩২১ / ফালগুনী রায়)

ছ) “আমার লিঙ্গ বড় একটা পোকার মত হয়ে গেছে
জানালায় শুয়ে শুয়ে দেখেছি সকাল বেলার রোদ হলুদ শয়ন
বেশ্যাবাড়ির পবিত্র অশ্লীলতা নিয়ে মন্দির ও গির্জা ও মসজিদের দিকে বয়ে
যাচ্ছে কলকাতা শুয়ে আছে, উরুর দ্বিধার মধ্যে মৃত্যু চেপে কলকাতা”[২০]
(নিজস্ব বিস্ফোরণ / সুবো আচার্য)

হাংরি আন্দোলন কবিতা ভিত্তিক এবং সেই কবিতার নতুন কারিগর মলয় রায়চৌধুরী। কেননা মলয় রায়চৌধুরী তার 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' কবিতায় যে কলা কৌশল প্রয়োগ করেছেন তাতেই শরিক কবির চিন্তা জগতে হাংরির গুপ্ত রহস্য প্রকাশ হয়ে ওঠে।

মলয় রায়চৌধুরী হাংরি আন্দোলনের স্রষ্টা। নান্দনিকতার আহাম্মক 'জট' ছাড়িয়ে বাংলা সাহিত্যে প্রথম 'জোটবদ্ধ' সাহিত্য সৃষ্টির নজির গড়লেন তিনি। আর “সেই জোটের বিন্যাসের কথাই তো আজ আধুনিকতা অতিক্রমী কবিরা বলতে চাইছেন।”[২১] তাই “জট থেকে এবং জোট থেকে জটিলতার দিকে ধাবমান”[২২] হওয়া হাংরি পাঠবস্তু আস্বাদন করে আমরা সে রকমই অনুভব করি। কারণ বাংলা সাহিত্যে চর্যাপদের সময় থেকে ধীরে ধীরে কবিতার বাঁকবদল ঘটলেও সকল বাঁকবদলের পেছনে ব্যক্তি প্রতিভা সক্রিয়ভাবে কাজ করেছে। কিন্তু আন্দোলনের মাধ্যমে জোটভাবে বা একত্রিতভাবে বাংলা কবিতায় বাঁকবদল আনার পেছনে হাংরি আন্দোলনই সর্বেসর্বা। এই আন্দোলন ভাবনার মাস্টার-মাইণ্ড মলয় রায়চৌধুরী। তাই বাংলা সাহিত্যের প্রথম এবং সার্থক পালাবদলকারী আন্দোলন হাংরি বা ক্ষুৎকাতর আন্দোলন। হাংরি আন্দোলন ভাবনা কবিতার আকারে বিস্ফারিত হলেও পরবর্তীতে তা বহুমুখী শিল্প-সাহিত্যের বোমারু বিচ্ছুরণ হয়ে তা আত্মপ্রকাশ করার ফলেই সেই আন্দোলন ইতিহাস হতে পেরেছিল সাহিত্য শব্দটিকে যোগ করে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় হাংরি আন্দোলনকে সমর্থন না করলেও সত্যতার বিচারে বলতে বাধ্য হয়েছেন— “ইদানিংকালের আন্দোলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হাংরি জেনারেশন— যাঁদের মূল বক্তব্য সমস্ত মূল্যবোধের বিনাশ। প্রত্যেক যুগেই এইসব আন্দোলনের সময় যে-সব লোক

বাংলা সাহিত্যের সবকিছু গেল গেল রব তোলেন, তাঁদের অতিশয় ন্যাকা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। ন্যাকা আর থুতু চাটা। যে কোনো ধ্বংস বা দক্ষ-যজ্ঞের কথাতেই সাহিত্যের কোনো ক্ষতি হয় না, বরং নিশ্চিত কয়েক ধাপ এগিয়ে দেয়।''[২৩] 'হাংরি কবিতার মূল্যায়ন প্রচেষ্টা' প্রবন্ধে মলয় রায়চৌধুরী সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উক্ত ভাষ্য তুলে ধরে তাঁর নিরপেক্ষ চিন্তার দিকটাকেই প্রকাশ করতে চেয়েচেন। পরবর্তীতে যা যথাযথ ইতিহাস সম্মত তথ্যের আকার হিসেবে হাংরি আন্দোলনকে আরও বেশি প্রতিষ্ঠিত করে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় স্বীকার করতে বাধ্য যে, সব আন্দোলনই সাহিত্যকে কয়েকধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু বাস্তব দৃষ্টিতে হাংরি আন্দোলন পঞ্চাশের পরবর্তী সময়ের সাহিত্যকে প্রভাবিত করে নতুন শুদ্ধ চেতনায় হাংরিমুখী করে দেয় বলেই একে একে অনেকগুলো আন্দোলনের জন্ম হয়।

ষাটের দশকে অনেকগুলো কবিতার সংকলন প্রকাশিত হয়। যাঁরা সেই সমস্ত কবিতা গ্রন্থ সংকলন করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম— পবিত্র মুখোপাধ্যায়, শান্তনু দাস, উত্তম দাশ অন্যতম। এঁদের সংকলনে একেবারে নিম্নমানের কবিতা স্থান পেলেও হাংরি আন্দোলনকারী কোনো কবিরই কবিতা তাঁরা তাঁদের সংকলনে স্থান দেননি। কিংবা সেই সময় অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রমুখরা হাংরি আন্দোলনের চিন্তাচর্চাকে একেবারে সাদাসিধাভাবে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন, কখনও বিরূপ মন্তব্য করেছেন। আজ কালের বিচারে হাংরি আন্দোলন ভাবনাই বাংলা সাহিত্যে পালাবদল করতে মেধার সঙ্গে প্রথম স্থানে দণ্ডায়মান। হাংরি আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে পবিত্র মুখোপাধ্যায় বলেন— ''গতানুগতিকতার জঞ্জাল-আবদ্ধ বাংলা ভাষা যখন হাঁসফাঁস করছে, তখন এই হাংরি জেনারেশনই এর বিরুদ্ধে প্রথম কলম ধরেছিলেন।''[২৪]

বিভিন্ন সময় হাংরি আন্দোলনকারীদের চিন্তার মেধাকে স্বীকার এবং অস্বীকার করে বহু লেখা বাংলা, হিন্দি, ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়। কোনো কোনো পত্রিকা গোষ্ঠী প্রকাশ করেন— হাংরি সংকলন। হাংরি আন্দোলন ভাবনার প্রভাব যদি বিশেষ বিস্তার না করত বা সাহিত্যের ওপর না পড়ত তাহলে কেন এত লেখালেখি, কেন এত আলোচনা-সমালোচনা, কেন জেল-হাজত ? হাংরি আন্দোলনের ওপর লেখা প্রবন্ধের তালিকা অনেক সম্পাদক তাঁদের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তাই হাংরি আন্দোলন ভাবনার চিন্তা বিভিন্ন মস্তিষ্কে বিভিন্ন প্রভাব ফেলেছিল। হাংরি আন্দোলন ভাবনার উষ্ণ চিন্তাকে নিবন্ধ ও সংবাদের মাধ্যমে বিভিন্ন সময় গুনিজনেরা যেভাবে প্রকাশ করেন আমরা তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা লিপিবদ্ধ করতে উৎসাহী, কারণ— হাংরি আন্দোলন ভাবনা কত চর্চিত ছিল সেটা জানা আমাদের অত্যন্ত আবশ্যক। যেমন—

১। আদিত্য ওহদেদার, 'অশ্লীলতা অভিযোগে বাংলার নিষিদ্ধ বই', দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৫, কলকাতা।
২। জ্যোতির্ময় দও, 'বাংরিজি সাহিত্যে ক্ষুধিত বংশ', দেশ সাহিত্য সংখ্যা ১৩৭৫, কলকাতা।
৩। শুভ দেব, 'সময়, সাহিত্য প্রসঙ্গে' ধৃতিদীপা, ২৪ মার্চ ১৯৬৭, কলকাতা।
৪। টুকরো কথা, যুগান্তর, ২৯ আগস্ট ১৯৬৭, কলকাতা।

৫। মোহিত চট্টোপাধ্যায়, 'কবিতার নববর্ষ', সত্তর, ১৩৭৫, কলকাতা।
৬। নিখিলেশ্বর, 'প্রপঞ্চ সাহিত্যমলো যুবতবম্ তিরুগুবাটু আকলিতম', ভারতী, জানুয়ারি ১৯৬৭, মাদ্রাজ।
৭। 'কলকাত্তা আউর কলকাত্তা', শতাব্দী, আগস্ট ১৯৬৭, জব্বলপুর।
৮। ডঃ গুরুচরণ সামন্ত ও অন্যান্য, 'গ্রন্থ সমালোচনা' সপ্তদীপা, ১৯৬৮, কলকাতা।
৯। ধূর্জটি চন্দ, 'হাংরি গদ্য ও পোস্টমর্টম', আবহ, নববর্ষ ১৩৭৭, কলকাতা।
১০। অজ্ঞেয় সর্বেশ্বর দয়াল সাক্সেনা, 'শংকরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার' দিনমান, ৭ এপ্রিল ১৯৬৮, দিল্লি।
১১। 'শোক মাতাল' আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ মে ১৯৬৮, কলকাতা।
১২। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, 'প্ররোচিত, না প্ররোচিত সাহিত্য', যুগান্তর, ২৯ আগস্ট ১৯৬৮, কলকাতা।
১৩। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, 'যুবযন্ত্রণা এবং সাহিত্য' দৈনিক বসুমতী, শারদীয় সংখ্যা ১৯৬৮, কলকাতা।
১৪। মুকুল রায়, 'ভাষা বদল', কয়েকজন, ১৯৬৮, কলকাতা।
১৫। ডঃ জগদীশ গুপ্ত, 'কিসিম কিসিম কে কবিতা', ধর্মযুগ, ২১ এপ্রিল ১৯৬৮, বোম্বাই।
১৬। কার্টুন ; 'ম্যায় ভুখীপীঢ়ি কে কবি হুঁ', সাপ্তাহিক হিন্দুস্থান, ২১ জুলাই ১৯৬৮, দিল্লি।
১৭। 'ভোখোপীঢ়ি কা কবি লেখক কাঠমাণ্ডৌমা' গোরখা পত্র, ১১ এপ্রিল ১৯৬৮, কাঠমণ্ডু, নেপাল।
১৮। 'নবকুঞ্জ নে গোষ্ঠী' গোরখা পত্র, ১৬ এপ্রিল ১৯৬৮, কাঠমাণ্ডু, নেপাল।
১৯। সুপ্রিয় বাগচী, 'হাংরি জেনারেশন এবং চূর্ণিত দালাল কবিবৃন্দ' কবিতা, ১৩৭৭, কলকাতা।
২০। নির্মলানন্দ বাৎস্যায়ন, 'হাংরি জেনারেশন', অন্ধজ্যোতি, ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯, বিজয় রাঢ়া-২।
২১। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, 'উৎপল সম্পর্কে' কয়েকজন, ১৯৬৮, কলকাতা।
২২। বাসুদেব দাশগুপ্ত, 'সাক্ষাৎকার', নিষাদ, ১৯৭০, কলকাতা।
২৩। সত্যেন চক্রবর্তী, 'হাংরি জেনারেশন বিবলিওগ্রাফী', প্রতিদ্বন্দ্বী, আগস্ট ১৯৭০, কলকাতা।
২৪। আজকের গল্প ঃ ভূমিকা, সম্পাদক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অধুনা, ১৯৬৯, কলকাতা।
২৫। সত্য গুহ, 'একালের গদ্য পদ্য আন্দোলনের দলিল', অধুনা, ১৯৭০, কলকাতা।
২৬। সুশান্তকুমার দাস, 'সেই ট্র্যাজিক অশ্লীলতা ও বাংলা সাহিত্য' চারুপত্র, জুলাই ১৯৭১, কাঁথি, মেদিনীপুর।
২৭। মুকুল রায়, 'এস্টাব্লিশমেন্ট কেন আধুনিকতা নয় ?' আবহ, ১৯৭১, কলকাতা।
২৮। দীপেন্দ্র চক্রবর্তী, 'বাংলা সাহিত্যে হিপি নৃত্য', সমকাল পত্র, মে ১৯৭১, কলকাতা।
২৯। শৈলেশ্বর ঘোষ, 'হাংরি জেনারেশন আন্দোলন এবং আণ্ডারগ্রাউণ্ড সাহিত্য', ক্ষুধার্ত, নভেম্বর ১৯৮১, কলকাতা।

৩০। মলয় রায়চৌধুরী 'হাংরি আন্দোলন ঃ পিছন ফিরে দেখা', জিজ্ঞাসা, ৫ বর্ষ ৩ সংখ্যা, ১৩৯১,কলকাতা।
৩১। উত্তম দাশ, 'হাংরি জেনারেশন ঃ একটি সমীক্ষা', মহাদিগন্ত, শারদীয় সংখ্যা ১৯৮৪, বারুইপুর, ২৪ পরগণা।
৩২। অজিত রায়, 'হাংরি কবিতা ঃ গোরস্থান পরিক্রমা', সুরঞ্জনা, শারদ সংকলন ১৩৯২, মেদিনীপুর।
৩৩। মলয় রায়চৌধুরী, 'হাংরি কবিতার মূল্যায়ন প্রচেষ্টা', কৌরব, জুন ১৯৮৫, জামসেদপুর।
৩৪। মিহির রায়চৌধুরী, 'ষাট দশকের কৃত্তিবাস ঃ চতুর্থ পর্ব', প্রাংশু, জুলাই ১৯৮৫, নতুন দিল্লি।
৩৫। দিলীপ ঘোষ, 'হাংরি জেনারেশন ঃ ফোড়া বিষফোড়া', কৌরব, আশ্বিন ১৩৮৮, জামসেদপুর।
৩৬। স্বর্ণ কিরণ, 'উদ্ধত পীঢ়ী উদ্ধত সাহিত্য' নঈ ধারা, জুন ১৯৮৬,পাটনা।
৩৭। বাবুল সিরাজ, 'হাংরি জেনারেশন', উত্তর প্রবাসী, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫, গোটেনবার্গ, সুইডেন।
৩৮। 'উঠতি গুণ্ডা' সপ্তাহ, মার্চ ১৯৮৬, কলকাতা।
৩৯। মিহির রায়চৌধুরী, 'হাংরি আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ধারাভাষ্য', পদ্য গদ্য সংবাদ, অক্টোবর ১৯৮৬, কলকাতা।
৪০। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'সাহিত্যের জন্য কাউকে আদালতে শাস্তি দেওয়া হবে তা আমি সমর্থনযোগ্য মনে করি না', পদ্য গদ্য সংবাদ, অক্টোবর ১৯৮৬, কলকাতা।
৪১। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, 'আমার বউ আমাকে জেলে যেতে বারণ করেছিল', পদ্য গদ্য সংবাদ, অক্টোবর ১৯৮৬, কলকাতা।
৪২। সুবিমল বসাক, 'হাংরি লেখা পাঠকের হাতে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজন ছিলই', পদ্য গদ্য সংবাদ, অক্টোবর ১৯৮৬, কলকাতা।
৪৩। দেবী রায়, 'হাংরি আন্দোলনের প্রতি মনেপ্রাণে বিশ্বস্ত থাকাই আমার একমাত্র ভূমিকা ছিল', পদ্য গদ্য সংবাদ, অক্টোবর ১৯৮৬, কলকাতা।
৪৪। অরুণেষ ঘোষ, 'হাংরি আন্দোলন শেষ হলেও কিন্তু তার প্রবাহ শেষ হয়নি', পদ্য গদ্য সংবাদ, অক্টোবর ১৯৮৬, কলকাতা।
৪৫। অমর ভট্টাচার্য, 'হাংরি-অ্যাঙ্গরি-সুররেয়ালিস্ত জাতীয় আলোড়ন, সবকিছুর পরও নিছক আপতিক অনর্থক নয়', পদ্য গদ্য সংবাদ, অক্টোবর ১৯৮৬, কলকাতা।
৪৬। শচীন বিশ্বাস, 'সময় ছোটগল্প ও তরুণ লেখক সমাজ', সৃজনী, ১৩৭৪, কলকাতা।
৪৭। দীপঙ্কর রায়, 'হাংরি জেনারেশন ষড়যন্ত্র মামলা' পথের পাঁচালী, দ্বাদশ সংকলন, কলকাতা।
৪৮। ফণীশ্বরনাথ রেনু, 'বন তুলসীর গন্ধ' রাজকমল প্রকাশনী, দিল্লি।
৪৯। শঙ্খ ঘোষ, 'প্রতিষ্ঠান এবং আত্মপ্রতিষ্ঠান' (১৯৭১), 'লেখকের নিয়তি' (১৯৭২), 'শব্দ আর সত্য' (১৯৭২), প্যাপিরাস, কলকাতা।
৫০। উত্তম দাশ, 'হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন' মহাদিগন্ত, জানুয়ারি ১৯৮৬, বারুইপুর, ২৪ পরগণা।
৫১। শৈলেশ্বর ঘোষ, 'প্রতিবাদের সাহিত্য' প্রতিভাস, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪, কলকাতা।
৫২। করুণানিধান মুখোপাধ্যায়, 'আমি কি ক্ষুৎকাতর', পদ্য গদ্য সংবাদ, অক্টোবর ১৯৮৬, কলকাতা।

হাংরি আন্দোলনকে নিয়ে এখন পর্যন্ত প্রায় হাজার খানেক নিবন্ধ, সংবাদ, অনু-আলোচনা, বিশেষ সংখ্যা, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। মলয় রায়চৌধুরী, সমীর রায়চৌধুরী, শৈলেশ্বর ঘোষ, প্রদীপ চৌধুরী, দেবী রায়, বাসুদেব দাশগুপ্ত, সুভাষ ঘোষ, অনিল করঞ্জাই, সুবিমল বসাক, ফালগুনী রায় প্রমুখকে নিয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন হাংরি প্রেমী এবং পত্রিকা গোষ্ঠী। হাংরি আন্দোলন এবং তার সুফল ও কুফল নিয়ে আলোচনা সমালোচনার অন্ত্য নেই। এর মূল— বাংলা সাহিত্যে হাংরি আন্দোলন এবং তার বাচন প্রক্রিয়ার বহুস্বরিক প্রভাব। যত দিন যাবে হাংরি আন্দোলন ভাবনার প্রতিপত্তি আরও বিস্তার লাভ করবে বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠাজুড়ে। হাংরি আন্দোলন ভাবনার প্রভাব বাংলা সাহিত্যে প্রচণ্ডভাবে বিস্তার লাভ করলেও এই আন্দোলনকে অস্বীকার করতে চাইছেন একটি গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়। কৌতূহলী তরুণ প্রজন্ম যা মেনে নিতে পারছেন না। হাংরি আন্দোলনের সাহিত্য সৃষ্টির প্রতি তরুণদের ক্রমবর্ধমান আগ্রহ বাংলা সাহিত্যের জগতে এক স্বাস্থ্যকর লক্ষণ।

বাংলা সাহিত্যে ঘটে যাওয়া শ্রুতি (১৯৬৫), ধ্বংসকালীন (১৯৬৬), প্রকল্পনা সর্বাংগীন (১৯৬৯), নিম সাহিত্য (১৯৭০), গল্পতন্ত্র ও চাকর সাহিত্য বিরোধী (১৯৭০), ঘটনাপ্রবাহ গদ্য (১৯৭২), ছাঁচ ভেঙে ফ্যালো (১৯৭৪), নিত্তলিট মুভমেন্ট (১৯৭৪), নতুন নিয়ম (১৯৭৮), সমন্বয়ধর্মী গল্প (১৯৭৯), গাণিতিক গল্প (১৯৮০), থার্ড লিটারেচার (১৯৮২), উত্তর আধুনিক কবিতা (১৯৮৫), মালোভী (১৯৮৮), ইত্যাদি আন্দোলনের সঙ্গে হাংরি আন্দোলন (১৯৬১) এর পার্থক্য অনেক বেশি। কারণ হাংরি আন্দোলন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আন্দোলন বলতে যা বোঝায় সেই অর্থে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে হাংরি হচ্ছে প্রথম ঘোষিত আন্দোলন। বলা যায় পরবর্তী সকল আন্দোলনের মধ্যে হাংরি আন্দোলনের একটা অপ্রত্যক্ষ প্রভাব গোপনে উচ্চারিত হয়। হাংরি আন্দোলন সমাপ্তি ঘোষণার পরই বাংলা সাহিত্যে রাতারাতি কিছু একটা করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তোড়জোর স্বরূপই বোধ হয় পরবর্তী আন্দোলনগুলোর জন্ম। নইলে হঠাৎ করে এত নতুন নতুন চিন্তা যুবক সাহিত্যিকদের মধ্যে দেখা দেবার কথা নয়। কারণ যাঁরা হাংরি আন্দোলনের পরবর্তীতে কিছু একটা নতুন চিন্তায় সাহিত্য জগতে পরিবর্তন চাইলেন তার মূলে পাশ্চাত্য অনুকরণ। তাই ওই সমস্ত আন্দোলকারীদের অনেকেই পরবর্তীতে নিজের চিন্তা থেকে সরে গিয়ে ব্যবসায়িক গণ্ডির মধ্যে ঘুরে বেড়িয়েছেন। কিন্তু মনে প্রাণে হাংরি চিন্তায় দীক্ষিত কবি-সাহিত্যিক আজও নান্দনিক চিন্তা এবং প্রতিষ্ঠানকে অবজ্ঞা করে চলেন। সমীর চৌধুরী বলেন— "হাংরি জেনারেশন আন্দোলনের সঙ্গে অন্য সমস্ত সাহিত্য আন্দোলনের একটা মৌলিক পার্থক্য রয়ে গেছে। কেননা, হাংরি ব্যতীত অন্য সমস্ত সাহিত্য আন্দোলনের মূল তত্ত্বগত দিকটিই বিদেশ থেকে ধার করে আনা।"[২৫]

পৃথিবীর সমস্ত কিছুই পরবর্তনশীল। সেই অর্থে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আসা স্বাভাবিক। বাংলায় সেই পরিবর্তনের ভগীরথ হাংরি আন্দোলনকারী শরিকবৃন্দ। এঁরা চেষ্টা করেছেন বাস্তব সমাজ ও সাহিত্যে সমস্ত ভণ্ডামির বিরুদ্ধে তলোয়ার চালাতে। এঁরাই প্রথম সার্থক হয়েছেন এস্ট্যাবলিশমেন্টের বিরুদ্ধে মসিযুদ্ধ করতে। বাংলা সাহিত্যে এমন আন্দোলনের প্রয়োজন ছিল বলেই কলকাতায় যুবকরা ঝাঁকে ঝাঁকে হাংরি আন্দোলনের শরিক হন এবং যাঁরা শরিক হননি তাঁরা ভীত হয়ে নিজেকে অনেকক্ষেত্রে গুটিয় নেবার চেষ্টা করেন। অবশেষে

ষড়যন্ত্র করে হাংরি আন্দোলনকে ভেঙে দেন। "নিঃসন্দেহে তাঁদের সংগ্রাম সততাপূর্ণ এবং নৈরাজ্যবাদী হাংরিদের আক্রমণ অপ্রতিরোধ্য...।"[২৬] হাংরি আন্দোলন নানা বাধা বিপত্তি ও সমালোচনার সম্মুখীন হলেও, অনেকের কুদৃষ্টির রোষবাষ্পে সাময়িক ক্ষতিগ্রস্ত হলেও পৃথিবী-ব্যাপী তা প্রচার লাভ করেছিল তার প্রমাণ মেলে বিভিন্নজনের বিদগ্ধ মতামতের মাধ্যমে। বিশেষ করে আমাদের মনোজ্ঞ গবেষণায় তাই প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। যা সর্বজন সমর্থিত।

হাংরি আন্দোলনকারীরা চেয়েছেন বাস্তাব জীবন ও সাহিত্যে চূড়ান্ত স্বাধীনতা। গোলামী সাহিত্য কেন্দ্র থেকে কবি-সাহিত্যিকদের টেনে বের করে স্বাধীনচেতা সাহিত্য সম্রাটের মুকুট পরাবার উদ্দেশে হাংরি আন্দোলনকারীরা খড়্গহস্ত হয়েছিলেন। ভাঙনের সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে সাহিত্যে যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে হাংরি আন্দোলন ভাবনা। পুরোনো মূল্যবোধ থেকে সরে দাঁড়ানো হাংরি আন্দোলন ভাবনার অন্য আরও একটি উদ্দেশ্য বলা হয়ে থাকে। বিশেষ করে বলতে গেলে বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্য জগতে পৃথিবীব্যাপী একটা পরিবর্তন লক্ষিত হয়েছে ; তা ভারতবর্ষের বাঙালি যুবকদের মস্তিষ্কের সাহিত্য কেন্দ্রে প্রতিফলিত হলে আশ্চর্য হবার কিছু থাকে না। বরং হাংরি আন্দোলনের মাধ্যমে প্রপ্যাগ্যাণ্ডা সাহিত্য এক নতুন দিশা দেখিয়েছে বলেই আজও তার প্রভাব বহু চর্চিত।

আন্দোলন তখনই সফল যখন সেই আন্দোলনের আওয়াজ দূর দূরান্তে প্রতিষ্ঠার আসন দখল করা ব্যক্তির মাথায় চিন্তাবীজ বপিত করে। হাংরি আন্দোলনের শরিকরা ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন। তারফলেই অনেক শক্তিশালী সাহিত্যিকরাও হাংরি আন্দোলনকারীদেরকে ভয় পান এবং এড়িয়ে চলেন। কেননা হাংরি আন্দোলকারীরা ছিলেন সত্যের পূজারি। এঁরা সাহিত্যে কল্পনাকে প্রশ্রয় দেন না। সিগারেটে সুখটান দিয়ে চায়ের চুমুর আত্মসাৎ করে দোয়াতে কলম ডুবিয়ে ভেবে ভেবে লেখার বিরোধী হাংরি মন্ত্রে দীক্ষিত সম্প্রদায়। প্রতাপশালীদের সমস্ত কু-মতলবকে নস্যাৎ করে এঁরা এগিয়ে গেছেন বুদ্ধি ও কলমের জোরে। তাই হাংরি চিন্তার বীজ পরিণত হয়ে উঠেছে বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। উর্বর চিন্তাভূমিতে হাংরির মানদণ্ড নিয়ে চাষ হতে দেখে আমরা বিশ্বাস করি আগামীতে বহু পুষ্টিকর ফসল সাহিত্যের নতুন বেলাভূতি রচনা করতে সক্ষম হবে।

হাংরি আন্দোলনকারীদের লেখাকে অশ্লীল আখ্যা দেওয়া, বিশেষ করে 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' কবিতার বিরুদ্ধে অশ্লীলতার মামলা এনে মলয় রায়চৌধুরীর বিরুদ্ধে যে কেস করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্রমূলক। কারণ এই ষড়যন্ত্রের মূল হাংরি আন্দোলনের প্রচণ্ড প্রতাপে কলকাতা তখন গা ভাগিয়ে দিয়েছে। যুবক কবিরা সাহিত্য রচনার বেলাভূমি আবিষ্কার করে উৎফুল্লিত। যাইহোক, তরুণ সান্যাল মহাশয় 'অবধূত'-এর একটি লেখার কয়েকটি স্তবক তুলে এনে অশ্লীলতা সম্পর্কে অঙ্গুলি নির্দেশ করে দিচ্ছেন। অবধূত-এর লেখা 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' থেকে অনেক বেশি অশ্লীল। তবে একথা সত্য— অনেকেই পুলিশি মামলার ভয়ে সরে গেলেও কিংবা হাংরি আন্দোলনকে অস্বীকার করলেও কয়েকজন যুবক হাংরি জেনারেশনকে শক্ত হাতে ধরে রেখেছিলেন— সেকথা স্বীকার করতেই হবে। এই আপোসহীন যুবকদের প্রধান মলয় রায়চৌধুরী, যাঁর দৃঢ় চিন্তার কাছে পুলিশের থার্ড ডিগ্রিও দুর্বল হয়ে যায়।

উল্লেখপঞ্জি

১. রায়চৌধুরী মলয়, 'হাংরি আন্দোলনের' মজাগুলো, হাওয়া ৪৯, পৃষ্ঠা-৯৫, ৯৬
২. তদেব, পৃষ্ঠা-৯৪
৩. তদেব, পৃষ্ঠা-৯৮
৪. রায়চৌধুরী মলয়, 'হাংরি কিংবদন্তী', তদেব, পৃষ্ঠা-১৮,১৯
৫. রায়চৌধুরী মলয়, 'হাংরি প্রতিসন্দর্ভ', হাওড়া ৪৯, তদেব, পৃষ্ঠা-২৩
৬. রায়চৌধুরী মলয়, 'কৃত্তিবাস থেকে হাংরি আন্দোলন ঃ বাংলা কবিতার পালাবদল' হাওয়া ৪৯, তদেব, পৃষ্ঠা-৬০
৭. তদেব, পৃষ্ঠা-৬৩
৮. তদেব, পৃষ্ঠা-৬৩,৬৪
৯. ঘোষ শৈলেশ্বর, 'হাংরি জেনারেশন আন্দোলন', ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, কলকাতা-৩৫, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-৭
১০. রায়চৌধুরী মলয়, 'হাংরি আন্দোলনের ইশতাহার', আবার এসেছি ফিরে, কানাপুকুর, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ-৭৮২১৩৫, প্রথম প্রকাশ ঃ বসন্ত ১৪১৪, পৃষ্ঠা-১৯
১১. গঙ্গোপাধ্যায় সুনীল, 'সাহিত্যের জন্য কাউকে আদালতে শাস্তি দেওয়া হবে তা আমি সমর্থনযোগ্য মনে করি না', পদ্যগদ্য সংবাদ, সম্পাদক ঃ সুমিতাভ ঘোষাল, কলকাতা, অক্টোবর ১৯৮৬, পৃষ্ঠা-৫
১২. চট্টোপাধ্যায় সন্দীপন, 'আমার বউ আমাকে জেলে যেতে বারণ করেছিল', পদ্যগদ্য সংবাদ, তদেব, পৃষ্ঠা-৮
১৩. রায় দেবী, 'হাংরি আন্দোলনের প্রতি মনেপ্রাণে বিশ্বস্ত থাকাই আমার একমাত্র ভূমিকা ছিল', পদ্যগদ্য সংবাদ, তদেব, পৃষ্ঠা-১৩
১৪. রায়চৌধুরী মলয়, 'কবিতা সংকলন', মলয় রায়চৌধুরীর কবিতা ২০০৪-১৯৬১, আবিষ্কার প্রকাশনী, কলকাতা-৭০, প্রথম প্রকাশ ঃ মার্চ ২০০৫, পৃষ্ঠা-১৮২
১৫. চট্টোপাধ্যায় শক্তি, 'হাংরি কিংবদন্তী', মলয় রায়চৌধুরী, দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ঃ জুলাই ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-২৯
১৬. চৌধুরী প্রদীপ, 'চর্মরোগ', হাংরি জেনারেশন রচনা সংকলন, সম্পাদক ঃ সমীর চৌধুরী, কথা ও কাহিনী, বুকসেলার্স প্রাঃ লিঃ, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ঃ এপ্রিল ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-১৯১
১৭. ঘোষ শৈলেশ্বর 'জন্মনিয়ন্ত্রণ', জেব্রা, সম্পাদক ঃ মলয় রায়চৌধুরী, জেব্রা বুকস, ১৩ বিপিন গাঙ্গুলি রোড, দমদম, কলকাতা-৩০, প্রকাশ ঃ ১৩৭৪, পৃষ্ঠা-৫৮
১৮. বসু উৎপলকুমার, 'কুসংস্কার', হাংরি জেনারেশন, প্রকাশক ঃ সমীর রায়চৌধুরী, ৪৮-এ শংকর হালদার লেন, আহিরিটোলা, প্রকাশ ঃ ১৯৬৪, পৃষ্ঠা-
১৯. রায় ফালগুনী, '০৯৮৭৬৫৪৩২১', ফালগুনী রায় সমগ্র, হাওয়া ৪৯, ২৪ বি. ব্রহ্মপুর নর্দার্ন পার্ক, বাঁশদ্রোনী, কলকাতা-৭০, প্রথম প্রকাশ ঃ বইমেলা ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-১২

২০. আচার্য সুবো, 'নিজস্ব বিস্ফোরণ' হাংরি জেনারেশন রচনা সংকলন, সম্পাদক ঃ সমীর চৌধুরী, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, পৃষ্ঠা-১০৬, ১০৭
২১. মজুমদার জহর সেন, 'জটিলতা, জীবনানন্দ ও কবিতার বাঁকবদল', কবিতীর্থ, সম্পাদক ঃ উৎপল ভট্টাচার্য, অঙ্কুর, ৫০/৩ কবিতীর্থ সরণি, কলকাতা-২৩, প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-৮৫
২২. তদেব, পৃষ্ঠা-৮৫
২৩. ব্রহ্ম শংকর, 'সাহিত্যের বিশিষ্ট আন্দোলন হাংরি জেনারেশন', কবিতা, কলকাতা, ২৬ সংকলন, প্রকাশ ঃ ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-১৩, ১৪
২৪. তদেব, পৃষ্ঠা-১৪
২৫. চৌধুরী সমীর, 'হাংরি জেনারেশন কেন', কথা ও কাহিনী, তদেব, পৃষ্ঠা-এক
২৬. গুহ সত্য, 'একালের গদ্যপদ্য আন্দোলনের দলিল', তদেব, পৃষ্ঠা-২৪৬, ২৪৭ □

তৃতীয় অধ্যায়

পৃথিবীব্যাপী হাংরি আন্দোলনের দামামা

বাস্তব জীবনে আজ সব ব্যাপারেই আন্দোলনের প্রয়োজন লক্ষণীয়। তার মূলে মতানৈক্য। চিন্তার এলোমেলোতা। স্বার্থ এবং এক গুঁয়েমি মূর্খতার শ্যাওলাকে ধূয়ে দিতে বারবার আন্দোলনের জন্ম হয়েছে। কখনও সমস্ত সিস্টেমকে অস্বীকার করতেও আন্দোলন দানা বেঁধেছে। কখনও নিজের মতকে জাহির করতে কিংবা স্বীকৃতি দিতেও আন্দোলন হয়েছে। সেই মতে পৃথিবীর বিভিন্ন শিল্প সাহিত্যে আন্দোলন এবং মতবাদ গড়ে উঠেছে বারবার। বিভিন্ন দেশে সংগঠিত মতবাদ এবং আন্দোলনগুলোর কয়েকটা হল— প্লেটোনিজম স্টোইসিজম হেডোনিজম এফরিজম ক্লাসিসিজম মিস্টিসিজম হিউম্যানিজম গঙ্গোরিজম পেত্রার্কানিজম প্যারালানিজম ম্যানারিজম আইডিয়ালিজম রোমাণ্টিসিজম সেণ্টিমেণ্টালিজম অ্যানার্কনিজম ওয়েদারিজম ওসিয়ানিজম প্যান্থাইজম ফবিজম ফিউচারিজম ডাডাইজম সুররিয়ালিজম বিটনিক লুমিনিজম ডিটারমিনিজম ডিকাডেনটিজম আলট্রাইজম কিউরিজম পয়েণ্টিসিজম এক্সপেশনিজম একজিসটেনটিয়ালিজম ইমাজিজম ভর্টিসিজম সিম্বলিজম সিনিসিজম তার্শিজম মডার্নিজম পোস্টমডার্নিজম ইত্যাদি।

সাহিত্য শিল্পে ভারতেও বারবার আন্দোলন হয়েছে। "হিন্দী প্রতীকবাদী ও ছায়াবাদী আন্দোলন, ওড়িয়া ভাষায় অবধূত গোষ্ঠী বা সুবজ গোষ্ঠীর আন্দোলন, মহারাষ্ট্রের দলিত সাহিত্য আন্দোলন স্ব স্ব ভাষার পত্রিকাগুলিকে কেন্দ্র করে পরীক্ষা চালিয়ে গেছে।"[১] অসমিয়াতে 'অরুণোদয়' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সাহিত্যে নতুন পথের বাতাবরণ লক্ষ্য করা গেছে। এমনিভাবে বিভিন্ন সময় বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে আন্দোলনের জোয়ার দেখা দেয়। তার মূল ক্ষুদ্র পত্রিকা, ইশতিহার বা ম্যানিফেস্টো ধরনের সাধারণ প্রচার মাধ্যম। এই সমস্ত আন্দোলনের প্রধানরা উচ্চাশিক্ষিত এবং তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন। এঁরা দেশি বিদেশি এবং আঞ্চলিক ভাষা-সাহিত্যের রস আস্বাদনে সমান দক্ষ।

সমস্ত আন্দোলনের মূল রসদ কবিতা এবং গল্প। 'কল্লোল' যুগের লেখকদের আত্মপ্রকাশ কিংবা মতবাদকে মেলে ধরার মাধ্যম ছিল প্রধানত কবিতা। সেই কবিতা যে আন্দোলন নয় এবং তা যে মূলত রবীন্দ্রনাথের বিরোধীতা করা— তার প্রমাণ মেলে দীপ্তি ত্রিপাঠীর উল্লিখিত কবিতার বৈশিষ্ট্য আস্বাদন করে। তাঁর বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে প্রধানত রয়েছে— পাশ্চাত্য অনুকরণ, ফ্রয়েডের যৌনতত্ত্বের প্রভাব, সাম্যবাদ ও মার্কসবাদকে সাহিত্যে স্থান দেওয়া, ঈশ্বরে অবিশ্বাস, বিজ্ঞানের স্বীকৃতি, জীবন সম্পর্কে ক্লান্তি ও নৈরাশ্যবোধ, রবীন্দ্রনাথের বিরোধীতা ইত্যাদি। আবু সয়ীদ আয়ুব বলেছেন— মহাযুদ্ধ পরবর্তী কালখণ্ড এবং রবীন্দ্র প্রভাব মুক্ত। তাহলে বোঝা যায় কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি, পরিচয়, কবিতা ইত্যাদি পত্রিকা কোনো আন্দোলন সৃষ্টি করেনি। তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য— রবীন্দ্র প্রভাব থেকে মুক্তি, পাশ্চাত্য অনুকরণ, যৌনতাকে কৌশলে সাহিত্যে স্থান দেওয়া, মার্কসীয় দর্শন এবং সাম্যবাদকে প্রচার করা।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুরই পরিবর্তন লক্ষিত হয়। যুবকরা সব সময়ই সহজ পথে চলার বিরোধী। তারা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে একটা কিছুর মাধ্যমে জনসমক্ষে আত্মপ্রকাশ ঘটায়। তারই ফলশ্রুতি বিংশ শতাব্দীর পাঁচের দশকে ভূমিষ্ঠ হওয়া 'শতভিষা' (১৯৫১) এবং 'কৃত্তিবাস' (১৯৫৩)। দুটো পত্রিকাতেই একদল শিক্ষিত তরুণ চেষ্টা করেছেন সাহিত্যে একটুখানি আলাদা হতে এবং সফলও হয়েছেন তাঁরা। অনেকে 'শতভিষা' এবং 'কৃত্তিবাস' পত্রিকাকে আন্দোলনের সফল হাতিয়ার হিসেবে চিহ্নিত করেন। বাস্তবিক এই দুটো পত্রিকার একটিকেও আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করলে ভুল করা হয়। "পালাবদল তো অবশ্যই ঘটেছিল, কিন্তু সে পালাবদল কেবল কৃত্তিবাস থেকে নয়, কৃত্তিবাস যে আধিবিদ্যাগত মনন বিশ্বে লালিত, সেই কলোনিয়াল ইসথেটিক রেজিম বা ঔপনিবেশিক নন্দন চিন্তাতন্ত্র থেকে, বাঙালি জীবনে যে চিন্তাতন্ত্রটির প্রতিষ্ঠা কবিতা-কল্লোল-কৃত্তিবাস-শতভিষা-নতুন রীতিরও বহু আগে থেকে ঘটেছিল, সেই ১৮৩৫ থেকে যখন শিক্ষার বাহন রূপে ইংরেজির অনুপ্রবেশ হল, এবং ১৮৫৭ সনে, মহাবিদ্রোহের বছরে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইউরোপীয় ভাবনার ধারক বাহক রূপে, আবির্ভাব থেকে জন্মাল এক নতুন ধরনের বাঙালি, যাঁরা তাঁদের নিজেরই স্থানিক বা ভূমিজ পরিসর থেকে উৎপাটিত।"[২]

বিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশকে বেশ কিছু গদ্য পদ্য আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। একটা মার মার রব। অনেকের অন্তরেই সাহিত্যে কোনো নতুন বীজ বপিত করার প্রয়াসে আন্দোলন দেখা দেয়। সবগুলোই সাহিত্য আন্দোলন। কিন্তু সবার নিজস্ব চিন্তা, বৈশিষ্ট্য, দর্শন থাকলেও বাংলা সাহিত্যে ভিত কাঁপিয়ে দিতে সমর্থ হয়েছিল একমাত্র হাংরি আন্দোলন। বাংলা সাহিত্যে 'হাংরি'-ই ঘোষিত করে আন্দোলন আরম্ভ করে। হাংরি আন্দোলনই পেরেছিল বাংলা সাহিত্যে পালাবদল করতে। বলা যেতে পারে "হাংরি আন্দোলনের আনা বদলটা চিন্তাতন্ত্রের ; সময়তাড়িত চিন্তাতন্ত্র থেকে পরিসরলব্ধ চিন্তাতন্ত্রে। কলোনিয়াল ইসথেটিক রিয়ালিটি থেকে নিজেদের মুক্তিকে হাংরি আন্দোলনকারীরা হাংরিয়্যালিজম নামে চিহ্নিত করেছিলন।"[৩] হাংরি আন্দোলন বাংলা সাহিত্যের বুকে পালাবদল ছিল বলেই তখনকার প্রতিষ্ঠিত লেখকরা ভয়ে গেল গেল রব তুলেছিলেন। সাহিত্য জগতে তাঁরা বোল্ড-আউট হয়ে ধরাশায়ী হতে লাগলেন। তখন হাংরি আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে সমস্ত ভারতবর্ষে। এই আন্দোলনের প্রভাব বাংলা ছাড়িয়ে হিন্দি তামিল মালায়ালম মারাঠি নেপালি ইংরেজি ইত্যাদি সকল ভাষা-গোষ্ঠীর তরুণ সাহিত্যিকদের ওপর পড়তে শুরু করে দিয়েছে।

অনেকে বলেন—. 'হাংরি' আন্দোলন অ্যালেন গিন্সবার্গ দ্বারা পরিচালিত 'বিট' আন্দোলনের প্রতিচ্ছবি। কথাটা সত্য বলে মেনে নেওয়া দুরূহ। সেই সময় সারা পৃথিবীতে সব কিছুতেই একটা আন্দোলনের হাওয়া বইছিল। হাংরি আন্দোলনকারীদের প্রধান যাঁরা ছিলেন তাঁদের ওপর 'বিট-ত্র্যাংরি'-র প্রভাব না থাকলেও, বিদেশি সাহিত্যের প্রভাব অনেকটাই ছিল। হাংরি আন্দোলনের স্রষ্টা মলয় রায়চৌধুরী জানিয়েছেন— 'হাংরি' শব্দটা তিনি জিওফ্রে চসার-এর 'ইন দ্য সাওয়ার হাংরি টাইম' বাক্য থেকে নিয়েছেন এবং তার দার্শনিক প্রেক্ষিতটি আবিষ্কার করেন ওসওয়ালর্ড স্পেংলারের 'দি ডিক্লাইন অব দি ওয়েস্ট' বই থেকে। 'বিট' কিংবা 'ত্র্যাংরি' কিংবা গিন্সবার্গের প্রভাব হাংরি আন্দোলনকারীদের ওপর রয়েছে বলে যে

অভিযোগ তার মূলে যে তথ্যটি আবিষ্কৃত হয় তা হল— বিট কিংবা হ্যাংরি আন্দোলনকারীদের মতো সমান জীবন-যাপন। দ্বিতীয় কথা হল— হাংরি আন্দোলন চলাকালীন গিন্সবার্গ ভারতে এলে (১৯৬৩-র এপ্রিল) তিনি সমীর রায়চৌধুরী এবং মলয় রায়চৌধুরীর সঙ্গে দীর্ঘ কয়েক মাস তাঁদের পাটনার বাড়িতে অতিবাহিত করেন। কিন্তু হাংরি আন্দোলন হয় ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে। নিরপেক্ষ বিচার করলে হাংরি আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য দর্শন ইত্যাদির সঙ্গে গিন্সবার্গের আন্দোলনের বিন্দুমাত্র মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। শুধু দুই গোষ্ঠীর জীবন-যাত্রার মধ্যে একটা অদৃশ্য যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায় মাত্র। গিন্সবার্গকে যাঁরা জানেন, তাঁদের মতে তিনি ভারতে এসে নিজের জীবনকেও পাল্টে দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি হাংরি আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন বলে হাংরি ইশতিহারগুলো সংগ্রহ করে আমেরিকা নিয়ে গিয়ে সংগ্রহশালায় রাখেন এবং তার প্রচার করেন।

বাংলার বাইরে হাংরি আন্দোলন যে একটা যুগান্তকারী পালাবদল স্বরূপ আত্মপ্রকাশ করেছিল তার প্রমাণ মেলে— হিন্দিভাষী রাজকমল চৌধুরী ও তাঁর সহযোগীরা মিলে যখন 'ভূখি পীড়ি' নামে নিজেদেরকে ঘোষণা করেন। 'বাংলাদেশের ছোটগল্প' আলোচনা প্রসঙ্গে ঢাকার আজহার ইসলাম জানিয়েছেন সে সময় 'কণ্ঠস্বর' পত্রিকা গোষ্ঠীকে হাংরি বলা হত। 'পারিজাত' গোষ্ঠী কাঠমাণ্ডুতে নিজেদেরকে হাংরি আন্দোলনকারী বলে ঘোষণা করেন। অর্থাৎ সমস্ত আধিপত্যপ্রণালীর বাইরে দাঁড়িয়ে হাংরি আন্দোলনকারীরা নিজেদের চিন্তাজগৎকে ভূষিমালের দোকানের বাইরে নিয়ে এসেছিলেন বলেই এমন সংগঠিত হতে পেরেছিলেন। তাঁদের কবিতায় আত্মপরিচয়ের ভঙ্গুরতা আন্দোলনকে পালাবদলের ক্ষেত্রে দৃঢ়তর করে তুলেছিল সবচেয়ে বেশিভাবে। হাংরি আন্দোলনকারীদের আনা পালাবদল তাঁদের একটি কবিতা বিশ্লেষণের মাধ্যমে ফুটে ওঠে।

হাংরি আন্দোলনকে ভারতবর্ষের অন্যান্য ভাষায় যাঁরা প্রচার করেন তাঁদের কয়েকজন হলেন— নিখিলেশ্বর, নগ্নমুনি, মহাস্বপ্ন, জ্বালামুখি (তেলেগু), অশোক সাহানে, দিলীপ চিত্রে, রঘু দণ্ডবতে, অরুণ কোলাটকর (মারাঠি), ফণীশ্বরনাথ রেনু, আলোক ধনওয়া, কাঞ্চন কুমার ধুমিল (হিন্দি), আমিক হানফি, নসীম আজিমাবাদী (উর্দু) প্রমুখ। হাংরি আন্দোলন কলকাতা ছাড়িয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে একটা জায়গা করে ফেলতে শুরু করে। তারপর সেই আন্দোলন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচার লাভ করে। বিদেশে যাঁরা হাংরি আন্দোলনকে প্রচার মুখী করে তুলেন তাঁদের প্রধান হলেন— বিটনিক কবি অ্যালেন গিন্সবার্গ এবং তাঁর বন্ধু পিটার অরলভস্কি। কিন্তু পিটারের সঙ্গে হাংরি আন্দোলনকারী করাও সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি।

হাংরি আন্দোলনের সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা স্বরূপ— মলয় রায়চৌধুরীর সঙ্গে অ্যালেন গিন্সবার্গের পরিচয়। গিন্সবার্গ ভারতবর্ষে এসেছিলেন ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে এবং জুলাই মাস থেকে কলকাতায় একটা হোটেলে আশ্রয় নিয়ে দীর্ঘদিন এখানে কাটিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য— ভারতীয় জীবন-যাপনের সঙ্গে নিজেকে খাপখাওয়ানো এবং ভারতীয় সাহিত্য-সংস্কৃতি থেকে মস্তিষ্ক সৌধের বৈধ উপাদান সংগ্রহ। হয়েছিলও তাই। এমন কি ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে গিন্সবার্গ ধর্মান্তরিত হয়ে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করলেন। বেনারস থেকে কাঠমাণ্ডু যাবার

পথে অনেক দেশি-বিদেশি পর্যটক দরিয়াপুরে মলয় রায়চৌধুরীর বাড়িকে হলটিং স্টেশন হিসেবে ব্যবহার করতেন। সাদা চামড়ার মানুষ অ্যালেন ভারতের পথে দিন-রাত ঘুরে বেড়ানোর ফলে অনেকটা ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিলেন। ভারতের তীর্থস্থানগুলো পরিদর্শন করে এবং সাধুসন্তদের সঙ্গে জীবন কাটিয়ে প্রায় ভারতীয় আদর্শে নিজেকে যথাসম্ভব উপভোগ করতে চেষ্টা করলেন। তাই দেখা যায়, মন্দিরে গেলে কপালে সিঁদুরের ফোঁটা লাগিয়ে ভারতীয় পোশাক-পরে নিজেকে ভারতীয় ঘোষণা করতে ভালোবাসতেন।

হাংরি আন্দোলনে গিন্সবার্গের ভূমিকা অনেক। হাংরি আন্দোলনকে সমর্থন এবং এই আন্দোলন মজবুত করতে তাঁর উৎসাহ ছিল প্রবল। শুধু তাই নয়, যখন হাংরিদের বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা চলছিল তখনও তিনি আমেরিকা বসে ভারতীয় পার্লিয়ামেণ্টে তুফান ছুটিয়েছিলেন। হাংরি আন্দোলনকে বিশ্বব্যাপী প্রচারের পেছনে অ্যালেন গিন্সবার্গের অবদান প্রচুর।

মলয় রায়চৌধুরীর সঙ্গে পরিচয় হবার আগে গিন্সবার্গের পরিচয় হয় সমীর রায়চৌধুরীর সঙ্গে জামসেদপুরে কমল চক্রবর্তী আয়োজিত এক কাব্যপাঠের আসরে। পরে সমীর রায়চৌধুরীর বাড়িতে গেলে মলয় রায়চৌধুরী এবং তাঁর হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে অবগত হন গিন্সবার্গ। হাংরি আন্দোলনের ভিত এবং দর্শন যে অসওয়ালড স্পেংলারের গ্রন্থ 'দি ডিক্লাইন অব দি ওয়েস্ট' থেকে চয়িত হয়েছে সে কথা জানতে পেরে মলয় রায়চৌধুরী এবং তাঁর হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে গিন্সবার্গের কৌতূহল আরও বেড়ে যায়। তাই একদিন দরিয়াপুরে মলয় রায়চৌধুরীর বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন গিন্সবার্গ। তিনি এসে জিজ্ঞেস করেন— 'মলয় ঘর মে হ্যায় ?' তখন মলয় রায়চৌধুরীর বাবা গিন্সবার্গকে ভারতীয় মনে করেন। কারণ— তাঁর কপালে ছিল সিঁদুরের ফোঁটা আর কাঁধে ছিল বিহারিদের মতো ঝুলানো লাল গামছা।

মলয় রায়চৌধুরীরা ভারতীয় মানুষ, খাটা পায়খানায় মল-ত্যাগ করার অভ্যাস। প্রায় সময় হিপি-হিপিনীরা তাঁদের বাড়িতে এসে থাকত বলে, তাদের সুবিধের জন্য একটি বেতের চেয়ারের মাঝের অংশ কেটে খাটা-পায়খানায় বসিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু গিন্সবার্গের তা প্রয়োজন হত না, তিনি ভারতীয়দের মতো বসে সে কাজ সারতে পারতেন। গিন্সবার্গ প্রথম যেদিন মলয় রায়চৌধুরীদের বাড়িতে এলেন তখন স্নান করতে যাবার আগে নিজের ঝোলা থেকে বের করলেন— লাল গামছা, মার্গো সাবান, ডাবরের লাল দাঁত-মাজন এবং শিশি ভর্তি ভৃঙ্গরাজ তেল। স্নান সারার পর চৈতন্যদেবের কাঠের মূর্তি বের করে ধ্যান করতে বসে পড়তেন। মূর্তিটি যে অনেকদিন থেকে ব্যবহৃত হচ্ছে তা বোঝা গিয়েছিল মূর্তিটির উঠে যাওয়া রঙ থেকে। তারপর দেখা যায়, গিন্সবার্গ সাধু-সন্তদের থেকে সম্পদ স্বরূপ আরোহিত করা কিছু মন্ত্র উচ্চারণ করছেন। যে মন্ত্রগুলো লোক দেখান মন্ত্র নয়। তার কারণ, বাড়িতে কারো যাতে কোনো অসুবিধা না হয় তারজন্য সবার ঘুম থেকে ওঠার আগেই তাঁর মন্ত্র-জপা শেষ হয়ে যেত। তিনি যে মন্ত্র উচ্চারণ করতেন সেগুলো হল— 'হরি ওম হরি ওম', 'জয় জয় কৃষ্ণ জয় জয় রাম', 'ওম মণিপদ্মে ওম', 'ওম হরি নমঃ শিবায়', 'ওম শ্রী মৈত্রেয়', 'হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে'। মন্ত্রগুলো তিনি সুর করে জপতেন। যা একজন ভারতীয়ের পক্ষে সম্ভব তাই তিনি করতেন। তা যে লোক দেখান হয়, তার প্রমাণ— শেষ পর্যন্ত ধর্মান্তরিত হওয়া।

গিন্সবার্গ কাকভোরে আসিফ মিঞার রিক্সায় চড়ে গঙ্গা স্নান করতে আসতেন। এই রিক্সাটা গিন্সবার্গ ভাড়া করে রেখেছিলেন। প্রায়ই সময় করে পাটনায় অলি-গলি ঘুরে বেড়াতেন। সঙ্গে থাকতেন মলয় রায়চৌধুরী। দুজনের মধ্যে আলোচনা হত ভারতীয় সংস্কৃতি, ধর্ম, সাহিত্য এবং হাংরি আন্দোলন নিয়ে। গিন্সবার্গ শেষ পর্যন্ত হাংরি আদর্শে অনেকটাই প্রভাবিত হয়ে যান। বাংলা না বুঝলেও হাংরি বুলেটিন (ইংরেজি-বাংলা) প্রায় সবগুলোই সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছিলেন। মলয় রায়চৌধুরীর সঙ্গে হৃদ্যতার ভাব গাঢ় হওয়ার ফলে আন্দোলনের প্রতি তাঁর সমর্থন আকাশ-ছোঁয়া।

উদার প্রকৃতির এই আমেরিকান মানুষটি দেশে ফিরে হাংরিদের নিয়ে লিখতে আরম্ভ করলেন। হাংরি বুলেটিনের সংকলন প্রকাশ করেন। আমেরিকায় হাংরি আন্দোলনকারীদের ফটো, ছবি-আঁকা, রচনার অনুবাদ ইত্যাদি নিয়ে 'সল্টেড ফেদার্স' পত্রিকাগোষ্ঠী বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করল। পরে যখন হাংরি আন্দোলনকে অপরাধমূলক আখ্যা দেওয়া হয়— তখন আমেরিকা থেকে ট্রেস, ইনট্রেপিড, সিটিলাইটস জার্নাল, সানফ্রানসিসকো, আর্থকোয়েক, র‍্যামপার্টস, ইমেজো হোয়্যার প্রভৃতি পত্রিকায় হাংরি আন্দোলনকারীদের লেখা, ছবি, আন্দোলনকে সমর্থন করে প্রবন্ধ, সংকলন ইত্যাদি প্রকাশিত হয়।

গিন্সবার্গ আমেরিকা প্রস্থান করলেও হাংরি আন্দোলনের খবর তিনি রাখতেন। অনেক প্রথিতযশা বাঙালি সাহিত্যিক এবং ভারতের অন্যান্য যশস্বী সাহিত্য প্রেমীদের চিঠি মারফত হাংরি আন্দোলনের চিৎকার তাঁর কানে পৌঁছত। মলয় রায়চৌধুরী এবং সমীর রায়চৌধুরীর সঙ্গে পত্রালাপ থাকায় তিনি হাংরি আন্দোলনের মজা অনুভব করতেন। হাংরি আন্দোলনকে সমর্থন করার পেছনে মূল কারণ— এই আন্দোলনের মধ্যে একটা জোর ছিল, মৌলিকতা ছিল, সাহিত্যে বাঁকবদলের রহস্যময় মন্ত্র ছিল, নান্দনিক সাহিত্যের কপালে গুলি করার অস্ত্র ছিল, এসট্যাবলিশমেন্টের মাথায় আগুন ধরিয়ে দেবার বারুদ ছিল ইত্যাদি। হাংরি আন্দোলন ভারতের বিভিন্ন সাহিত্যের ঘরানায় সম্মান অর্জন করেছিল। উলু-শঙ্খ বাজিয়ে স্বাগত জানিয়েছিল।

হাংরি আন্দোলন যখন চরমে তখন বিশ্বব্যাপী এঁদের পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে হাংরি আন্দোলনের সাড়া মিলতে থাকে। নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরি এবং ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এঁদের বুলেটিনের ফটোস্টেট কপি সংরক্ষিত হয়। লণ্ডনের এক বিখ্যাত প্রকাশক এঁদের কবিতার একটি পেপারব্যাক সংকলন বার করবেন বলে স্থির করেছেন। সানফ্রানসিসকোর 'সিটিলাইট জার্নাল' এঁদের কবিতা সম্পর্কিত ম্যানিফেস্টো ছেপেছে। মেক্সিকোর 'এলবর্ণ এমপ্লুয়াডো' স্প্যানিস ভাষা-ভাষীদের সমক্ষে এঁদের আন্দোলন সম্পর্কিত নানা ব্যাপার তুলে ধরে। জার্মান থেকে কার্ল ওয়েজনারের সম্পাদনায় 'ক্ল্যাকটোভিডসেডস্টিন' পত্রিকা বিশেষ হাংরি আন্দোলন সংখ্যা প্রকাশ করে। আমেরিকার লিটা হরকিনের সম্পাদনায় 'কুলচুর' পত্রিকায় ছাপা হল হাংরি আন্দোলনে প্রকাশিত ইংরেজি মেনিফেস্টোগুলো। হাংরি আন্দোলনের সমর্থনে প্রকাশিত হয় আমেরিকার নিউইয়র্কের 'এভারগ্রিন রিভিউ' আর্জেনটিনার 'এল কর্নো এমপ্লুমাদো' মেকসিকোর 'এল রেহিলে' ইত্যাদি পত্রিকায়। বিদেশে প্রথম হাংরি সংকলন

প্রকাশিত হয় প্রফেসর হাওয়ার্ড ম্যাককর্ডের সম্পাদনায় অক্সফোর্ড যুনিভারসিটি থেকে। তাছাড়া বিট আন্দোলনের কবি লরেন্স ফেরলিংঘেট্টি তাঁর পত্রিকায় মলয় রায়চৌধুরীর 'স্টার্ক ইলেকট্রিক জিসাস' (প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার) প্রকাশ করেছিলেন। 'দি হাংরিয়ালিস্ট ম্যানিফেস্টো অন পেইনটিং' নামে হাংরি আন্দোলনের ৪৮ নম্বর ইশতিহারটি প্রকাশ করেন অনিল করঞ্জাই আর করুণানিধান মুখোপাধ্যায়। যে ম্যানিফেস্টো গিন্সবার্গ আমেরিকা নিয়ে যান এবং এখনও 'অ্যালেন গিন্সবার্গ ট্রাস্টে' রক্ষিত আছে। এই সূত্র ধরে ২০০৫ এর জানুয়ারি মাসে গিন্সবার্গ গবেষক বব রোজেনথাল এবং বিট আন্দোলনের গবেষক বিল মর্গান ভারতবর্ষে আসেন। এর মূল কারণ— অনিল করঞ্জাই এবং করুণানিধান মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে গিন্সবার্গের সম্পর্কসূত্র আবিষ্কার করা। বিদেশ থেকে হাংরি আন্দোলনকারীদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন— গ্যারি স্নাইডার এবং ওকতাভিও পাস। এতে প্রমাণ করে, হাংরি আন্দোলন বিশ্বব্যাপী প্রচার লাভ করেছিল।

ডিক বাকেন যখন তাঁর 'সল্টেড ফেদার্স' পত্রিকায় হাংরি আন্দোলন নিয়ে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে উৎসাহী তখন জ্যোতির্ময় দত্ত তাঁকে একটি চিঠি লেখেন এবং ডিক তাঁর ওই বিশেষ সংখ্যায় ছাপিয়ে দেন। চিঠিটির সংক্ষেপ (তারিখ ঃ ডিসেম্বর ১২, ১৯৬৬) আমরা দেখে নিতে পারি ঃ

"My Dear Mr. Bakken,

... I am still be wildered why should anyone in Portland. Oregon, be interested in publishing a special issue on the 'Hungry Generation'. Is there not enough local talent in Oregon to fill up the pages of 'Salted Feathers', which you describe as a small magazine ? Or is it due to an interest in the out-of-the-way, the quaint, the fantastic ? It is like someone in Bhopal, Madhya Pradesh, bringing out a special number on the 'Trotskyte poets' revolutionary American poetry by bringing out the 'Penny Paper of Iowa City'. Hungry for the public relation work and promotion by Allen Guinsberg, TIME magazine, and the silly magistrate who convicted Maly.

Very Sincerely Yours
Jyotirmoy Dutta"[8]

জ্যাতির্ময় দত্ত সহ কলকাতার অনেকে অনুমান করতে পারেননি যে, হাংরি আন্দোলনকে কাছ থেকে অনুভব করার পর গিন্সবার্গের লেখার ধরনটা পাল্টে যাবে। ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের গলি গলি ঘুরে তীর্থক্ষেত্র সমীক্ষা করে গিন্সবার্গের জীবনটাই পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। মলয় রায়চৌধুরী লিখছেন— "...গিন্সবার্গ আমাদের উদ্বুদ্ধ করেননি, বরং উলটো, আমরাই 'হাউল' আর 'ক্যাডিশ' রচয়িতাকে আগাপাশতলা এমন পালটে দিয়েছিলুম, যে তাঁর কবিতার আদল ও আদরা এবং জীবন সম্পর্কে ধ্যান-ধারণা পালটে গিয়েছিল। 'আমরা' অর্থে কেবল হাংরি আন্দোলনকারীরা নয়, আমি ভারতীয় সনাতন জীবনবোধের কথা বলছি। ফিরে গিয়ে গিন্সবার্গের

পক্ষে আর 'হাউল' এবং 'ক্যাডিশ'-এর আদল ও আদরায় কবিতা লেখা সম্ভব হয়নি। যদিও ভারতবর্ষে এসে তিনি যে ওই শৈলীতে লেখার চেষ্টা করেছিলেন, তা তাঁর 'ইণ্ডিয়ান জার্নালস' গ্রন্থের (১৯৭০ সালে সিটি লাইট বুকস প্রকাশিত) ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৭৬, এবং ১৭৭ পৃষ্ঠার পঙক্তিগুলো থেকে বোঝা যায়, যে গুলোয় 'হাউল' আর 'ক্যাডিশ'-এর মার্কিন শ্বাস-প্রশ্বাস আক্রান্ত হয়ে গেছে ভারতীয়তায়।"[৫]

হাংরি আন্দোলন বহু চর্চিত। হাংরি আন্দোলনকারী ছাড়াও অন্যরা যে তাঁদেরকে নিয়ে দেশে এবং বিদেশে পরিচিতজনদেরকে সংবাদ সরবরাহ করেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল জ্যোতির্ময় দত্তের চিঠি থেকে। তাছাড়া ১৯৬১ খিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে প্রথম ইংরেজি ইশতিহারটি খানিকটা পরিবর্তনের মাধ্যমে যখন আবার আত্মপ্রকাশ করে তখন বুদ্ধদেব বসু এবং জ্যোতর্ময় দত্ত ডিনারে নিমন্ত্রণ জানান গ্যারি স্নাইভার ও তাঁর স্ত্রী জোয়ানি কাইজারকে। সেদিন তাঁরা যে কথাবার্তা করেছিলেন সে সম্পর্কে গ্যারি স্নাইভার (তারিখ : ১. ২. ১৯৬৭) ডিক বাকেনকে চিঠি মারফত জানান :

"Dear Dic Bakken,

Joanne (not Jeanne) Kyger– my then wife– and met Buddhadeva Bhose & Jyotirmoy Dutta in Calcutta– had a nice evening but little communication– also met a few younger poets there– who showed more wildness and openness. This was December 1961. We never returned to Calcutta– later Allen did live there and devlop those boys– he is the one (actually) responsible for turning them on."[৬]

হাংরি আন্দোলন চরমে পৌঁছার ফলে মামলা-মকদ্দমা হয়। নানা নালিশ এবং দেশে-বিদেশে চিঠিপত্র আদান-প্রদান চলে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে হাংরি আন্দোলনের ওপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। টিকিট করে হাংরি কবিতা শুনতে ভিড় জমে আমেরিকায় কবিতা পাঠের আসরে। দেখাযায় গিন্সবার্গ মলয় রায়চৌধুরীর সঙ্গে কয়েক মাস অতিবাহিত করলেও হাংরি শরিকদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পোষণ করতে পারেন নি। তাঁর মনে হয়েছিল হাংরি আন্দোলন 'ফ্যাকচার্ড'। সকল স্তরের এবং সকল ভিন্ন চিন্তার কবিকে একই পর্যায়ভুক্ত করে নিয়েছিলেন বলেই গিন্সবার্গের এমন মনে হয়েছিল। মলয় রায়চৌধুরীর বিরুদ্ধে কোর্টে যখন মামলা চলছিল তখন নিউইয়র্ক থেকে গিন্সবার্গ ১১ জানুয়ারি ১৯৯৫ তে একটি চিঠি লেখেন, তাতে তিনি বলেছেন :

"Dear Malay,

Enclosed copies of letter from KULCHUR, from Abu Sayeed Ayub (3 letters in answer to mine– each letter 2 pages) and one from A. B. Shah, 'Congress' in Bombay. You should follow their letter up. 'Congress' office in Paris has been contacted and they will probably send some note, notice to the Indian Committee.

পক্ষে আর 'হাউল' এবং 'ক্যাডিশ'-এর আদল ও আদরায় কবিতা লেখা সম্ভব হয়নি। যদিও ভারতবর্ষে এসে তিনি যে ওই শৈলীতে লেখার চেষ্টা করেছিলেন, তা তাঁর 'ইণ্ডিয়ান জার্নালস' গ্রন্থের (১৯৭০ সালে সিটি লাইট বুকস প্রকাশিত) ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৭৬, এবং ১৭৭ পৃষ্ঠার পঙক্তিগুলো থেকে বোঝা যায়, যে গুলোয় 'হাউল' আর 'ক্যাডিশ'-এর মার্কিন শ্বাস-প্রশ্বাস আক্রান্ত হয়ে গেছে ভারতীয়তায়।"[৫]

হাংরি আন্দোলন বহু চর্চিত। হাংরি আন্দোলনকারী ছাড়াও অন্যরা যে তাঁদেরকে নিয়ে দেশে এবং বিদেশে পরিচিতজনদেরকে সংবাদ সরবরাহ করেন তার প্রমাণ পাওয়া গেল জ্যোতির্ময় দত্তের চিঠি থেকে। তাছাড়া ১৯৬১ খিস্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে প্রথম ইংরেজি ইশতিহারটি খানিকটা পরিবর্তনের মাধ্যমে যখন আবার আত্মপ্রকাশ করে তখন বুদ্ধদেব বসু এবং জ্যোতর্ময় দত্ত ডিনারে নিমন্ত্রণ জানান গ্যারি স্নাইভার ও তাঁর স্ত্রী জোয়ানি কাইজারকে। সেদিন তাঁরা যে কথাবার্তা করেছিলেন সে সম্পর্কে গ্যারি স্নাইভার (তারিখ ঃ ১. ২. ১৯৬৭) ডিক বাকেনকে চিঠি মারফত জানান ঃ

"Dear Dic Bakken,

Joanne (not Jeanne) Kyger– my then wife– and met Buddhadeva Bhose & Jyotirmoy Dutta in Calcutta– had a nice evening but little communication– also met a few younger poets there– who showed more wildness and openness. This was December 1961. We never returned to Calcutta– later Allen did live there and devlop those boys– he is the one (actually) responsible for turning them on."[৬]

হাংরি আন্দোলন চরমে পৌঁছার ফলে মামলা-মকদ্দমা হয়। নানা নালিশ এবং দেশে-বিদেশে চিঠিপত্র আদান-প্রদান চলে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে হাংরি আন্দোলনের ওপর আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। টিকিট করে হাংরি কবিতা শুনতে ভিড় জমে আমেরিকায় কবিতা পাঠের আসরে। দেখাযায় গিন্সবার্গ মলয় রায়চৌধুরীর সঙ্গে কয়েক মাস অতিবাহিত করলেও হাংরি শরিকদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা পোষণ করতে পারেন নি। তাঁর মনে হয়েছিল হাংরি আন্দোলন 'ফ্যাকচার্ড'। সকল স্তরের এবং সকল ভিন্ন চিন্তার কবিকে একই পর্যায়ভুক্ত করে নিয়েছিলেন বলেই গিন্সবার্গের এমন মনে হয়েছিল। মলয় রায়চৌধুরীর বিরুদ্ধে কোর্টে যখন মামলা চলছিল তখন নিউইয়র্ক থেকে গিন্সবার্গ ১১ জানুয়ারি ১৯৯৫ তে একটি চিঠি লেখেন, তাতে তিনি বলেছেন ঃ

"Dear Malay,

Enclosed copies of letter from KULCHUR, from Abu Sayeed Ayub (3 letters in answer to mine– each letter 2 pages) and one from A. B. Shah, 'Congress' in Bombay. You should follow their letter up. 'Congress' office in Paris has been contacted and they will probably send some note, notice to the Indian Committee.

I answered some of your letters via Utpal– I sent copies of these letters, also to show Sunil, Jyoti etc.

'City Lights Journals 2' is on its way to you.

That Jyoti, Sunil, Sandeepan & yourself are all working at slight cross-purposes, is making things difficult. I suppose they are embarrassed by your 'brashness' (as TIME magazine might term it) or your slight edge of naievette as I would term it. However, If it is possible to reconcile with them & put up a united front it would be best for everbody's safety. Best thing is to stop all cutty gossip for it is only mainly gossip that Abu Sayeed is using as an excuse. Obviously they also were questioned by the Police, and so, feel a common threat with you. Don't get angry at them– just work out a basis where you can all defend each other– and try you now– the only present basis (since there seems to be some literary disagreement) bring freedom of literary expression.

They all don't want to be grouped as 'Hungry' exclusively, apparently, and they may resent or be sacred or not want you to lump them all under your 'Hungry' banner. And this is natural. Once a 'movement' gets name and publicity, it is also a drawback as I've found. Also, the name is irrelevant & a Drag sometimes to one's individuality. See the first sentence of my letter to Shakti, Feb 10, 1963 that was published in a 'Hungry' type mazzine in Bengali.

Best not get angry at anyone– Jyoti, Abu Sayeed– even the polices. Think carefully possible. I leave for Cube in a week and will be back in 2 months.

Love & Happy New Year
Allen"[৭]

চিঠিটি পেয়ে মলয় রায়চৌধুরী রাগান্বিত হয়ে উঠলেন। যাঁদের জন্য হাংরি আন্দোলন ভেঙে গেল এবং যারা ষড়যন্ত্র করে মলয় রায়চৌধুরীকে জেলে পাঠিয়েছিলেন, তাঁদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়ার পরামর্শ দিলেন গিন্সবার্গ। গিন্সবার্গকে মলয় রায়চৌধুরীর বিরুদ্ধ শক্তিরা নানা মুখরোচক গল্প বলে চিঠি লিখেছিলেন। তাই তিনি মলয় রায়চৌধুরীকে জোট বেঁধে লড়ার পরামর্শ দেন। 'সল্টেড ফেদার্স' পত্রিকায় প্রকাশিত ডিক বাকেনকে লেখা গিন্সবার্গের চিঠি তাই প্রমাই করে।

"New York
December 28, 1966

Dear Mr. Bakken,

I already wrote sometime ago everything I knew about Bengali poetry in 'City Light Journal 2', and did all I could to circulate writings by Calcutta poets as well as Malay Roychoudhury's manifestoes in the US. Later writings by Malay Roychoudhury such as 'Stark Electric Jesus' seem to me to sustain his lively spirit as a poet, and even in his own translations read well in English. Remarkably well. One thing he has to contend with is the 'distain of establishment literatures' & some of his fellow poets who claim that his verse in India tongue stinks. I have no way of judging that, except that he translated it into Americanes which reades more electrically then the compositions of his superiorminded critics.

Allen Ginsberg"[৮]

লরেন্স ফেরলিংঘেট্টি মলয় রায়চৌধুরীর 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' -এর ইংরেজি অনুবাদ 'স্টার্ক ইলেকট্রিক জিসাস' তাঁর 'সিটি লাইট' পত্রিকায় প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে মলয় রায়চৌধুরীর এই কবিতাটিই বিশ্ব কবিতা সংকলনে স্থান পায়। ফেরলিংঘেট্টি তাঁর চিঠিতে লিখেছেন ঃ

"City Lights, SF. California
March 26, 1966

Dear Malay

I have received the legal decision on your case, and thank you very much for sending it. I find it laughable. I want to publish it together with your poem. 'Stark Electric Jesus' in the next 'City Light Journal' which will be out this coming summer, and I enclose a small payment immediately, since I know you must need it desperately. I am sending a copy of this letter to Howard McCord. Perhaps he knows the answers to the following questions and will send them to me right away, since time is of the essence, and it may take some time to get a reply from you. I think it is a wonderful poem, and I will certainly cradit McCord for having first published it, Bravo.

Allen is in NY and his new address is 408 East, 10 street (Apt 4c). New York, NY.

I need to know the answers to the following question : (1) was the poem first written in Bengali and was it the Bengali or the English version which was seized and prosecuted ? (2) Is this your own translation, or whose is it ? (3) Do you wish me to use the typewritter copy of the poem which you sent me last year, or the version printed by McCord ? (I find some differences).

Let me hear as soon as you can. Holding the press. And good luck, I hope you are still able to survive. With love.

Lawrence Ferlinghetti"[৯]

হাংরি আন্দোলনকারীদের প্রভাব ডিক বাকেন, লরেন্স ফেরলিংঘেট্টি, 'কুলচুর' পত্রিকার সম্পাদিকা লিটা হরনিক প্রমুখকে প্রভাবিত করেছিল এবং তাঁরা এই আন্দোলনের বিষয়বস্তু চারদিকে জানিয়ে দেন। তাছাড়া গিন্সবার্গ হাংরি আন্দোলনের অনেকগুলো পত্রিকা সংগ্রহ করে রেখেছিলেন নিউজার্সিয়ার বেসমেন্টে। তবে সেগুলোর বেশিরভাগই ছিল হাংরি আন্দোলনের বিশেষ সংখ্যা। যেমন "অ্যালেন ডি লোচ সম্পাদিত 'ইনট্রেপিড' যার প্রচ্ছদে 'অ্যানফ্রাকচার্ড' হাংরি আন্দোলনকারীদের ফোটো ছিল, কার্ল ওয়েসনার সম্পাদিত 'ক্ল্যাকটোভিডসেডস্টিন', মার্গারেট র‍্যানডাল সম্পাদিত 'এল কর্নো এমপ্লুমাদো', এরিক মটর‍্যামের 'ম্যাগাজিন'। আনসেল্ম হলো হাওয়ার্ড ম্যাককর্ড, আমিরি বারাকা, ক্যারল বার্জ, ডেইজি অ্যালডান প্রমুখের পত্রিকা। তাছাড়া 'স্যান ফ্রানসিসকো' 'আর্থকোয়েক', 'এভারগ্রিন রিভিউ', 'বার্নিং ওয়াটার', 'ইণ্টারগ্যালাকটিক' ইত্যাদি পত্রিকা। কবিদের কাগজপত্রের যে-সব সংগ্রহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কিনেছে, তাদের ওয়েবসাইটে এইসব তথ্য পাওয়া যাবে। আমাদের প্রভাব এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে ১৯৭৪ সনে ভারতীয় অধ্যাপক অরবিন্দকৃষ্ণ মেহরোত্রা ইলিনোয়াতে পড়াতে গিয়ে সেখানকার নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি 'হাংরি জেনারেশন আর্কাইভ' প্রতিষ্ঠা করেছেন।"[১০]

হাংরি আন্দোলন যে বহুলভাবে প্রচারিত হয়েছিল তার প্রমাণ ইতিপূর্বে আমরা উপলব্ধি করেছি। তবুও হাংরি আন্দোলনকে নিয়ে লেখা কয়েকটি প্রবন্ধের তালিকা আমাদেরকে আরও সঠিকভাবে বিশ্বাসের ভূমিকায় উপনিত করবে ঃ

১। 'The Hungry Generation', TIME , 20 November 1964, U.S.A.
২। Subhas Ch. Sarkar, 'A Misdirected Endeavour', SEARCHLIGHT, 11 Jume 1967, Patna.
৩। Subimal Basak 'Calcutta & Calcutta', ZERO, 19 February 1967, New Delhi.
৪। 'Hungry Issue', Ed. Lu Altman & Dick Bakken', SALTED FEATHER'S, 1967, Portland, Oregon.
৫। Karl Zink, 'Hungry', MAHFIL, 1967, Illinois.

৬। 'The Hungry Generation Poets' BLITZ, 17 February 1968, Bombay.
৭। 'The Hungry-alists' LINK, 23 June 1968, Delhi.
৮। 'The Hungry-alists' LINK, 7 Jully 1968, Delhi.
৯। 'Hungry Poets get mixed reception' THE STATESMAN, 15 April 1968, Calcutta.
১০। 'Indian Artist & Writers in City', THE RISING NEPAL, Kathmandu, Nepal.
১১। Rajeev Saxena, 'Poetry of Alienation' LINK 1-June 1968, Delhi.
১২। 'Ratnashree Reception', THE RISING NEPAL, 18 April 1968, Kathmandu, Nepal.
১৩। 'Poets Pub.' THE STATESMAN, 26 February 1968, Calcutta.
১৪। 'Special Hungry Issue' INTREPID, Ed. Alien De Loach, 1969, Buffalo, New Yourk, U.S.A.

হাংরি আন্দোলনকে নিয়ে হাজারেরও বেশি প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। এখনও বিদেশ থেকে লোক এসে হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে জানতে চান ; হাংরি আন্দোলনকারীদের তাঁরা খুঁজে বড়ান। বিল মর্গান এবং বব রোজেনথাল ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের ৬ জানুয়ারি আমেরিকা থেকে ভারতবর্ষে আসেন হাংরি আন্দোলনকারীদের সম্পর্কে জানতে। জুলাই ২০০৫-এ ভারতবর্ষে এসিছিলেন শ্রীমতী ডেবরা বেকার। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল গিন্সবার্গ, পিটার অরলভস্কি, গ্যারি স্নাইডার প্রমুখের সঙ্গে হাংরি আন্দোলনকারীদের সম্পর্ক খুঁজে দেখা। ইতিমধ্যে গিন্সবার্গ মারা যান তাই বিদেশ থেকে অনেকে জানতে চান হাংরি আন্দোলনকারীরা বেঁচে আছেন কি না।

হাংরি আন্দোলন নিয়ে যখন কোর্টে মামলা চলছিল তখন আমেরিকার 'টাইম' পত্রিকা ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ২০ নভেম্বর তারিখ 'ইণ্ডিয়া' শিরোনামে হাংরি আন্দোলনকারীদের ফটো-সহ খবর প্রকাশ করে। সে খবর ছিল হাংরি আন্দোলনকারীদের পক্ষে। কিন্তু কলকাতার বিভিন্ন পত্রিকায় হাংরি আন্দোলনকারীদেরকে নানা কুৎসা করে সংবাদ চাউর হয়। 'টাইম' পত্রিকার সংবাদ দেখে কলকাতার দাদা স্থানীয় লেখক গোষ্ঠীর অনেকের মনে দুঃখ লাগে এই কারণে যে, তাঁদের ষড়যন্ত্র বৃথায় যেতে বসেছে দেখে। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে হাংরি আন্দোলনকারীদেরকে অ্যারেস্ট করার খবর সংবাদের শিরোনাম হয়ে ওঠে। গিন্সবার্গ আমেরিকায় বসে ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা শ্রীমতী পুপুল জয়াকরকে চিঠি লিখে জানান যে, মলয় রায়চৌধুরীর ব্যাপারটা ভালো ভাবে দেখতে। পুপুল জয়াকর ছিলেন ইন্দিরা গান্ধীর বন্ধু। তাই মন্ত্রী, আমলা আর কলকাতা পুলিশের টনক নড়ে যায়। সংবাদটি অস্বাদন করা যাক ঃ

" The Hungry Generation

A thousand years ago, India was the land of Vatsyayana's Kama Sutra, the classic volume that so thoroughly detailed the art of love that its translators still usually leave several key words in Sanskrit. Last week, in a land that has become so straitly laced that its movie heroines must burst into

song rather than be kissed five scruffy young poets were hauled into Calcutta's Bankshall Court for publishing works that would have melted even Vatsyayana's pen. The Hungry Generation had arrived.

Born in 1962, with an inspiritional assist from visiting U. S. Beatnik Allen Ginsberg, Calcutta's Hungry Generation is Growing band of young Bengalis with tigers in their tanks. Somewhat unoriginally they insist that only in immediate physical pleasure do they find any meaning life, and they blame modern society for their emptiness. On cheaphy printed paper, they pour forth a torrent of starkly explicit erotic writings, most of them based on their own exploits ('In The Tajmahal with My Sister') or on dreams. My theme is me', says Hungry Poet Saileswar Ghose, a school teacher. 'I say what I feel. I feel frustration, hungry for love, hunger for food.'

Three Widows : To all appearances, their appetites are unlimited. In a short story Bank Clerk Malay Roy Choudhury, 25, tells of a starving poet who first devours his fiancee, then his poetry notebook, then a building and Calcutta's huge Howrah Bridge. A poem by school-teacher Ghose crows that 'I impregnated three widows at a time, and now I am lying in bed happy. What next ?'

Absurd them seem the hungries see themselves as the spokesmen of a betrayed miserable people. 'Our frustration is not just personal', says a 28-year old gealogy lecturer. 'It comes from the strains, the proverty', the squalor of our society. And in a series of violent manifestoes, the hungries singled out their enemies, including hypocrites, conventional writers and politicians whose place in society lies 'somewhere between the dead body of a harlot and a denkey's tail.' To 'let loose a creative furore', the hungries last summer sent everyleading Calcutta citizen– from police commissionar to wealthy spinsters– engraved four-letter-worded invitations for a topless bathing suit contest.

Done for world : With that, the entire Calcutta establishment rose up in rage. Newspaper editorials, quoting passages from their works proved conclusively that they were dangerous and dirty– so much so that Calcuttas reading public began to look for them. Under civic pressure, the police hauled away 6 of the poets for questioning. Five were suspended from their jobs and booked on charges of obscene writing and conspiracy against society.

The evidence got in last week's trial was irrefutable, but meanwhile the Indian government had been approached by sympathetic intellectuals at home and abroad. Looking for a face saving exit, the Calcutta prosecutor temporised, requested a postponement in court. To celebrate their temporary freedom, the hungering beats raided an art gallery, beat up three painters, then walked happily away to resume their pursuit of the Hungry Generation's declared goal– 'to undo the done-for world and start afresh from chaos.'"[১১]

মার্কিন সংবাদিকরা যে কোনো সংবাদকে একটু রসিয়ে লেখার চেষ্টা করেন, যাতে পাঠক একটি সংবাদের প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হয়। সংবাদটি লিখেছিলেন 'টাইম' পত্রিকার ভারতস্থিত সাংবাদিক লুই ক্রার। 'স্টেটসম্যান' পত্রিকার সাংবাদিক প্রশান্ত সরকার থেকে খবর পেয়ে লুই ক্রার 'দি হাংরি জেনারেশন' সংবাদটি লেখেন। খবরটা পড়ার পর আমলা এবং পুলিশকর্তাদের কম্পন ছুটে যায়। মলয় রায়চৌধুরীর বাবাকে ডেকে পাঠানো হয় স্বরাষ্ট্র দফতরে। আবারও চেষ্টা চলে মলয় এবং তাঁর দাদা সমীর রায়চৌধুরীকে বিদেশিদের সঙ্গে সম্পর্কের যোগসাজিসে ফাসানোর। ইনভেসটিগেশনে ইণ্টারভিউ টেপ করা হয়। সে সময়ের পুলিশ কমিশনার মলয় রায়চৌধুরীকে ভয় দেখিয়ে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলেছিলেন— "ঈ কি ! বান্দর ব্র্যাণ্ড বিড়ির বিজ্ঞাপনের মত কাগজে সাহিত্য হচ্ছে ?"[১২]

'টাইম' পত্রিকায় হাংরি আন্দোলনের সংবাদটা প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন পত্রিকায় হাংরি আন্দোলনের সমর্থনে লেখালেখি শুরু হয়। অনেকে নিজে থেকে এগিয়ে এসে হাংরি আন্দোলনকারীদেরকে সাহায্য করেন। বিদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় হাংরি আন্দোলনের সংবাদ মাঝে মাঝেই প্রকাশ হতে থাকে। বিদেশি অনেক দূতাবাস দিল্লিতে বিষয়বস্তুর সত্যাসত্য জানতে চাইলেন। "ওপর মহলে আরম্ভ হয়ে গেল পারস্পরিক দোষারোপ। তার ওপরে কোমরে দড়ি হাতে হাতকড়া বাঁধা হয়েছিল বলে পুলিশ কর্তাদের আরেক বিপাক। ফণীশ্বরনাথ রেণু সেটা নিয়ে বেশ কয়েক জায়গায় লেখার ফলে বাঙালি পুলিশের যাচ্ছেতাই আলোচনা আরম্ভ হয়ে গেল। সে এক কেলেঙ্কারি ! উৎপলকুমার বসু গিন্সবার্গকে কয়েকটা কাগজ থেকে আমাদের হেনস্থার খবর পাঠিয়েছিলেন। তার দিনকতকের মধ্যে গিন্সবার্গের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত চিঠি পেলুম ঃ

"Dear Malay,

I saw clipping from Blitz Sep.19. 1964 P. 6 and also I think calcutta Statesman 17. 9. 64 that you were arrested, as well as Samir and two boys named Ghosh whom I don't know, for your Hungry Generation manifestoes. Are these the same as were printed in the issue of KULCHUR 15 ? As soon as I read about it I racked my brains what I could do to help, and so today wrote a whole bunch of letters to the following :

A. S. Raman, Editor, Illustrated weekly, Dr. Dadabhai Naoroji Road, Bombay.

Sharad Deora, Editor, Gyanodaya, 18 Brabourne Road, Calcutta.

Abu Sayeed Ayub, Editor, Quest (sent message to him indirectly) and Member of Indian Congress for Cultural Freddom.

Shyam Lall, Editor, Times of India, Delhi.

Khushwant Singh, novelist and Member of Congress for Cultural Freedom, 49 East Sujan Singh Road, New Delhi.

I also wrote Jyoti Dutta and phoned Lita Hornick of KULCHUR. I asked them, the Indians above all, what they could do to help you. Suggested that they activate the Congress for Cultural Freedom as this sort of thing is the proper activity of the Congress and Quest magazine and told them that the manifestoes were printed here in City Lights journal and KULCHUR and were not obscene. So the whole mess was scandalous bureaucratic illiteracy. Please if you need literary help or advice do thy to contact these people for support, And in addition perhaps ask for advice/help from Mrs. Pupul Jayakar, 130 Sundar Nagar, New Delhi– she was our 'protectress' in India, we stayed with her, shes a friend of Indira Gandhi and others. I also notified Bonnie Crown here in NY, the Asia Society, 112 E 64 Street, NYC– she commissioned poetry to be translated by Sunil and others and that pack of poems plus your rhythms etc. Will be printed together by City Lights. She can send you a letter on her official stationary saying your manifestoes are known published and respected in US and not considered obscene. I will also enquire of Mr. S. K. Roy the Indian consul General here in NY who I don't know what he can do at this distance.

If there's anything you want me to do let me know. Write me and let me know what the situation is and what the cause of the trouble is. Judging from Blitz I suspected jealous ideological Marxists or something. Are you recived at the bank ? I hope not. Regard to your family. Get the Congress for Cultural Freedom to supply you with a good lawyer who'll take no fee. If you Indian Congress does not cooperate let me know, we'll complain to the European

office. Who are the Ghosh brothers ? The manifestoes on prose and politics are pretty funny. I thought the were a little literary-flowery, but they must have hit some mental nail on the head. Good luck.

Jai Ram
Allen Ginsberg."[১৩]

হাংরি আন্দোলনকারীরা সাহিত্যের কিছু বোঝে না, তাদের লেখা সব আবোল তাবোল, এঁরা বজ্জাত, লুম্পেন, সাহিত্য সংস্কৃতির সঙ্গে এঁদের কোনো সম্পর্ক নেই, এঁরা আউটসাইডার ইত্যাদি বলে একদল হোমড়া-চোমড়া সরকারি এবং বেসরকারি নেতা-পালিনেতা-সাহিত্যিক প্রমুখ প্রচার করে বেড়ালেন। এর কারণ— ইউরোপ এবং আমেরিকা থেকে ভারতীয়, কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রিডমের কর্মকর্তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি হতে থাকে। তাই ভুল ভাবে বোঝাবার চেষ্টা হয়। "তবে ইউরোপের কংগ্রেসের ধাতানি খেয়ে ভারতীয় কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রিডমের একজিকিউটিভ সেকরেটারি এ. বি. শাহ বোম্বাই থেকে কলকাতায় উড়ে এসে বিলিতি সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে দেখা করেছিলেন আমাদের সঙ্গে র‍্যাডিকাল হিউমানিসটের আপিসে। ঠারে ঠারে টের পাইয়ে দিলেন যে তাঁদের সংস্থা অনেক উঁচু দরের কারবার, হাংরিদের খেলো মকদ্দমায় ঢুকে তাঁরা নিজেদের নাম ডোবাতে চান না। বোম্বাই ফিরে গিয়ে তিনি আমাকে একটা চিঠি দিয়ে জানিয়ে ছিলেন যে, পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাঁকে বলেছেন কলকাতার হোমড়া-চোমড়া লোকেদের চাপেই তাঁরা অ্যাকশন নিতে বাধ্য হয়েছেন, অর্থাৎ বঙ্গসংস্কৃতির এসট্যাবলিশমেন্টের প্ররোচনায় হাংরি আন্দোলনকারীদের গ্রেপ্তার কর হয়।"[১৪]

প্রবীণ সাহিত্যিকরা হাংরি আন্দোলনকারীদেরকে সহ্য করতে পারছিলেন না। তাই কলকাতায় বসে যতটা তলানো যায় তা তো করেছিলেনই, এমনকি আমেরিকায় গিন্সবার্গকে হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে নালিশ জানিয়েছেন। তবে 'কৃত্তিবাস' এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক দীপক মজুমদার পুলিশের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে স্বাক্ষর সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন। ভয়ে অনেকেই স্বাক্ষর দিলেও বেশিরভাগ সাহিত্যিক স্বাক্ষর দেননি। তাই দীপক মজুমদারের সৎ উদ্দেশ্য ভেস্তে যায়। তবে স্বাক্ষর অভিযানের আইডিয়াটা গিন্সবার্গের। গণমত পাওয়া গেলে হাংরি আন্দোলনকে বেশিভাবে সাহায্য করা যাবে বলে ভেবে স্বাক্ষর প্রক্রিয়ার সিদ্ধান্ত নেন গিন্সবার্গ। গিন্সবার্গও বুঝেছিলেন হাংরি আন্দোলনকারীদের পক্ষে স্বাক্ষর সংগ্রহ করা যাবে না। এই ব্যাপারে গিন্সবার্গকে লেখা আবু সয়ীদ আইয়ুবের চিঠির ফটোকপি মলয় রায়চৌধুরীকে পাঠিয়েছিলেন গিন্সবার্গ। চিঠিটি হল ঃ

"Dear Mr. Ginsberg,

I am amazed to get your pointlessly discourteous letter of 13th. That you agree with the communist characterisation of the Congress for Cultural Freedom as a 'fraud and a bullshit intellectual liberal anti-communist syndicate' did not, however, surprise me, for I never thought the Congress had any chance of escaping your contempt for everything 'bourgeois or respectable.'

If any known Indian literature or intellectual come under police repression for their literary or intellectual work, I am sure the Indian Committee for Cultural Freedom would move in the matter without any ungraceful promptings from you. I am glad to tell you that no repression of that kind has taken place here currently. Malay Roychoudhury and his young friends of the Hungry Generation have not produced any worthwhile to may knowledge, though they have produced and distributed a not of self-advertising leaflets and printed letters abusing distinguished writers in filthy and obscene language (I hope you agree that the word 'fuck' is obscene and 'bastard' filthy atleast in the sentence 'Fuck the bastards of the Gangshalik School of Poetry'.) They have used worst language in regard to poets whom they have not hesitated to refer to by name. Recently they hired a woman to exhibit her bosom in public and invited a lot of people including myself to witness this wonderful avantgarde exhibition ! you may think it your duty to promote in the name of Cultural Freedom such adolescent pranks in Calcutta from halfway round the world. You would permit me to differ from you in regard to what is my duty.

It was of course foolish of the police to play into the hands of these young men and hold a few of them in custody for a few days (they have all been released now) thus giving the publicity and some public sympathy— publicity is precisely what they want to gain through their pranks.

I do not agree with you that it is the prime task of the Indian committee for Cultural Freedom to take up the cause of these immature imitators of American Beatnik poetry. I respect your knowledge of European literature but cannot permit myself to be guided by your estimation of writers in my language— a language of which you choose to remain totally ignorant.

Yours Sincerely
Abu Sayeed Ayyub"[১৫]

বিভিন্ন চিঠি এবং নামকরা সাহিত্যিকদের মনোভাব বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়— হাংরি আন্দোলনকে ভেঙে দেবার একটা দুঃসাহসী প্রয়াস এঁদের ছিল। এঁরা অনেকটা সফলও হয়েছিলেন। এমন করার কারণ— হাংরি আন্দোলনের ফলে উঠতি যুবকরা সাহিত্যকে তাঁদের আয়ত্তাধীন করে প্রবীণদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে সচেষ্ট যা আবু সয়ীদ আয়ুব, বুদ্ধদেব বসু, সধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, নরেশ গুহ, প্রমুখরা মেনে নিতে প্রস্তুত নন। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে হাংরি আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে এঁরা

নিজেদের কবিতার স্টাইল পাল্টে দিলেন। আধুনিক শব্দটা আর তেমন ব্যবহার করেন না। নান্দনিকতা সাহিত্য থেকে প্রায় হারিয়ে গেছে। হাংরি আন্দোলন সফল হয়েছিল বলেই এঁরা দেশ পেরিয়ে বিদেশে নিজেদের মতামত উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ইতিপূর্বে কাঠমাণ্ডু থেকে বেনারসে পড়তে আসা ছাত্রদের মুখে মুখে হাংরি আন্দোলন প্রচারিত হয়ে যায়। সবচেয়ে মজার ব্যাপর— একসময় হাংরি আন্দোলনকারীদের আড্ডার জায়গা হয়ে উঠেছিল নেপালের কাঠমাণ্ডু। নেপালের সাহিত্য অ্যাকাদেমির সহ-অধ্যক্ষ বাসু শশী ব্যক্তিগত ভাবে মলয় রায়চৌধুরী সহ অনেককে নিমন্ত্রণ করেন। কাঠমাণ্ডুতে হাংরি আন্দোলনকারীরা সাহিত্য সভা, ছবি প্রদর্শন এবং আরও নানা কাণ্ডে মেতে উঠলেন। আমেরিকার 'সল্টেড ফেদার্স' পত্রিকায় ওয়াশিংটন স্টেট ইউনিভারসিটির অধ্যাপক হাওয়ার্ড ম্যাককর্ড ভারতে গবেষণা করতে এসে হাংরি আন্দোলন এবং তাঁদের কবিতা সম্পর্কে জানতে পেরে মন্তব্য করেন ঃ

"This kind of poetry is dangerous and revolutionary, cleanses by violence, and destruction, unsettless and confounds the reader. This is the poetry of the disaffected, the alienated, the outraged, the dying. It is poetry which alarms and disgusts the bourgeois, for it describes their own sickened state more clearly than they wish to hear, and exposes the hypocrisy of their decency. One reaction of good citizens has been to accure the poets of hysteria and obscenity. The charges of obscenity indicates the virulence and depth of the fear which these poets have uncovered.

The energy of the poets is hystorical : the imagery of the poem is obscene. It is meant to be. But I take obscenity to be a just and natural reaction to a vile existence. Obscenity is the desperate music of poets who dare speak out against the rape of mind soul that marks our demented and vicious civilization. Obscently is the last attempt by honest men to speak their agony to those who torture them. Obscenity is a moral weapon with which to attack the degrading and filthy use of power that chacterises our age, and assert contempt for managers of our lives.

These poets say what poets and prophets have said for a hundred years— that our civilization is desperately sick, that our consciousness is polluted, our values murderous. They are outraged at the cruel and deliberate waste of beauty and intelligence that would culture represents, and sickened by the perversions of life our societies demand. Their poems record the ugly, numbing truth that most men delight in these horrors, lust after their own destruction, and fear life insanely. The poets are nihilists. They are pessimists. And most will die before their time. But each of them has avision as what man ought to be, and should

be, and their poetry stems from the sad knowledge of what he is. I value their work most because it is an honest response to the reality of life in India. And India endures now what will come to us all before long. Pound said that poets are antennae of the race, and they are— but they are also gotten on cossandra, and will not be belived until too late, when the vacuous mouthings that pass as earthly wisdom are known by all to be empty, dreadful lies and the hideous future we have let to be prepared for us arrives. We will not be saved. This is the obscenity their poetry must celebrate."[১৬]

আমরা এতক্ষণে বুঝে গেছি হাংরি আন্দোলন কেন বিশ্বের দরবারে পৌঁছতে সক্ষম হয়ছিল। এ যে কোনো আন্দোলনের প্রভাবে পরিচালিত নয় তাও আমাদের কাছে স্পষ্ট। হাংরি আন্দোলন যে বিট আন্দোলনের প্রভাব মুক্ত সে সম্বন্ধে Prof. D. S. Klein আমেরিকার পোটলেণ্ডের 'Salted Feathers' পত্রিকার ৮১৯ নং সংখ্যায় লিখেছেন— "Their originality is in no doubt, Compare imogery. And length of line (as translations, the music cant be heard but line-length is some indication of its nature)."[১৭] মাইকেল মধুসূদন দত্ত পাশ্চাত্যে পাড়ি দিলেন পৃথিবী বিখ্যাত হতে কিন্তু বিখ্যাত হলেন মাতৃভাষা বাংলায় সাহিত্য সাধনা করে। পাশ্চার্ত্যের মানুষ বাংলা সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হলেন রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' (Song Offerings-১৯১৩) নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর। এরপর বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার জোয়ার বইলেও, রবীন্দ্রনাথের বিরোধীতা করে একদল সাহিত্যিকের জন্ম হলেও বিশ্বসাহিত্যে তাঁদের দান একেবারে নেই বললে ভুল হয় না। অবশেষে হাংরি আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য পৃথিবীর কাছে আকৃষ্ট হয়ে উঠল মলয় রায়চৌধুরীর মাধ্যমে। বলা যেতে পারে, হাংরি আন্দোলন প্রয়াস করল ইউরোপ এবং আমেরিকায় বাংলা সাহিত্যকে পৌঁছে দিতে এবং তাঁরা সফলও হয়েছেন সর্বাংশে।

উল্লেখপঞ্জি

১. দত্ত সন্দীপ, 'লিটন ম্যাগাজিনের ইস্তাহারভিত্তিক আন্দোলন', বনানী, সম্পাদক ঃ অধীরকৃষ্ণ মণ্ডল, লিটন ম্যাগাজিন সংখ্যা, এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০০৬, যদুবেড়িয়া, উলুবেড়িয়া, হাওড়া, পৃষ্ঠা-১৯

২. রায়চৌধুরী মলয়, 'কৃত্তিবাস থেকে হাংরি আন্দোলন ঃ বাংলা কবিতার পালাবদল', হাওয়া ৪৯, তদেব, পৃষ্ঠা-৫৮

৩. তদেব, পৃষ্ঠা-৫৮

৪. রায়চৌধুরী মলয়, 'অ্যালেন গিন্সবার্গকে হাংরি আন্দোলন কীভাবে প্রভাবিত করেছে' হাওয়া ৪৯, তদেব, পৃষ্ঠা-৩৮

৫. তদেব, পৃষ্ঠা-৩৮, ৩৯

৬. তদেব, পৃষ্ঠা-৪১
৭. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৯, ৫০
৮. তদেব, পৃষ্ঠা-৫০
৯. তদেব, পৃষ্ঠা-৫২
১০. তদেব, পৃষ্ঠা-৫২
১১. রায়চৌধুরী মলয়, 'হাংরি কিংবদন্তী', তদেব, পৃষ্ঠা-৪৯, ৫০
১২. তদেব, পৃষ্ঠা-৫১
১৩. তদেব, পৃষ্ঠা-৫১, ৫২, ৫৩
১৪. তদেব, পৃষ্ঠা-৫৩
১৫. তদেব, পৃষ্ঠা-৫৯, ৬০
১৬. তদেব, পৃষ্ঠা-১০১, ১০২
১৭. শর্মা নন্দলাল 'বাংলা সাহিত্যে একটি সম্ভাবনার অপমৃত্যু ঃ হাংরি জেনারেশন' মিলন, প্রকাশন ও সম্পাদক ঃ বিশ্বজিৎ নন্দী, শিলং, মেঘালয়, বার্ষিক সংকলন ২০০৭, পৃষ্ঠা-২২ □

চতুর্থ অধ্যায়

হাংরি আন্দোলন সমাপ্তির কারণ গাথা

হাংরি আন্দোলনই বাংলা সাহিত্যের একমাত্র আন্দোলন। ঘোষণা করে সাহিত্যে আন্দোলন পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম। এই আন্দোলনের প্রধান মলয় রায়চৌধুরী। বাংলা সাহিত্যে দলবদ্ধ আন্দোলন এর আগে কখনও হয়নি। আন্দোলনটি হয়েছিল মাত্র বিয়াল্লিশ মাস। এই বিয়াল্লিশ মাসে হাংরি আন্দোলন বাংলা সাহিত্যের ভিত কাঁপিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। কারণ এঁদের উদ্দেশ্য ছিল প্রতিষ্ঠানের বিরোধীতা করা। প্রতিষ্ঠান মূলত সরকার কিংবা বেসরকারি ব্যবসা কেন্দ্র। অর্থাৎ লাভ-লোকসানের গোড়াতে ধাক্কা দিলে তাদের বিরোধীতা হবেই। যদিও হাংরি আন্দোলনকারীরা বিরোধীতা করেছিল আধুনিক সাহিত্য এবং নান্দনিক চিন্তাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে। ইতিপূর্বে কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি, কবিতা, পরিচয় ইত্যাদি পত্রিকাগোষ্ঠী রবীন্দ্রনাথের বিরোধীতা করে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্র সাহিত্যে নিমগ্ন হয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল। ততোদিনে শতভিষা, কৃত্তিবাস পত্রিকা গোষ্ঠী একটা দল তৈরি করে নিয়েছিল যাঁরা নান্দনিক চিন্তার মধ্যে থেকে বাংলাকে আধুনিক সাহিত্যের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যস্ত। তখন সাহিত্যের চর্চা করার মতো উপযুক্ত পত্রিকার অভাব ছিল। উল্লিখিত পত্রিকাগুলোতে সাধারণত নিম্নশ্রেণির লেখকরা স্থান পেতেন না। এমনকি তাঁদেরকে তোষামোদ না করলে নবীন কবিরা অবহেলিত থাকতেন।

বিভিন্ন কারণে ‘হাংরি’ আন্দোলনের জন্ম হল এবং অল্পদিনেই এই আন্দোলন বাংলা সাহিত্যের মূল জায়গায় ধাক্কা দিয়ে নিজের আসন করে নিতে সক্ষম হল। তাই ঝাকে ঝাকে যুবক সম্প্রদায় হাংরি আন্দোলনে যোগ দিতে আরম্ভ করলেন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষা-গোষ্ঠীর মধ্যেও এই আন্দোলনের প্রভাব বিস্তার করতে লাগল। এমন কি ‘কৃত্তিবাস’ গোষ্ঠীর অনেকে হাংরি আন্দোলনে এসে যোগদান করলেন। সেই সময় ‘কৃত্তিবাস’ পত্রিকার সম্পাদক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়ার্কপশপে যোগদান করেন। সেখান থেকে জানতে পারেন হাংরি আন্দোলন কলকাতায় এক চরম পর্যায়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উঠেছে। হাংরি আন্দোলনের আক্রমনে অনেকে লকিয়ে লুকিয়ে চলতে আরম্ভ করেন। কেউ কেউ বিভিন্ন জায়গায় নালিশ জানান। কেউ দল পাকান। কেউ হাংরি আন্দোলনকারীদেরকে দেখে নেবার মতো কাণ্ড করেন। কেউ পুলিশে কমপ্লেন দিয়ে রাখেন। সরকারী আমলারা আক্রান্ত হলে তাঁরা হাংরি আন্দোলনকারীদের চাল-চলনগুলো নজরদারি করতে লাগলেন, যাতে করে তাদেরকে ফাঁদে ফেলে যায়।

হাংরি আন্দোলন যখন চরমে তখন আলেন গিন্সবার্গ হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে জানতে তাদের সঙ্গে ঘোরা-ফেরা করেন। তথ্য সংগ্রহ করে অনুবাদ করিয়ে নেন। অবশেষে সম্পূর্ণ সমর্থন করে আমেরিকা চলে গেলে সেখান থেকে সমস্ত খবর রাখেন। আমেরিকায়

গিয়ে গিন্সবার্গ হাংরি আন্দোলনের সংবাদ বিভিন্ন দেশে প্রচার করার কাজে নিমগ্ন হয়ে পড়লেন। এভাবে হাংরি আন্দোলন বিশ্বের দরবারে পরিচিতি লাভ করতে লাগল। তখন আমেরিকায় বসে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় একটি চিঠি মারফত মলয় রায়চৌধুরীকে শাসিয়ে হাংরি আন্দোলন ভেঙে দেবার কথা বলেন। জুন ১৯৬৪-তে লেখা সেই চিঠির সংক্ষিপ্ত আমরা দেখে নিতে পারি ঃ

"প্রিয় বরেষু,

মলয় তুমি কলকাতায় কি সব কাণ্ডের বড়াই করে চিঠি লিখেছ জানি না, কী কাণ্ড করছো ? আমার বন্ধু-বান্ধবদের কেউ কেউ ভাসাভাসা লিখেছে বটে কফিহাউসে কী সব গণ্ডগোলের কথা।

কিছু লেখার বদলে আন্দোলন ও হাঙ্গামা করার দিকেই তোমার লক্ষ্য বেশি। রাত্রে তোমার ঘুম হয় তো ? এসব কিছু না— আমার ওতে কোনো মাথা ব্যথা নেই। যত খুশি আন্দোলন করে যেতে পারো— বাংলা কবিতার ওতে কিছু আসে যায় না। মনে হয় খুব একটা শর্টকাট খ্যাতি পাবার লোভ তোমার। পেতেও পারো বলা যায় না। আমি এসব আন্দোলন কখনো করিনি, নিজের হৃৎস্পন্দন নিয়ে আমি এই ব্যস্ত।

তবে একথা ঠিক, কলকাতা শহরটা আমার। ফিরে গিয়ে আমি ওখানে রাজত্ব করব। তোমরা তার একচুলও বদলাতে পারবে না। আমার বন্ধু-বান্ধবরা অনেকেই সম্রাট। তোমাকে ভয় করতুম, যদি তোমার মধ্যে এখন পর্যন্ত একটুও জেল্লা দেখতে পেতুম।...

চালিয়ে যাও ওসব আন্দোলন কিংবা জেনারেশন ভণ্ডামি। ...আমাকে দেখেছ নিশ্চয় শান্তশিষ্ট, ভালো মানুষ। আমি তাই-ই, যদিও গায়ে পদ্মপারের রক্ত আছে। সুতরাং তোমাদের উচিত আমাকে দূরে দূরে রাখা, খোঁচাখুঁচি না করা। দু'একজন বন্ধু-বান্ধব ও-দলে আছে নিতান্ত স্নেহবশতই তোমাদের হাংরি জেনারেশন গোড়ার দিকে ভেঙে দেইনি। এখনও সে ক্ষমতা রাখি, জেনে রেখো। তবে এখনও ইচ্ছে নেই ও খেলাঘর ভাঙার।

সুনীলদা..."[১]

হাংরি আন্দোলন ভেঙে দেবার জন্য অনেকেই চেষ্টা করেছেন। যুবক আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অন্ত ছিল না। প্রতিপত্তিশালী লেখক আমলা-অধ্যাপকরা রাজনৈতিক মহল ও প্রশাসন মারফত অনবরত হাংরিদের ওপর ভয়সূচক চাপ চালিয়ে যেতে লাগলেন। কোনো প্রেস যাতে হাংরি আন্দোলনকারীদের লেখা না ছাপায় সে ব্যাপারেও তারা কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করে রেখেছিলেন। পার্বতীকুমার মুখোপাধ্যায় নামে একজন অচেনা লোক সামনা-সামনি ছাপানো ব্যাপারে হুমকি দিয়ে গেল কয়েকজন হাংরি শরিককে। একটি প্রেসে হাংরি বুলেটিনের কাজ অর্ধেক হয়ে যাবার পর প্রেস মালিক গ্যালি ভেঙে দিলেন। এর মূল কারণ— পুলিশ দিয়ে তাঁকে ভয় দেখানো হয়েছিল। তাই হাংরি আন্দোলনকারীরা কলকাতায় ছাপা বন্ধ করে দিয়ে

মুর্শিদাবাদে বহরমপুরের প্রেসে ছাপার ব্যবস্থা করলেন। পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে দিলেই তারা ছেপে কলকাতায় পাঠিয়ে দিত।

হাংরি আন্দোলন যখন চরমে তখন এই আন্দোলনকে দমিয়ে দেবার জন্য নানান প্রচেষ্টা চলে। পুলিশ লাগিয়ে ভয় দেখানো হয়। সেই সময় কলকাতার বুকে প্রতিভার দাপট দেখান কিছু এসট্যাবলিশমেন্টের পোষা সাহিত্যিকরা কলেজ-স্ট্রিটে দাঁড়িয়ে হাংরি কবি-সাহিত্যিকদের লেখা না পড়ার জন্য চিৎকার করে ভয় দেখান। এঁদের লেখা না ছাপানোর জন্য প্রকাশকদের ওপর ফতোয়া জারি করেন। মলয় রায়চৌধুরী সম্পাদিত 'জেব্রা' প্রথম সংখ্যা প্রকাশ হবার পর কলেজ-স্ট্রিটে কোনো কোনো স্টলে বিক্রি করার জন্য রেখে গেলে একদল 'মুখোশধারী' এসে আধঘণ্টার মধ্যে সব তুলে নিয়ে যায়। হাংরি মকদ্দমার সংবাদের কাটিং দেখিয়ে বিমল রায়চৌধুরী এবং সতেন্দ্র আচার্য স্টল মালিকদের নানাভাবে ভয় দেখান। চিঠি পাঠিয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও মলয় রায়চৌধুরীকে ভয় দেখালেন।

বিভিন্নভাবে হাংরি আন্দোলনকারীদেরকে যে হেনস্তা করা হত, তার প্রমাণ মেলে সমীর রায়চৌধুরীকে প্রেরিত ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জুলাই সুবিমল বসাকের চিঠিটিতে। সুবিমল বসাক লিখছেন—

"প্রিয় সমীরদা,

আমি পাটনায় গিয়েছিলুম, শুনলুম আপনি চাইবাসায়। মলয় রায়চৌধুরীকে সম্পূর্ণ ব্যাপারটা বলেছি। শক্তি একদিন (যেদিন যুগান্তরে নিউজ বেরিয়েছিল) আমায় কফিহাউস থেকে নিচে ডেকে মারধোর করার চেষ্টা করেছিলো। আপনি জানেন, আমি পাটনার ছেলে, মুখে কথা বলার চেয়ে কাজে বেশী— সেদিনই আমি শক্তিকে উচিত শিক্ষা দিয়ে দিতুম, কিন্তু আমার বন্ধুদের জন্য কোর্লাম না। তবে আমি 'ডায়েরী করেছি থানায়'— এই বলে রটিয়েছি, এবং ভবিষ্যতে শক্তির নামে কেস ঠুকে দেবো বলেছি। এচ. জি. টা এখনও বের হলো না, প্রেসগুলি ছেপে দেবো বলে কথা দিচ্ছে অথচ ম্যাটার দেখে সরে যাচ্ছে। এখানে অবশ্য নানা রকম rumour শোনা যাচ্ছে। অনেক কথা। আজ স্টেনসিলে একটা এচ. জি. বের করে দিলাম— ডিস্ট্রিব্যুট করিনি। ওটা পাটনা থেকে ছেপেছে বলেছি। কোলকাতায় কবে আসছেন ? মলয় সম্ভবতঃ অগস্টে আসবে বলে কথা দিয়েছে, দেখা যাক। এখন এলে পরে সবার সঙ্গে দেখা হবার চান্স আছে।

মলয়কে H. G. পাঠিয়েছি, আপনাকে পাঠালাম।

সুবিমল বসাক
১৩, বিপিন গাঙ্গুলী রোড
দমদম, কলকাতা - ৩৩
[চিঠি পাচ্ছি না। এই ঠিকানায় দেবেন]"[১২]

১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে আরম্ভ হয়ে যায় সে-সময়ের আধিপত্যবাদী ডিসকোর্সের সঙ্গে হাংরি আন্দোলনের কাউন্টার ডিসকোর্সের সংঘাত। এই মর্মে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে পিইএন-এর অধ্যক্ষ নিসিম এজোকিয়েল, কাউন্সিল ফর কালচারাল ফ্রিডামের সচিব এ. বি. শাহ, এশিয়া সোসাইটির পরিচালক বনি ক্রাউন এবং ভারত সরকারের সংস্কৃতি উপদেষ্টা পুপুল জয়াকর প্রমুখ মলয় রায়চৌধুরীকে সাবধান করে বলে দিয়েছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গে সেই সময়টার সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্যমণিরা প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কাছে নানান ভাবে নালিশ জানিয়ে চাপ সৃষ্টি করছিলেন যাতে হাংরি প্রতিসন্দর্ভের কন্ঠরোধ করার আইন সম্মত পদক্ষেপ নেওয়া যায়। হয়েছিলও তাই। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মলয় রায়চৌধুরী, সমীর রায়চৌধুরী, প্রদীপ চৌধুরী, দেবী রায়, সুভাষ ঘোষ এবং শৈলেশ্বর ঘোষ গ্রেপ্তার হলেন। সুবিমল বসাক, উৎপলকুমার বসু, বাসুদেব দাশগুপ্ত, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সুবো আচার্য প্রমুখের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট ইশিউ হয় কিন্তু তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক মামলা হওয়ার আগে কলেজ-স্ট্রিটের কফিহাউজের সামনে সুবিমল বসাকের ওপর দু'বার হামলা হয়। "সুবিমলকে একবার ঘিরে ধরা হয়েছিল তাঁর তৈরি কাঠের ব্লকে 'প্রতিদ্বন্দ্বী' পত্রিকায় প্রচ্ছদ, আর সাইক্লোস্টাইল করা একটা বুলেটিনে দু-জোড়া পায়ের পাতার সিরিজ আঁকার জন্য। আরেকবার একদল কবি-লেখক ঘিরে ধরেছিলেন, যারা মূলত প্রমাণ করতে চাইছিলেন মিডিয়ার সঙ্গে তাঁদের একাত্মতা।"[৩] যে অগ্রজ বিদ্বজ্জনেরা হামলা করেছিলেন, তাঁদের অভিযোগ ছিল— ড্রইং গুলো অশ্লীল। তখন সময় ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিক। কিন্তু সুবিমল বসাকের গায়ের জোর প্রচণ্ড থাকায় তাঁকে কাবু করতে পারেনি কেউ। তিনি ভয় পাবার মানুষ নন। সুবিমল বসাকের ওপর হামলার খবর কলকাতা ছাড়িয়ে দিল্লি, এলাহাবাদ, বম্বে, মাদ্রাজ, ইত্যাদি জায়গায় বিস্তার লাভ করে। এই খবরটা হিন্দি 'জ্ঞানোদয়' পত্রিকার সম্পাদক শরদ দেওড়া চারিদিকে রটিয়ে দেন। সুবিমল বসাক প্রহৃত হলে সঙ্গে থাকা বাসুদেব দাশগুপ্ত, সুভাষ ঘোষ, শৈলেশ্বর ঘোষ, সুবো আচার্য নিজেকে বাঁচিয়ে সরে পড়েন। পরে সুভাষ ঘোষ এবং শৈলেশ্বর ঘোষ হামলার ব্যাপার নিয়ে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ করতে গেলে অপমান করে তাড়িয়ে দেন। সুবিমল বসাকের ওপর হামলা করা হয় ছাতার বাট, লোহার রড ইত্যাদি নিয়ে। এক হিন্দি পত্রিকার সংবাদ মতে শক্তি চট্টোপাধ্যায় এর প্রধান নিয়ন্তা। সঙ্গে ডক্টর বিটু বসাক নামে একজন সহায় হিসেবে ছিলেন। মলয় রায়চৌধুরী জানাচ্ছেন— কফিহাউসের সামনে সুবিমল বসাকের ওপর হামলায় যাঁরা ছিলেন, তাঁরা হলে— শক্তি চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ রায়, শান্তিকুমার ঘোষ, বিমল রায়চৌধুরী, শংকর চট্টোপাধ্যায়, প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, দীপক মজুমদার, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, বেলাল চৌধুরী, বিজন রায়, রূপেন্দ্র বসু, ধীরেশ বাগচী, সমীর সেনগুপ্ত, অরূপরতন বসু প্রমুখ।

কফিহাউজের দেয়ালে অনিল করঞ্জাই-এর আঁকা পোস্টার যতবার লাগান হল, ততবারই মস্তান প্রকৃতির অগ্রজ প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্যিকরা অশ্লীলতার অভিযোগে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। হাংরি আন্দোলনের রণদামামায় আতঙ্কিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের রাজনৈতিক শরিক বাবুরাও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। পরিণাম স্বরূপ ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাস্টিকেট হলেন প্রদীপ চৌধুরী। হাংরি বুলেটিনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় সামরিকভাবে সমীর

রায়চৌধুরী চাকরি থেকে বরখাস্ত হলেন। উৎপলকুমার বসু যোগমায়া কলেজে অধ্যাপনার চাকরি খোয়ালেন। দেবী রায়কে কৌশল করে কলকাতা থেকে বদলি করা হল বর্ধমানে। কারণ, দেবী রায় সমস্ত ছাপার কাজ দেখাশোনা করতেন।

ততদিনে শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় দল ছেড়ে বেরিয়ে গেছেন। শক্তি চট্টোপাধ্যায় 'রূপচাঁদ পক্ষী' ছদ্মনামে হাংরি আন্দোলনের বিরুদ্ধে অনেকগুলো লেখা লিখলেন। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় দৈনিক 'আজকাল' পত্রিকায় যোগ দিয়েছেন এবং'প্রতিক্ষণ' পাক্ষিকেরও লেখক। শক্তি চট্টোপাধ্যায় যোগ দিয়েছেন 'দেশ' ও'আনন্দবাজার' পত্রিকায়। সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় তখনও নিজেকে অ্যান্টি এসট্যাব্লিশমেন্ট ঘোষণা করেন। হাংরি আন্দোলনে শরিক হিসেবে থাকতে ভয় করতে লাগলেন— শৈলেশ্বর ঘোষ, প্রদীপ চৌধুরী, সুভাষ ঘোষ, দেবী রায়, সুবো আচার্য প্রমুখরা। হাংরি বুলেটিনে সুবো আচার্য ও অন্যান্যরা যে সমস্ত লেখা ছাপতে দিয়েছিলেন, তাঁরা সেগুলো না ছাপতে অনুরোধ করে ফেরত চাইলেন।

এদিকে হাংরি আন্দোলনের শরিকরা নিজেদের মধ্যে মতদ্বৈধতায় ভুগতে লাগলেন। অনেকে ধীরে ধীরে হাংরি আন্দোলন থেকে দূরে সরে গেলেন। মলয় রায়চৌধুরী লাইমলাইটে চলে এসেছেন মনে করে অনেকেই তাঁর প্রতি হিংসা ও রাগভাব প্রকাশ করতে লাগলেন। দেবী রায় আর শৈলেশ্বর ঘোষ একজন অন্যজনকে সহ্য করতে পারেন না। সুভাষ ঘোষ এবং বাসুদেব দাশগুপ্তর মধ্যেও বনিবনাক নেই। শৈলেশ্বর ঘোষ প্রদীপ চৌধুরীকে হাংরি আন্দোলন থেকে সরিয়ে নেবার জন্য ব্রেনওয়াশ করতে লাগলেন। বাংলা সাহিত্যে হাংরি আন্দোলন একটা জায়গা করে ফেলার দরুণ শরিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্যিকদের মাথা বিগড়ে যায়। কারণ, মলয় রায়চৌধুরী স্রষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ আছেন বলেই তাঁদের এই হিংস্র মানসিকতা। তাই এসট্যাব্লিশমেন্টের লেখক এবং'কল্লোল', 'প্রগতি', 'পরিচয়', 'শতভিষা','কৃত্তিবাস' প্রভৃতি গোষ্ঠীর নান্দনিক সাহিত্যিকরা হাংরিদের মধ্যে মতবিরোধ দেখে খুশিতে আত্মহারা। এই গণ্ডগোল যখন চলছিল তখন আত্মহারা হওয়া সাহিত্য ব্যবসায়ীদের খুশিতে ঘুষি মেরে প্রদীপ চৌধুরী এক-ফরমারে একটি হাংরি বুলেটিন প্রকাশ করে ফেলেন। কলকাতায় রটে গেছে, হাংরি আন্দোলনকারীরা প্রেস আইন অবমাননা করায় অ্যারেস্ট হয়ে জামিনে বেরিয়ে এসেছেন। তাই কফিহাউসে অনেক লেখকরা ভয়ে হাংরি আন্দোলনের কবি-লেখকদের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছেন।

হাংরি আন্দোলন করতে গিয়ে ইশতিহার প্রকাশ করার সুবাদে মলয় রায়চৌধুরী এবং সমীর রায়চৌধুরী এবং দেবী রায় প্রতিষ্ঠিত অনেক সাহিত্যিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ইশতিহার পড়তে দেন। পরামর্শ চান। লেখার প্রয়োজন জানান। এরফলে বিভিন্ন জন বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। মলয় রায়চৌধুরী আর দেবী রায় একদিন বুদ্ধদেব বসুর বাড়িতে বন্ধ দরজায় কড়া নাড়ালে দরজা খুলে ইশতিহার হাতে নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়েই চোখ বুলিয়ে রাগসূচক 'হুম' শব্দ করে দরজা বন্ধ করে দেন। একদিন আবু সয়ীদ আইয়ুব সাহেবের বাসায় মলয় রায়চৌধুরী এবং সমীর রায়চৌধুরী দেখা করতে গেলে হাবভাবে বোঝালেন তিনি এখনও রেগে আছেন। কারণ, তাঁকে দুটো নিমন্ত্রণ কার্ড পাঠিয়েছিলেন এঁরা। একটায় বিয়ের নিমন্ত্রণের

পরিবর্তে ছিল— 'গাঙশালিখ কাব্যস্কুলের জারজদের ধর্ষণ করো।' অন্যটায় ছিল— 'লিণ্ডসে স্ট্রীটে টপলেস প্রদর্শনী দেখতে আসুন।' শেষে জানান, তিনি হাংরিদের কোনো লেখা পড়েন না। মলয় রায়চৌধুরী একদিন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর বাড়িতে গেলে ভেতর থেকে খবর পাঠিয়ে জানালেন, অন্যদিন আসতে, আজ তাঁর সময় নেই। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে মলয় রায়চৌধুরী সাক্ষাৎ করতে গেলে বিকেল থেকে সন্ধে পর্যন্ত বসিয়ে রেখে যখন দর্শন দিলেন তখন মদের বুঁদ গন্ধে বৈঠকখানা উত্তেজিত হয়ে উঠল। ইশতিহার দিলে তিনি জানান— এসব পড়ে এবং করে কিছু হবার নেই। হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে বহরমপুরে মলয় রায়চৌধুরীর সঙ্গে মণীশ ঘটক-এর কথা হলে তিনি সমর্থন করেন এবং বলেন, আরও বড় ভাবে করলে কিছু একটা ঘটানো যেতে পারে।

হাংরি আন্দোলনের সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী বুলেটিন হল আট নম্বর সংখ্যাটি। প্রদীপ চৌধুরীর চেষ্টায় ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসের শেষের দিকে সেটি প্রকাশিত হয়। উক্ত সংখ্যাটিতে দশজন লেখক ও একজন প্রকাশকের নাম পাওয়া যায়। ঠিকানা ছিল— ৪৮এ, শঙ্কর হালদার লেন, আহিরিটোলা, কলকাতা, ভারতবর্ষ। বুলেটিন প্রকাশ হবার আগেই প্রদীপ চৌধুরী ত্রিপুরা তাঁর বাড়িতে চলে যান। মলয় রায়চৌধুরী তখন পাটনায়। বুলেটিনের প্রকাশক হিসেব নাম পাওয়া যায়— সমীর রায়চৌধুরীর। কিন্তু ইশতিহারটিতে ছাপাখানার নাম ছিল না। লেখক তালিকায় রয়েছেন— মলয় রায়চৌধুরী, প্রদীপ চৌধুরী, উৎপলকুমার বসু, দেবী রায়, বাসুদেব দাশগুপ্ত, সুবিমল বসাক, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শৈলেশ্বর ঘোষ, সুভাষ ঘোষ এবং সুবো আচার্য। হাংরি বুলেটিন-টি বিলি করা হয়েছিল— কলেজ-স্ট্রিটের ফুটপাতে এবং কফিহাউসে। এই ইশতিহারটিতেই মলয় রায়চৌধুরীর 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' কবিতাটি ছাপা হয়েছিল।

সাহিত্যের দালাল প্রকৃতির কিছু লেখক আগে থেকেই হাংরিদের বিরুদ্ধে তথ্য সংগ্রহ করছিল এবং সেগুলো লালবাজার রাইটার্স বিলডিং-এ জমা দিয়েছিল। হাংরি বুলেটিনের আট নম্বর সংখ্যাটি প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে সেটাও সেখানে পৌঁছে যায়। অনেকদিন ধরেই পুলিশ ফাঁদ পেতে ছিল কোন্ মামলার ভিত্তিতে তাঁদের অ্যারেস্ট করা যায়। মামলাটাকে সাজানোর জন্য তিন রকমের অপরাধ সাব্যস্ত করার চেষ্টা হল, যেমন— ক) প্রেস অ্যাক্ট না মেনে চলা খ) রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ। গ) অশ্লীল রচনা।

পুলিশের ইনফরমার হিসেবে হাংরিদের দলে ভিড়ে আগে থেকেই সমস্ত লেখা ও গতিবিধি সম্বন্ধে তথ্য পাচার করার কাজ করছিলেন— সমীর বসু এবং পবিত্র বল্লভ নামে দুজন যুবক। শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপ এবং অশ্লীল রচনার দায়ে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বর তারিখ রাত ন'টা বেজে পঞ্চান্ন মিনিটে লালবাজার প্রেস সেকশনের সাব ইন্সপেক্টর কালীকিঙ্কর দাস 'হাংরি জেনারেশন' পত্রিকার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগটি হল— "I Sub-Inespector Kalikinkar Das of Detective Department do hereby lodge a report that following up a credible information that an obscene unauthorised Bengali booklet entitled Hungry Generation is in circulation, collected a copy, in which

on scrutiny it was found to contain obscene passages in the contributions of different writers. A through enquiry to unravel the persons responsible for its publication was undertaken. Enquiry revealed that the said booklet was brought into publication under the joint efforts of the undernoted persons who contributed towards the publication of the same by offering articles, poems etc and also rendering assistance for bringing out the publication in or about August 1964 under the fictitious name of the publishers.

From the facts disclosed above it is clear that the accused persons entered into criminal conspiracy to bring out the aforesaid obscene publication which was found in circulation from August 1964. I, therefore, prefer a charge against the accused persons under section 120 B and 292 of Indian Penal Code.

Sd/ Kali Kinkar Das
S.I.D.D. 2.9.64 ”[৪]

উক্ত অভিযোগের ভিত্তিতে কলকাতা জোড়াবাগান থানার এস. আই মিস্টার এস. এন. পাল একই দিনে যে F.I.R দায়ের করলেন তাতে হাংরি জেনারেশনের দশজন লেখক ও প্রকাশককে অভিযুক্তের কাঠগড়ায় দাঁড় করান হল ঃ

"Sec BC/No 360 dt. 2.9.64 U/S 120 B/292 IPC

Police Station : Jorabagan" , Subdivision : Bankshal, Calcutta.

No. 7 Date and hour of occurance ...

Date and hour when reported : 2.9.64 at 9:55 p.m.

Place of occurance and distance and direction from Police Station and Jurisdiction number : Not known.

Name and residence of informant and complaint :

S.I. Kalikinkar Das of D.D.

Name and residence of accused :

1. Subo Acharya
2. Pradip Choudhury
3. Debi Roy
4. Subimal Basak
5. Basudeb Dasgupta
6. Saileswar Ghosh
7. Utpal Kumar Basu

8. Ramananda Chattopadhyay
9. Malay Roychoudhury
10. Subhash Ghosh
11. Samir Roychoudhury.

Brief description of offence with section, and of property carried off, if any :

Entering into a criminal conspiracy for an obscene unauthorised publication to wit a booklet Hungry Generation and thereby continued its circulation to corrupt the minds of the common reader.

U/S 120 B/292 I.P.C.
Sd/- S.N. Paul
S.I. Sec B
2.9.64 ”[৫]

তারপরই শুরু হয় ধরপাকড়। অপমান। হেনস্তা। শারীরিক নির্যাতন। এগারো জনের বিরুদ্ধে F.I.R লিখিত হলেও অ্যারেস্ট করা হল মাত্র ছ'জনকে। F.I.R অনেক রাত্রিতে লিখিত হলেও সেদিন সকালেই কলকাতা থেকে অ্যারেস্টকরা হয় শৈলেশ্বর ঘোষ এবং সুভাষ ঘোষকে। তাঁদের ঘরকে তছনছ করে সমস্ত বইপত্র ও লেখার পাণ্ডুলিপি ছিঁড়ে রাস্তায় ফেলে দেয় পুলিশ। তারপর প্রিজন ভ্যানে তুলে পাড়াতে ভয় দেখিয়ে, আমহার্স্ট-স্ট্রিট লকাপে চোর ছ্যাঁচোড়দের সঙ্গে কয়েক ঘণ্টা রেখা দেওয়া হল। পরে যদিও তাঁদেরকে লালবাজার ইণ্টারোগেশন রুমে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর বর্ধমান ডাক বিভাগের কোয়ার্টার থেকে দেবী রায়কে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায় পুলিশ। দেবী রায়ের ঘরকে উলট-পালট করে বিনা সার্চলিস্ট দিয়ে সমস্ত বইপত্র তুলে নিয়ে আসে পুলিশ কর্তারা, পরে সেগুলো আর ফেরত পাননি দেবী রায়। চাইবাসায় গ্রেপতার হলেন সমীর রায়চৌধুরী। প্রদীপ চৌধুরী গ্রেপতার হলেন ত্রিপুরার আগরতলা থেকে। প্রদীপ চৌধুরীকে হাওয়াই জাহাজে তুলে কলকাতার লালবাজার থানায় নিয়ে আসা হয়। এঁদের দু'জনের সঙ্গেও নানা ভাবে নির্যাতন করে পুলিশ। কিন্তু উৎপলকুমার বসু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সুবিমল বসাক, বাসুদেব দাশগুপ্ত এবং সুবো আচার্যর বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট থাকলেও তাঁদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়নি।

৪ সেপ্টেম্বর ১৯৬৪-তে পাটনায় মলয় রায়চৌধুরী সরকারী দফতর-এ কর্মরত অবস্থায় অ্যারেস্ট হলেন। অ্যারেস্ট করার সময় ছিলেন কলকাতা পুলিশের সাবইন্সপেক্টর সুরেন্দ্রমোহন বারড়ি, অমল মুখার্জী এবং পাটনা পুলিশের সাবইন্সপেক্টর কৃষ্ণকুমার সিনহা। চোরের মতো পুলিশের দুজন দুহাতে ধরে রাখে এবং একজন পেছন দিকে সার্টের কলার টেনে রাখে, যাতে পালিয়ে যেতে না পারেন। অফিস থেকে বের করে আনা হলে মলয় রায়চৌধুরীর কোমরে দড়ি বেঁধে এবং হাতে হাত কড়া পরিয়ে চারজন কন্সটেবলের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে পিরবহোর থানায় নিয়ে যাওয়া হল। ইন্সপেক্টররা তখন রিকশা করে চলেছেন। সেদিনই মলয় রায়চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে কুড়ি-

পঁচিশজন সশস্ত্র সিপাহি তাঁর বাড়িতে এলেন। সমস্ত বাড়িটাকে সিপাহিরা ঘেরাও করে রাখে। বাড়ির লোকেরা এত পুলিশ এবং মলয় রায়চৌধুরীর কোমরে দড়ি ও হাতকড়া দেখে ভীত হয়ে পড়েন। তিন ঘণ্টা তল্লাশ চলল। রাত আট-টা পর্যন্ত এই সার্চ চলে। এই সার্চে মলয় রায়চৌধুরীর মায়ের একটি ট্রাঙ্ক লোহার রড দিয়ে কলকাতা পুলিশের দুই ইন্সপেক্টর ভেঙে ফেলে। ঘরময় লণ্ডভণ্ড জামাকাপড়। ঘরের মেঝেতে বইপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে। বইয়ের আলমারির কাঁচ ভেঙে ফেলার ফলে ঘরময় একটা বিছরি কাণ্ড। তারপর অকথ্য ভাষায় গালাগালি ও আবোল তাবোল কথাবার্তা। 'হাংরি কিংবদন্তী' গ্রন্থে মলয় রায়চৌধুরী কলকাতা পুলিশের বারড়ি ও মুখার্জীর কথাবার্তা লিপিবদ্ধ করেছেন। তার খানিকটা অংশ নিম্নরূপ—

"—শালা টাইপরাইটারটা টানা মাল মনে হচ্ছে।
—প্রেসটা কোন ঘরে ?
—ওফ্ জব্বর একখানা বই 'বিজনের রক্তমাংস', রেখেনে রেখেনে, একজিবিট হবে।
—বিদেশি টাকা আসে, সে-সব কোথায় ?
—একি, এসব চিঠি কাদের ? লেনদেনের করেসপন্ডেন্স মনে হচ্ছে। হ্যাশিণ্ট্যাশিসের চালাচালি থাকতে পারে, রেখেনে। রায় সাহেব বলেছেন, যতো মাল পাওয়া যায়।
—তা পোর্ণোগ্রাফির বইগুলো কোথায় খবর পেয়ে সরিয়ে ফেলা হয়েছে নাকি ?"[৬]

তিনঘণ্টা সার্চের পর বই-কাগজ, চিঠিপত্র, ডায়েরি টাইপরাইটার, ফাইল ইত্যাদি তোলা হল পুলিশ ভ্যানে। সাক্ষী হিসেবে রাস্তা থেকে পাটনা কর্পোরেশনের দুজন জমাদারকে পুলিশ ধরে নিয়ে এলো। যাদের একজন বাংলা জানে না। পাটনায় মলয় রায়চৌধুরীর বাড়িতে বিকেল ৫-৪৫ থেকে ৮-৩০ মিনিট পর্যন্ত সার্চ করে পুলিশ যে লিস্ট তৈরি করেছিল, তার তালিকা নিম্নরূপ ঃ

"Copy of Search list :

1. Date and hour of Search : on 4.9.64 between 5:45 P.M. and 8:30 P.M.
2. Name and residence of person whose hours is searched : Malay Roychoudhury, Son of Shri Ranjit Roychoudhury of Dariapur Mohalla, P.S.- Pirbahar, Dist. - Patna.
3. Name and residence of witeness to search :
   (i) Shri Brojendra Prosed Sarma, Son of Shri Baldeo Prosad Sarma of Sahajpura, P.S.- Bikram Dist.- Patna.
   (ii) Ramnath Prosad, Son of Gangdeo Lall of Manjhopur, P.S.- Mashrak, Dist.- Saran.

Articles Seized :

1. One Booklet in Bengali Hungry Generation.
2. One flat file containing several manuscript i.e. Atmahatya in Bengali and drama and short story and other poems without any title.

3. Two diary books of Malay Roychoudhury, one containing in English and the other in Bengali writings.
4. One bundle of leaflets numbering ten under the heading of Hungry Generation.
5. Two flat files containing letters and correspondence addressed to Malay Roychoudhury by different persons containing pages 60 and 40 repectively.
6. 27 Booklet under the title‘ A Vehement Criticism of our Plans’ by Malay Roychoudhury.
7. Two blocks with their specimen prints.
8. One English book styled as Evergreen Review.
9. One Booklet in Bengali ‘Bijanu Raktanasa.’
10. One Booklet by Pradip Choudhury as Swakal.
11. Three exercise book containing stories in Bengali.
12. Loose sheets of printed papers containing 20 pages under heading Itihasher Darshan.
13. One English book as Sex Lovelife.
14. Two Booklets ‘unmarga.’
15. One hindi book ‘Lahara.’
16. One Bengali book ‘Byavichar.’
17. One manuscript in Bengali ‘Bisakto Futo chand’ by Malay Roychoudhury.
18. One manuscript in English without any title.
19. A bundle containing manuscript in Bengali i.e. Avisek, Satirious, who is then, Chhabish Bachha, Shigra Andharer Dikey, Niash Din, North Bengal Express.
20. One old Corona (Baby) type writer machine bearing on L 3A00912.
21. Eleven books with title as Janowar by Samir Roychoudhury.

Description of place where article seized was found :

All the items where found in the room of accused Malay Roychoudhury at first floor of his house.
Name, father's name, residence etc.
Malay Roychoudhury Son of Shri Ranjit Roychoudhury of Dariapur Mahalla, P.S.- Pirbahar, Dist.- Patna.”[৭]

মলয় রায়চৌধুরীর বাড়ি সার্চ করার পর রাত ন’টায় থানায় এনে তাঁকে লকাপে পুরে দেওয়া হয়। লকাপে আগে থেকেই পাঁচজন কয়েদি রাখা ছিল। একজন বমি আর একজন পেচ্ছাব করে লকাপের রুমটার অবস্থা বেহাল করে দিয়েছে। গন্ধকে ঢাকার জন্য একটা ছেঁড়া কম্বল এর ওপর দেওয়া হয়েছে। মলয় রায়চৌধুরী বলেছেন— “অসহ্য দুর্গন্ধ।”[৮] টিমটিম আলো জ্বলছে। কিছুই ভালোকরে দেখা যাচ্ছে না। নড়াচড়া না করলে ইঁদুরের দল পা বেয়ে ওপরে উঠে আসতে চায়। রাত্রিতে কোনো খাবার দেওয়া হয়নি।

সকাল দশটায় অন্যান্য কয়েদিদের সঙ্গে হাতকড়া লাগানো অবস্থায় খাঁচায়-পুরা গাড়িতে করে ফৌজদারি কোর্টে হাজির করা হল মলয় রায়চৌধুরীকে। চেনা লোকদের ভিড় জমে গেছে ততক্ষণে। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা শ'দুয়েক কয়েদির সঙ্গে বসে থাকতে থাকতে দুপুর নাগাদ ডাক পড়লে ম্যাজিস্ট্রেট জিজ্ঞাসাবাদ এবং উকিলের রুটিনের পর সেদিনই জামিনে ছাড়া পেয়ে গেলেন মলয় রায়চৌধুরী। সঙ্গে আদেশ হল— পাঁচদিনের মধ্যে কলকাতা ব্যাংকশাল কোর্টে আত্মসমর্পণ করতে। জামিনে ছাড়া পাবার পর বাড়িতে পৌঁছলে চাকরি থেকে বরখাস্তের চিঠি নিয়ে পিওন এসে উপস্থিত। কেস লড়ার জন্য পাটনায় উকিল হিসেবে বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিযুক্ত করলেন মলয় রায়চৌধুরী। ফিজ নিয়েছিলেন পাঁচ হাজার টাকা।

যথা সময়ে কলকাতায় ব্যাংকশাল কোর্টে আত্মসমর্পণ করে জামিন নিলেন মলয় রায়চৌধুরী। তাঁর পক্ষে সিনিয়র উকিল হিসেবে ছিলেন ক্রিমিনাল লয়ার চণ্ডীচরণ মৈত্র এবং লেবার কোর্টের উকিল সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়। চণ্ডীচরণ মৈত্রর সাহিত্য সম্পর্কে কোনো ধরনের জ্ঞান না থাকায় সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে রাখেন মলয় রায়চৌধুরী। প্রকাশ শ্রফ নামে একজন লণ্ডন ফেরৎ উকিল পত্রিকাতে হাংরি আন্দোলনকারীদের কথা পড়ে নিজে থেকেই এগিয়ে আসেন। পরে যদিও তাঁকে বাদ দিয়ে দেন মলয় রায়চৌধুরী। পুলিশ এগারো জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেও, মামলা দায়ের করেছিল শুধুমাত্র মলয় রায়চৌধুরীর বিরুদ্ধে। যে রিপোর্টকে কেন্দ্র করে মামলা দায়ের করা হল, সেটি নিম্নরূপ ঃ

"Sec BC/on 360 dt. 2.9.64 U/S 292 I.P.C. Report of enquiry made by the Inespector of Jorabagan Section, Calcutta Police, on the 3rd day of May 1965 Name of parties :

State

Vs

Malay Roychoudhury

Son of Ranjit Roychoudhury of Dariapur Mohalla. P.S.- Pirbahar, Dist.- Patna,

Nature of the complaint and dated of institution :

In August 1964 a printed booklet entitled Hungry Generation, Published Samir Roychoudhury was found on circulation in Calcutta. The poetry captioned **'Prachanda Baidyutik Chutar'** by Malay Roychoudhury was found obscene and director of Public prosecution West Bengal being consulted observed that book was actionable U/S 292 I.P.C. and suggested prosecution of Malay Roychoudhury with printer and publisher.

According Jorabagan P.S. Case No. 360 dated 2.9.64 U/S 120 B/292 I.P.C. was instituted and Saileswar Ghose and Subhas Ghose contributed to the book were arrested on 2.9.64 from their Calcutta residence and a number of said booklet were recovered from their possesion. Malay Roychoudhury was

arrested at Patna on 4.9.64 and on search of his house more copies of the poem in question and a copy of the booklet were found and seized. Then Samir Roychoudhury named publisher and few other contributors namely Debi Roy @ Haradhan Dhara and Pradip Choudhury were also arrested in connection with this case. Samir Roychoudhury disowned the publication and the printer could not be traced despite serious efforts. The opinion of the handwriting expert and oral testimony of the witnesses indicate that Malay was responsible for the production and circulation of his booklet containing an obscene poem composed by himself. Evidence forthcoming do not establish direct responsibility of other persons.

In view of the above circumstances, Malay Roychoudhury who is on C. B. till today (3.5.65) may be proceeded against U/S 292 I.P.C.

Name of witnesses :

1. Tarak Kumar Sen of 48/A Sankar Halder Lane.
2. Samir Basu of 5/A Matilal Sil Lane.
3. Utpal Kumar Basu of 23 Royal Street.
4. Subhas Ghose of 16 A Shyama Charan Mukherjee Street.
5. Saileswar Ghose of 16 B Shyama Charan Mukherjee Street.
6. Pabitra Ballav of 28/A Paik Para Row.
7. Pradip Choudhury of Kulai, Tripura.
8. Sakti Chatterjee of Adhar Chandra Lane
9. Sandipan Chatterjee of 18 Sarada Chatterjee Lane.
10. Shri Pasupati Banerjee, Handwriting Expert Anderson House.
11. S.I.,S.M. Barui D.D.
12. S.I., Amala Mukherjee D.D.
13. S.I.,K.K. Das of D.D. (I.O.)
14. Shri Brojendra Prosad Sharma.
15. Shri Ramnath Prosad.
16. Shri Krisno Kumar Sinha of Pirbahar P.S. Patna and others.

Whether the accused (if arrested) has been forwarded in custody or Accused on court bail till today i.e. 3.5.65.

Sd/- K.K.Das
S.I.D.D.

Sd/- A Choudhury
Inespector of Police
O/C Sec. B, 3.5.65 ১১৯

হাংরি আন্দোলনকারীদের অ্যারেস্ট করাকে কেন্দ্র করে সমস্ত বাংলা এবং ভারতবর্ষের সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী মহলে একটা হৈ চৈ কাণ্ড বেধে যায়। এমন কি ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে এ আন্দোলনের সমর্থনে পৃথিবীর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখির জোয়ার ওঠে। দেওয়ান চমনলালের চেষ্টায় ভারতীয় পার্লামেন্টে হাংরি আন্দোলনকারীদের অ্যারেস্টকে কেন্দ্র করে নতুন আইন করার সওয়াল-জবাব হয়। সেই সময় হাংরি আন্দোলনকারীদের সমর্থনে লেখেন বিহারে ফণীশ্বরনাথ রেণু, দিল্লিতে সচ্চিদানন্দ বাৎসায়ন অজ্ঞেয়, নামওয়র সিংহ, কমলেশ্বর মুদ্রারাক্ষস, শ্রীকান্ত ভর্মা, রাজেন্দ্র যাদব, ভীষ্ম সাহানি, গুজরাটে উমাশঙ্কর যোশী, মুম্বাই-এ খুশওয়ন্ত সিং, ধর্মবীর ভারতী, জার্মানীতে কার্ল ওয়েসনার, লাতিন আমেরিকায় মার্গারেট র‍্যানডাল, আমেরিকায় অ্যালেন গিন্সবার্গ, লরেন্স ফেরলিংঘেট্টি, ইংলণ্ডে জর্জ ডাউডেন ইত্যাদি পৃথিবীখ্যাত সাহিত্যিক পণ্ডিতবর্গ।

হাংরি আন্দোলনকারীরা প্রচারের শীর্ষে থাকার ফলে তাঁদেরকে দেখে অনেকেই ভয়ে কথা বলা বন্ধ করে দেন। আবার অনেকে বিভিন্ন সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে আসেন। তাঁদের মধ্যে শরদ দেওড়া, জ্যোতি দও, খুশওয়ন্ত সিং বিভিন্ন ভাবে সহায় করেন। শরদ দেওড়া টাকা দিয়ে প্রায়ই সাহায্য করতেন। তরুণ সান্যাল হাংরিদের সঙ্গে নানাভাবে পরামর্শ করেন। হাংরি আন্দোলনকারীদের কীভাবে সমর্থন করা যায় সে ব্যাপারেও অনেক চেষ্টা করতে লাগলেন। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭ মে তারিখ তরুণ সান্যাল মলয় রায়চৌধুরীকে একটি চিঠিতে হাংরি জেনারেশনের ষড়যন্ত্রমূলক মামলার রূঢ় সত্যের দিকটি তুলে ধরেন। চিঠির খণ্ড অংশ নিম্ন রূপ ঃ

"আপনার বিরুদ্ধে মামলা কি কেবলমাত্র 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' রচনাটির জন্য ? আমি অবশ্য অন্যরকম শুনেছিলাম। যেমন প্রেস অ্যাক্ট ইত্যাদি ভঙ্গ করার অভিযোগও নাকি অন্যতম ছিল। মূল আক্রমণ নাকি আপনার কোনো এক বিশেষ রচনার জন্য— এখন আপনার চিঠিতে সে লেখাটির হদিস পাওয়া গেল। অভিযোগ কি অশ্লীলতার ? সে ক্ষেত্রে বহু বাঘা লেখক তো এখন হাতের মুঠোয়। অশ্লীলতা তো রচনায় থাকে, যখন কোনো বিশেষ অর্থে যৌনবোধ উদ্রেক করার জন্য প্রত্যক্ষ বা ইঙ্গিত কাজ করে। সেখানে উদ্দেশ্য ও উপকরণে উভয় ক্ষেত্রেই অশ্লীলতা দেখা দিতে পারে।... আপনাদের ঢের বন্ধু সুড়ুৎ করে এসট্যাবলিশমেন্টে ঢুকে পড়ে আপনাদের ডেকে বলেছে 'বেআদব'।... আইন ও মানবতার বিচারে আপনি মুক্তি পান এই কামনা করি। আমি আপনাকে প্রতিভাবান বলে মনে করি যে প্রতিভার অভাব চতুর্দিকে বড়ই প্রকাশিত।"[১০]

হাংরি আন্দোলনকারীদের লেখাকে অশ্লীল আখ্যা দেওয়া, বিশেষ করে 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' কবিতার বিরুদ্ধে অশ্লীলতার মামলা এনে মলয় রায়চৌধুরীর বিরুদ্ধে যে কেস করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ ষড়যন্ত্রমূলক একথাই উক্ত চিঠির প্রধান বক্তব্য। তরুণ সান্যাল মহাশয় 'অবধূত'-এর একটি লেখার কয়েকটি স্তবক তুলে এনে অশ্লীলতা সম্পর্কে অঙ্গুলি নর্দেশ করে দিচ্ছেন। 'অবধূত'-এর লেখা 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' থেকে অনেক বেশি অশ্লীল। আর তা যদি অশ্লীল না হয় তাহলে সাহিত্যে অশ্লীল-এর সংজ্ঞা কী ? তবে একথাও সত্য—

অনেকেই পুলিশি মামলার ভয়ে সরে গেলেও কিংবা হাংরি আন্দোলনকে অস্বীকার করলেও কয়েকজন যুবক হাংরি জেনারেশনকে শক্ত হাতে ধরে রেখেছিলেন— সেকথা স্বীকার করতেই হবে। এই আপোসহীন যুবকদের প্রধান মলয় রায়চৌধুরী, যাঁর দৃঢ় চিন্তার কাছে পুলিশের থার্ড ডিগ্রিও দুর্বল হয়ে যায়।

এগারো জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হবার পর সবাই নিজেদের মত মুচলেকা দিয়েছিলেন। কিন্তু মুচলেকাগুলো পড়লে প্রমাণ হয় না যে এঁরা সমর্থন করেন না। আসলে তাঁরা পুলিশি তৎপরতায় ভীত হয়ে নিজেদেরকে সাময়িক ভাবে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলেন। মুচলেকা-গুলো একে একে বিচার করে তার সত্যাসত্য উপলব্ধি আবশ্যক। যদিও মুচলেকা-গুলো ইংরেজিতে ছিল। মলয় রায়চৌধুরী মুচলেকা-গুলো বাংলায় অনুবাদ করে 'হাংরি কিংবদন্তী' গ্রন্থে প্রকাশ করেন। আমাদের সুবিধার জন্য বাংলা মুচলেকা-গুলো গ্রহণযোগ্য বলে মনে করি।

১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ২ সেপ্টেম্বর সুভাষ ঘোষ যে এজাহার সাব ইন্সপেক্টর ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের (S.I.D.D) হাতে তুলে দিয়েছিলেন তার সংক্ষিপ্ত নিম্নরূপ ঃ

"আমার নাম সুভাষ ঘোষ। গত এক বৎসর যাবৎ আমি কলেজ স্ট্রীট কফিহাউসে যাতায়াত করছি। সেখানে আমার সঙ্গে একদিন হাংরি আন্দোলনের উদ্ভাবক মলয় রায়চৌধুরীর পরিচয় হয়। সে আমার কাছ থেকে একটা লেখা চায়। হাংরি জেনারেশন বুলেটিনের খবর আমি জানি বটে কিন্তু হাংরি আন্দোলনের যে ঠিক কি উদ্দেশ্য তা আমি জানি না। আমি তাকে আমার একটা লেখা দিই যা দেবী রায় সম্পাদিত হাংরি জেনারেশন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।... আমি এই ধরনের আন্দোলনের সঙ্গে কখনও নিজেকে জড়াতে চাইনি যা আমার মতে খারাপ। আমি ভাবতে পারি না যে এরকম একটা পত্রিকায় আমার আর্টিকেল 'হাঁসেদের প্রতি' প্রকাশিত হবে। আমি হাংরি আন্দলনের আদর্শে বিশ্বাস করি না, আর এই লেখাটা প্রকাশ হবার পর আমি ওদের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। ওরকম অশ্লীল রচনা লেখার অভিপ্রায় আমার নেই এবং ভবিষ্যতেও অমন লেখা আমি লিখবো না।"[১১]

শৈলেশ্বর ঘোষ ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের ২ তারিখ একটি এজাহার দেন, তার সংক্ষিপ্ত রূপ তথ্য হিসেবে তুলে ধরা হল ঃ

"আমার নাম শৈলেশ্বর ঘোষ। আমার জন্ম বগুড়ায় আর বড়ো হয়েছি বালুরঘাটে।... ১৯৬৩ সনে সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে একদিন কলেজ স্ট্রীট কফিহাউসে দেবী রায় ওরফে হারাধন ধাড়া নামে একজন তাঁর হাংরি জেনারেশন ম্যাগাজিনের জন্যে আমাকে লিখতে বলেন। তারপরেই আমি হাংরি আন্দোলনের লেখকদের সঙ্গে পরিচিত হই।... গত এপ্রিল মাসে একদিন কলেজ স্ট্রীটে কফিহাউসে মলয় রায়চৌধুরীর সঙ্গে আমার দেখা হয় এবং তিনি আমার কাছ থেকে কয়েকটা কবিতা চান।... আমি মলয় রায়চৌধুরীকে চিনি। তিনি হাংরি আন্দোলনের স্রষ্টা। হাংরি জেনারেশন ম্যাগাজিনে আমি মোটে দুবার কবিতা লিখেছি।... এটুকু ছাড়া হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে আমি আর কিছু জানিনা। অশ্লীল ভাষায় লেখা আমার আদর্শ

নয়।... বর্তমান সংখ্যা হাংরি বুলেটিনের প্রকাশনার পর, যা কিনা আমার অজান্তে ও বিনা অনুমতিতে ছাপা হয়, আমি এই সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছি।"[১২]

পবিত্র বল্লভ নামে একজন যুবক যে মিথ্যা এজাহারটি ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দের ৪ সেপ্টেম্বর তারিখ দাখিল করেন তার সংক্ষিপ্ত নমুনা উপস্থাপন করা গেল ঃ

"আমার নাম পবিত্র বল্লভ।... যে আদর্শ নিয়ে হাংরি আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল তা আমি গ্রহণ করেছিলুম কিন্তু বর্তমান সংখ্যাটি প্রকাশ হবার পর তাদের সঙ্গে আমি সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছি, কেননা তারা মূল ভাবনা থেকে ভ্রষ্ট। যতদূর মনে পড়ে বছর দুয়েক আগে ২ নং বা ৩ নং বুলেটিনে আলাদা হয়ে যাবার পর আমি কোনও লেখা দিইনি। আমি জানিনা কার পয়সায় পত্রিকাটা বেরোয় বা কোথায় তা ছাপা হয়। আমার মতে ওদের লেখাগুলো মানসিক বিকৃতির বহিঃপ্রকাশ আর ভাষা একেবারে ভালগার। আমি এই বুলেটিনের একটা কপি দেখতে পাই আর মলয়ের 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' কবিতাটার তীব্র ভর্ৎসনা করি। আমি মলয় রায়চৌধুরীর হাতের লেখা চিনি।"[১৩]

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি শক্তি চট্টোপাধ্যায় ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের দপ্তরে একটি এজাহার দাখিল করেন। এজাহারটির সংক্ষিপ্ত বাংলা নিম্নরূপ ঃ

"আমার নাম শক্তি চট্টোপাধ্যায়। আমার বয়স ৩১ বছর।... এটা সত্য যে এই সাহিত্য আন্দোলন আমি এবং কয়েকজন বন্ধুবান্ধব মিলে আরম্ভ করেছিলুম। যখন বুঝতে পারলুম যে ওরা মূল ভাবনা থেকে ভ্রষ্ট তখন আমি ওদের সঙ্গে সবরকম সম্পর্ক ত্যাগ করেছি। আমি হাংরি জেনারেশন নামে একটা বুকলেট দেখেছি যাতে আমার নাম প্রকাশক হিসেবে ছাপা হয়েছে। তথাকথিত হাংরি জেনারেশনের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক ছিল না এবং এই বইটি আমি প্রকাশ করিনি।... আমার মতে মলয়ের লেখাগুলি তার মানসিক বিকৃতির বহিঃপ্রকাশ। তার ভাষা ভালগার। আমি এই বুকলেটের কপি দেখা মাত্র মলয় রায়চৌধুরীর কবিতা 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার'-কে তীব্র নিন্দা করেছি।"[১৪]

সমীর বসু ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি যে এজাহার উপস্থাপন করেন, তার সংক্ষিপ্ত পাঠযোগ্য হিসেবে দেখা আবশ্যক ঃ

"...আমি হাংরি আন্দোলনের শরিক শক্তি চট্টোপাধ্যায় উৎপলকুমার বসু মলয় রায়চৌধুরী এবং সমীর রায়চৌধুরীকে জানি।... আমার মতে তাদের রচনাগুলি মানসিক বিকৃতির বহিঃপ্রকাশ এবং তাদের ভাষা ভালগার।... আমাকেও বলা হয়েছিল হাংরি সংকলনে লেখা দেবার জন্যে, কিন্তু আমি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলুম। কফিহাউসে ওরা যেসব ম্যানিফেস্টো বিলি করতো তার কয়েকটা আমি দেখেছি। বর্তমান সংকলনটা মলয় রায়চৌধুরীর দেখাশোনায় তৈরী। লেখা দেবার জন্যে কফিহাউসে বিভিন্ন লেখকদের সে অনুরোধ করতো সেটা আমি দেখেছি। এই সংকলনটা নজরে পড়ার পর আমি তৎক্ষণাৎ মলয় রায়চৌধুরীর কবিতা 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার'-এর তীব্র ভর্ৎসনা করেছি। আমি মনে করি সাহিত্যের নামে এরকম অশ্লীলতাকে এক্ষুনি নির্মূল করা উচিত।"[১৫]

সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ও ডিটেকটিভ বিভাগে মুচলেকা দাখিল করেন। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ মার্চ তিনি যে বয়ান দিয়েছিলেন তার খানিকটা উপস্থাপন করা যেতে পারে ঃ

"...সমীর রায়চৌধুরী আমার ব্যক্তিগত বন্ধু। হাংরি আন্দোলনের শরিক শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মলয় রায়চৌধুরী ও আরো অনেকের সঙ্গে আমি পরিচিত হই। যদিও হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে আমার সংশ্রব সরাসরি নয় তবু এই আন্দোলন সম্পর্কে আমার আগ্রহ ছিল। কোনো কোনো হাংরি বুলেটিনে আমার সাহিত্যকৃতির বিজ্ঞাপন আছে। একটি সংকলনে আমার নাম প্রকাশক হিসেবে ছাপা হয়েছে। এ কাজটা বোধহয় আমার খ্যাতিকে ব্যবহার করার জন্যে। কিন্তু যেহেতু আগে থাকতে আমার অনুমতি নেয়া হয়নি আমি এ কাজের তীব্র প্রতিবাদ করেছি। বর্তমান সংকলনটিও আমার নজরে পড়েছে। একজন কবি হিসেবে আমি মলয় রায়চৌধুরীর কবিতা 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার'-এর থিম এবং ভাষাকে অনুমোদন করি না। হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে সমস্ত রকম সম্পর্ক আমি ছিন্ন করেছি।"[১৬]

৩১ মার্চ ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দে প্রদীপ চৌধুরী যে মুচলেকাটি সাব-ইন্সপেক্টর ডিটেকেটিভ ডিপার্টমেন্টের দপ্তরে উপস্থাপন করেন তার আংশিক বাংলা রূপ আমাদের গবেষণা সন্দর্ভে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হল ঃ

"আমার নাম প্রদীপ চৌধুরী।... ১৯৬৩ নাগাদ যখন আমি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম, হাংরি জেনারেশন নামের এই প্রকাশনার সংস্পর্শে আসি। ওই বুকলেটে 'বাবা আমার বর্বরতা' নামে আমি কবিতা লিখেছিলাম।... আমি হাংরি আন্দোলনকে একটি নান্দনিক বিপ্লব বলে মনে করেছিলাম এবং সেই জন্যে শান্তিনিকেতনে যখন ফিলজফি কংগ্রেস হয় তখন সেখানে আমি এ-বিষয়ে বক্তব্য রেখেছিলাম।... এপ্রিল ১৯৬৪ তে একদিন শৈলেশ্বর ঘোষ আর সুভাষ ঘোষ আমার পান্থ নিবাসের বাসায় এসে জানান যে মলয় রায়চৌধুরীর পৃষ্ঠপোষকতায় আরেকটি পুস্তিকা শীঘ্রই প্রকাশিত হবে যাতে সুবো আচার্য এবং আরও অনেকে লেখা দিচ্ছেন। আমার নিজেরও আগ্রহ ছিল, কেননা আমার একটি কবিতা তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।... তাইজন্যে আমি ওদের ৫৮ কৈলাস বোস স্ট্রীটের মহেন্দ্র প্রেসের ধনঞ্জয় সামন্তের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, কেননা ওই প্রেস থেকে 'স্বকাল' নামে একটি সংকলন এর আগে আমি ছাপিয়েছিলাম বলে ওনাকে চিনতাম। ধনঞ্জয় সামন্ত ৩০০ কপি ছাপাতে রাজি হন এবং আগাম টাকা ও পাণ্ডুলিপি গ্রহণ করেন। শৈলেশ্বর ও সুভাষের সঙ্গে প্রেসে বসে প্রুফ দেখে দিই। ছাপাবার খরচ ঠিক কে দিয়েছিল আমি জানি না। প্রেস থেকে পুস্তিকাগুলি নিয়ে আমি পান্থ নিবাসের আস্থানায় রাখি। সেদিন সন্ধ্যায় শৈলেশ্বর ও সুভাষ আমার বাসায় আসে এবং আমরা কিছু পুস্তিকা বিনা পয়সায় কফিহাউসে উপস্থিত সবায়ের মধ্যে বিলি করি। সমীর রায়চৌধুরীকে তাঁর চাইবাসার ঠিকানায় তক্ষুনি এক কপি পাঠিয়ে দিই। ১৯৬৪ সনের জুলাই মাসে কলকাতা ত্যাগ করি। আমি মলয় রায়চৌধুরীর হাতের লেখা চিনি।"[১৭]

উৎপলকুমার বসু ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ৪ মে তারিখ যে এজাহারটি দাখিল করেন তার সংক্ষিপ্ত নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল ঃ

"১৯৬২ সনে বা তার কাছাকাছি কোনও এক সময়ে হাংরি পুস্তিকা আমার নজরে পড়ে। আমি সাহিত্য আন্দোলনে আগ্রহী ছিলাম। পরে আমি মলয় রায়চৌধুরীর সঙ্গে পরিচিত হই যদিও তার বড়ো ভাই সমীর রায়চৌধুরীকে আমি আগে থাকতেই চিনতাম। কলেজ স্ট্রীট কফিহাউস এই আন্দোলনকারীদের আড্ডা মারার জায়গা। কিছুকালের মধ্যে হাংরি আন্দোলনের অন্যান্য শরিক যেমন শৈলেশ্বর সুভাষ দেবী রায় ওরফে হারাধন ধাড়ার সঙ্গে পরিচয় হয়। তাদের অনুরোধে বিভিন্ন সময়ে হাংরি-পুস্তিকায় গদ্য ও কবিতা লিখেছি। কোথা থেকে সেগুলি ছাপানো হতো আর কে তার খরচ যোগাতো তা আমি জানিনা। ১৯৬৪ সনে গ্রীষ্মে মলয় পাটনা থেকে কলকাতা আসে ও আমাকে প্রকাশিতব্য পুস্তিকার জন্যে লেখা দিতে বলে।... আমার মতে মলয় রায়চৌধুরীর লেখায় নিদারুণ বিরক্তি ও অসম্ভাব্যতার উপলব্ধি থাকে। আমি মনে করি তাদের সাহিত্য আন্দোলন নৈতিকভাবে কলুষিত হয়ে গেছে এবং আমি হাংরি আন্দোলন থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়েছি। মলয়ের হাতের লেখা দেখার সুযোগ আমার হয়েছে।"[১৮]

আইনের শক্তিশেল থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য আরও যাঁরা মুচলেকা দেন তাঁদের প্রধানদের মধ্যে মলয় রায়চৌধুরীর দাদা সমীর রায়চৌধুরী অন্যতম। একমাত্র সুবিমল বসাক এবং দেবী রায় কোনো মুচলেকা দেননি।

হাংরি আন্দোলনকারীদের অ্যারেস্টের খবর রাতারাতি কলকাতা ছড়িয়ে পড়ে। এই সংবাদ ঘটা করে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সমস্ত হিন্দি, বাংলা, ইংরেজি পত্রিকায় ছাপা হয়। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কয়েকটি পত্রিকাতেও এঁদের গ্রেপতারের খবর রটে যায়। এমন কি ভারতের বাইরেও হাংরি আন্দোলনকারীদের অ্যারেস্টের বার্তা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ পাওয়ার ফলে আন্দোলনের সফলতা প্রচারমুখী হয়ে ওঠে। কিন্তু হাংরি লেখকরা যাতে কালের চাপে হারিয়ে যায় সেই চেষ্টায় কলকাতার প্রাতিষ্ঠানিক পোষ্য সাহিত্যিকরা এঁদের লেখাকে অসাহিত্যিক এবং পর্ণোগ্রাফি বলে প্রচার করতে উঠে পড়ে লাগলেন। ভয় ও লোভ দেখিয়ে কিছু হাংরি শরিককে প্রতিষ্ঠানের বিশাল খোঁয়াড়ে এনে তাঁদেরকে দিয়ে হাংরি আন্দোলনের কুৎসা রটাতে তৎপর হলেন। পঞ্চাশের কবি-সাহিত্যিকরা বিভিন্ন দিক থেকে চাপের ফলে আগেই সরে পড়েছেন।

চারদিক থেকে যখন হাংরি আন্দোলন নিয়ে মাতামাতি চলছে তখন বাংলা সাহিত্যের দিক্‌পালরা নীরব ভালো মানুষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে মজা দেখছিলেন। সেই তালিকায় রয়েছেন— ড° সুকুমার সেন, ড° অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ড° দেবীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, ড° উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, ড° ক্ষেত্র গুপ্ত, ড° হরপ্রসাদ মিত্র, ড° ভবতোষ দত্ত, ড° নরেশ গুহ, ড° পবিত্র সরকার, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায় প্রমুখ। বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে-রা হাংরি কবি-সাহিত্যিকদেরকে অশিক্ষিত বলে মনে করতেন। শঙ্খ ঘোষ হাংরি আন্দোলনকারীদের লেখা না ছাপানোর জন্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার সম্পাদকদেরকে বাড়িতে গিয়ে ভয় দেখিয়ে আসতেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ও হাংরি আন্দোলন নামক বাংলা সাহিত্যে পালাবদলকারীদের বিপক্ষে ছিলেন। তবে হাংরি আন্দোলনকারীদের প্রয়োজনে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন অনেকে। আর্থিক ভাবে সাহায্য করেছিলেন অশোক মিত্র। কবি অজিত

দত্ত পুত্র সত্রাজিৎ দত্ত মারফত টাকা পাঠিয়ে সহযোগিতা করেন। কমলকুমার মজুমদার একশত টাকার নোট মলয় রায়চৌধুরীর হাতে গুজে দিয়ে রেখে দেবার জন্য বলেছিলেন। জ্যোতি দত্ত বিভিন্নভাবে সাহায্য করেন। কেউ বা আর্থিকভাবে সাহায্যের হাত বাড়ান, কেউ বা সুপরামর্শ দিয়ে এগিয়ে আসেন, কেউ বা মনের সাহস বাড়িয়ে হাংরি আন্দোলন নামক পালাবদলের শরিক হন।

মকদ্দমা আদালতে চলতে লাগল। অপরাধী সাব্যস্ত হলে শাস্তি নির্ধারিত হবে। তারিখ অনুযায়ী আসা যাওয়া চলতে লাগল। তারিখের পর তারিখ। তবুও ডেপুটি কমিশনারের অফিসে মলয় রায়চৌধুরীকে প্রত্যহ হাজিরা দিতে হয়। অনুসন্ধান শেষ হয়নি বলে পুলিশ কোর্ট থেকে সময় চেয়ে নেয়। মলয় রায়চৌধুরীর খরচ বেড়ে চলে। থাকার জায়গার অভাব দেখা দেয়। চলতে থাকে পুলিশের হেনস্তা। টিটকিরি। আজে-বাজে কথা। ভয় দেখানো নিত্য ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। তবে যখনই জেরা চলে সঙ্গে থাকেন উকিল সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়। লালবাজার পুলিশ কমিশনারের কনফারেন্স রুমে ইনভেস্টিগেটিং-এর একটি বিশেষ দল একদিন মলয় রায়চৌধুরী এবং সমীর রায়চৌধুরীকে কয়েক ঘণ্টা জেরা করে। এই বিশেষ দলটি গঠন করা হয়েছিল— পুলিশ স্বরাষ্ট্র দপ্তর, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগ এবং সেনাবাহিনীর আধিকারিকদের নিয়ে।

এদিকে সুবো আচার্য ভয়ে কলকাতা ছেড়ে পালিয়েছেন। মামলা হওয়ার সময় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বিষ্ণু-পুরেই ছিলেন, আর ফেরেন নি। বাসুদেব দাশগুপ্ত কোর্টে এলে দেখা হয় মলয় রায়চৌধুরীর সঙ্গে। সুবিমল বসাক প্রহৃত হন। শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় ইচ্ছে করে মলয় রায়চৌধুরীর বিরোধীতা করেন। লালবাজার প্রেস সেকশনে মলয় রায়চৌধুরীর সঙ্গে এঁদের দুজনের সাক্ষাৎ হলে না দেখার ভান করে চলে যান। মলয় রায়চৌধুরীর বন্ধুরা বিপদের সময় আর খবর নেন না। মলয় রায়চৌধুরীর সঙ্গে সব সময় দেখা সাক্ষাৎ করেন তাঁর কাকাবাবুর শালা বুড়ো, পিসতুতো ভাই সেন্টুদা। মলয় রায়চৌধুরীর বাবা, জ্যাঠামশায়, পিসেমশায় প্রমুখরা এসে কোর্টের তারিখে সাহস যোগান। একদিনের জন্য বেনারস থেকে অনিল করঞ্জাই এবং করুণানিধান মুখোপাধ্যায় এসে একটু মুখরোচক কথা বলে খানিকটা শক্তি সংগ্রহ করে যান। সুবিমল বসাক সব সময় মলয় রায়চৌধুরীর সঙ্গেই থাকেন। ত্রিদিব মিত্র এবং আলো মিত্র কেসের তারিখে আসেন এবং নানা সময় মলয় রায়চৌধুরীর খোঁজ-খবর নিয়ে পাশে থাকেন, উকিলদের সঙ্গে কথা বলেন, মুহুরিদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁরা কোর্টে উকিলদের জেরা এবং সাক্ষীদের কথা হুবহু ডায়েরি করে রাখতেন। সুবিমল বসাক সর্টহ্যাণ্ড (Steno) জানতেন বলে তাঁর পক্ষে ডায়েরি করা সুবিধা ছিল।

কলকাতা ব্যাংকশাল কোর্টের অবস্থা জরাজীর্ণ। সমস্ত আদালতটার দেয়ালে বহু বছর কোনো রঙ করা হয়নি। তেরো-চোদ্দোটি কোঠায় প্রত্যহ বিচার চলে। অসংখ্য ধরনের কেস। মানুষে গিজ্‌গিজ্। মলয় রায়চৌধুরী নিজেকে আত্মসমর্পণ করার পর জামিনের বিচার হয়েছিল এক নম্বর এজলাসে। পথ চলতে গেলে ঠেলে ঠেলে এগোতে হয়। এখন তেরো-চোদ্দোটি বিচার ঘরের মধ্যে মলয় রায়চৌধুরীর মকদ্দমা নয়-নম্বর ঘরে। জানালাহীন ঘর। একটি অল্প আলো বাল্ব জ্বলে থাকে সেই ঘরে। বোধ-হয় বিশ বছর যাবৎ মাকড়সার জাল পরিষ্কার করা হয় নি।

লম্বা রডের মধ্যে ঝুলে আছে একটি বৃদ্ধ ছাদপাখা। কর্কশ কট্ কট্ বিষময় শব্দ। বিচারক অমল মিত্রের পেছন দিকে দেয়ালে টাঙানো রয়েছে হাসি-মুখ করা মহাত্মা গান্ধীর রঙীন ছবি। তখন পেশকার ছিলেন গাঙ্গুলী বাবু। পেশকারের টেবিলের সঙ্গে লাগানো রয়েছে বিচারকের মস্ত টেবিল। যারা জামিন পায়নি তাদের জন্য বিচারকের ডান পাশে একটি লোহার শেকলের খাঁচা রয়েছে। মলয় রায়চৌধুরী বলছেন— "খাঁচাটা অত্যন্ত নোংরা। আমি যেহেতু ছিলাম জামিনপ্রাপ্ত, দাঁড়াতুম খাঁচার বাইরে। ঠ্যাং ব্যথা করলে, খাঁচায় পিঠ ঠেকিয়ে।"[১৯]

পেসকারের সামনে হাতল থাকা কয়েকটা কাঠের চেয়ার। এই চেয়ার গুলোতে উকিলরা বসেন। জনসাধারণের জন্য রয়েছে কয়েকটা কাঠের বেঞ্চ। ছারপোকা আর ছোটো ছোটো আরশোলায় ভরা বেঞ্চগুলো। বেঞ্চগুলোর গায়ে এবং তার পাশের দেয়ালে ছারপোকার রক্ত, পানের পিক। কোনো মানুষই সেখানের বেঞ্চে বেশি সময় বসার ইচ্ছা বোধ করে না। ছারপোকার গোপন আক্রমণের ফলে মলয় রায়চৌধুরী কোর্টের এ-প্রান্ত ও-প্রান্ত টু-মেরে বেড়াতেন। কখনও দাঁড়িয়ে কৌতূহল বশত বাদী-প্রতিবাদীদের জেরা শুনতেন। মলয় রায়চৌধুরীর সিনিয়র উকিল চণ্ডীচরণ মৈত্রর ত্রিশ বছর বয়সী মুহুরি মশায় খেয়াল রাখতেন কখন কেস ওঠে। কেস ওঠার আগে মুহুরি-মশায় উকিল এবং মলয় রায়চৌধুরীকে খোঁজে নিয়ে আসতেন। তাঁর হাতে সব সময় নানান কেসের কাগজ ভাঁজ করা থাকে। এককে দিন অনেক গুলো কেস থাকার ফলে মুহুরি-মশায়কে একতলা, দোতলা, তিনতলা ছুটে বেড়াতে হয়।

শৈলেশ্বর ঘোষ এবং সুভাষ ঘোষ মলয় রায়চৌধুরীর বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী হয়েছিলেন। সমীর বসু এবং পবিত্র বল্লভ ভুয়ো রাজসাক্ষী দিতে এগিয়ে এসেছিলেন। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কোনো কেস না থাকা সত্ত্বেও তিনি স্বইচ্ছায় রাজসাক্ষী হয়েছিলেন। মলয় রায়চৌধুরীর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিলেন সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু মলয় রায়চৌধুরীর পক্ষে যাঁরা প্রধান সাক্ষী ছিলেন তাঁরা হলেন— জ্যোতির্ময় দত্ত, তরুণ সান্যাল, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং কবি অজিত দত্তের পুত্র মনস্তত্ত্ববিদ সত্রাজিৎ দত্ত প্রমুখ। তাছাড়া মলয় রায়চৌধুরীর পিসতুতো ভাই সেন্টুদা তাঁর পক্ষে সাক্ষী হয়েছিলেন।

কোর্টের বিচারে মলয় রায়চৌধুরীর ওপর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে দেওয়া হল। সেই সঙ্গে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ৩ মে তারিখ সবাইকে ছেড়ে দিয়ে মলয় রায়চৌধুরীর বিরুদ্ধে কেস শুরু হয় এই অভিযোগে যে, সাম্প্রতিকতম হাংরি বুলেটিনে প্রকাশিত 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' পদ্যটি অশ্লীল।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ও সরকারি সাক্ষী। তাঁকে দেখে সবাই হতবাক। শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে কেউই কেসে জড়ায়নি ; তবুও তিনি স্বইচ্ছায় সরকার পক্ষের সাক্ষীদার হন (তারিখ ২৪ জুন ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ)। সুবিমল বসাক মারফত জানা গেল সাক্ষী দেবার প্রতিদান স্বরূপ ভালো মাল হাতিয়ে নিয়েছেন তিনি। শক্তি চট্টোপাধ্যায় দুই বৎসর চাইবাসায় সমীর রায়চৌধুরীর আশ্রয়ে থেকে— মদ খাওয়ার পয়সা, প্রেমিকার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য খরচ, মাগিবাজি করার জন্য পয়সা ইত্যাদি নিয়েও মলয় রায়চৌধুরীর বিপক্ষে সাক্ষী দিলেন। সাহিত্য মহলে সবাই জানত

— শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু সমীর রায়চৌধুরী। শক্তি চট্টোপাধ্যায় সমীরবাবুর শ্যালিকা শীলার প্রেমে মজে নিজের স্বার্থ আদায় করে কেটে পড়েন। শীলার প্রেমে মত্ত হয়ে তিনি অসংখ্য কবিতা লেখেন।

কোর্টে নতুন করে কেস শুরু হল। সাক্ষী চলতে লাগল। সরকার পক্ষের উকিল বীরবাবু (বীরুবাবু)। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ২৪ জুন শক্তি চট্টোপাধ্যায় কলকাতার ব্যাংকশাল কোর্টে উইটনেস বক্সে মলয় রায়চৌধুরীর বিপক্ষে সাক্ষী দিলেন। সাক্ষীর সংক্ষিপ্ত নমুনা নিম্নরূপ ঃ

"বীরবাবু ঃ আপনি তো হাংরি জেনারেশনের সঙ্গে প্রথম থেকে যুক্ত ছিলেন, তাই না ?

শক্তি চট্টোপাধ্যায় ঃ ছিলাম।

বীরবাবু ঃ কীভাবে ছিলেন ইয়োর অনারকে সেটা বুঝিয়ে বলুন তো।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় ঃ সমীরের ছোট ভাই মলয় ইংরেজি কবি চসার আর জার্মান ফিলোজফার অসওয়াল্ড স্পেংলারের আইডিয়া থেকে নন্দনতত্ত্ব দিয়েছিল। সেই আইডিয়া ফলো করে আমরা কয়েকজন মিলে আন্দোলনটা আরম্ভ করি।...

বীরবাবু ঃ কারা-কারা এই হাংরি জেনারেশন আন্দোলন আরম্ভ করেন ?

শক্তি চট্টোপাধ্যায় ঃ মলয় রায়চৌধুরী, ওর বড় ভাই সমীর রায়চৌধুরী, হারাধন ধাড়া, উৎপলকুমার বসু আর আমি। ছাপা-টাপার খরচ প্রথম থেকে ওরা দু'ভাই-ই দিয়েছে। পরে আরও অনেকে যোগ দিয়েছিলেন, তাঁদের নাম বলব কি ?

বীরবাবু ঃ তা আপনি যখন পায়োনিয়ারদের একজন তখন এই আন্দোলনের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখলেন না কেন ?

শক্তি চট্টোপাধ্যায় ঃ এমনিই।...

বীরবাবু ঃ কতদিন হল আপনি হাংরি জেনারেশনের সঙ্গে যুক্ত নন ?

শক্তি চট্টোপাধ্যায় ঃ প্রায় দেড় বছর।...

বীরবাবু ঃ 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' কবিতাটা পড়েছেন কি ?

শক্তি চট্টোপাধ্যায় ঃ হ্যাঁ, কবিতাটা আমি পড়েছি।

বীরবাবু ঃ পড়ে আপনার কী মনে হয়েছে ?

শক্তি চট্টোপাধ্যায় ঃ ভালো লাগেনি।"[২০]...

শক্তি চট্টোপাধ্যায় সরকারী পক্ষের সাক্ষী হবার ফলে সামান্য কয়েকটি টাকা বক্‌শিস পেলেন। মাত্র কয়েকটি টাকার জন্য তিনি নির্দ্বিধায় কোর্টে বলতে এলেন, মলয় রায়চৌধুরীর 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' কবিতাটি 'অশ্লীল'। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের জবানবন্দি শোনার পর মলয় রায়চৌধুরী ঘৃণায় দুঃখে অন্তরে অন্তরে বেইমান, লোভী, ডাকাত ইত্যাদি আখ্যা দিতে লাগলেন। তারপর অন্য একজন সাক্ষীদার উপস্থিত হলেন। এভাবে এক-এক করে সাক্ষী উপস্থিত হয়ে নিজেদের মনগড়া বক্তব্য কোর্টে বিচারকের সামনে নির্ভয়ে বলে গেলেন। অবশেষে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জুলাই তারিখ সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় উইটনেস বক্সে দাঁড়িয়ে সাক্ষী দিলেন। তিনি সাত নম্বর সাক্ষী। শ্রী পশুপতি চট্টোপাধ্যায় হাজির হও। তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ও জেরা হল ঃ

"পেশকার : বলুন, যা বলব সত্য বলব, সত্য বৈ মিথ্যা বলব না, কিছু গোপন করব না।

পশুপতি চট্টোপাধ্যায় : যা বলব সত্য বলব, সত্য বৈ মিথ্যা বলব না, কিছু গোপন করব না।

পি এম : নাম বলুন।

পশুপতি চট্টোপাধ্যায় : সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়।

পি পি : আপনার এই নাম আসল ?

পশুপতি চট্টোপাধ্যায় : সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় নামে আমি লিখি। আমার নাম পশুপতি চ্যাটার্জি।...

পি পি : এই ভদ্রলোককে চেনেন ?

পশুপতি চট্টোপাধ্যায় : হ্যাঁ, মলয়কে তো ?...

পি পি : আচ্ছা দেখুন তো, মলয় রায়চৌধুরীর লেখা এই 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' কবিতাটি কি আপনি পড়েছেন ?

পশুপতি চট্টোপাধ্যায় : হ্যাঁ, পড়েছি। ...

পি. এম : আপনি কি লেখাটাকে 'ইমমরাল' বলবেন ?

পশুপতি চট্টোপাধ্যায় : আমি মনে করি সাহিত্যে ওসব প্রযোজ্য নয়।"[২১]

মলয় রায়চৌধুরীর বিরুদ্ধে আদালতে কেস চলার ফলে তিনি চাকরি থেকে বরখাস্ত হয়েছেন। তাই সামান্য পয়সা পকেটে নিয়ে তিনি কখনও কলকাতা, কখনও চাইবাসা, কখনও বন্ধুদের মেসে হাহুতাশ করে বেড়াতেন। মনের মধ্যে সুখ নেই। কিন্তু লেখা বন্ধ হয়নি। বিদেশি সমর্থকদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ আরও বেড়ে গেল। মাঝে মাঝে চিঠি লেখেন। চিঠির উত্তর আসে। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পত্র-পত্রিকা আসতে থাকে। অনেকের কাছেই মলয় রায়চৌধুরী এখন পরিচিত নাম। কিন্তু এক শ্রেণির বুদ্ধিজীবীদের চরিত্রগত দোষ স্বরূপ নিন্দা-সমালোচনা থেকে তাঁরা বিরত থাকতে চান না। তবে সুহৃদের সংখ্যাও যে অনেক বাড়তে থাকে। নিরীহ ও ভীরু বলে সামনা-সামনি সাপোর্ট করতে সাহস পেতেন না পক্ষপাতিরা। তবুও যার ওপর তুফান আসে, অশ্লীলতার অভিযোগ চাপে, কোর্টের টানা হেঁচড়া চলে, সাক্ষীর কাছে ঘোঙ্গট পরে শুভ প্রার্থনা করতে হয়— সে মানুষটি কি সুখে থাকতে পারে ? আবার সাক্ষীরা কাঠগড়ায় দাঁড়ায়। মিথ্যা সাক্ষী দেয়। তারিখ বাড়ে। আইনের দুর্ব্যবহার হয়। বীরবাবু একদিন মিথ্যা সাক্ষী বানিয়ে সমীর বসু নামক একজন যুবককে, উপস্থিত করলেন কোর্টে যাকে মলয় রায়চৌধুরী কখনও দেখেননি বলে জানান। পেসকার গাঙ্গুলীবাবু তাঁর ডিউটি আরম্ভ করলেন ; পক্ষ-বিপক্ষের আইনি কথা শুরু হল :

"বীরুবাবু : নাম বলুন। কোথায় থাকেন ?

সমীর বসু : শ্রী সমীর বসু, ৫/এ মতিলাল শীল লেন।...

বীরুবাবু : আপনি আসামি মলয় রায়চৌধুরীকে চেনেন ?

সমীর বসু : হ্যাঁ, উনিই মলয় রায়চৌধুরী, হাংরি জেনারেশনের প্রতিষ্ঠাতা। কফি হাউসে অনেকবার দেখেছি।...

বীরুবাবু : এই হাংরি জেনারেশনের সঙ্গে উনি, মানে আসামি, যুক্ত আছেন কি না, জানেন কিছু ?

সমীর বসু	ঃ	হ্যাঁ উনি ম্যানেজমেন্ট, ফাইনানসিং, এডিটিং ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত।...
বীরুবাবু	ঃ	আচ্ছা দেখুন তো, এই লিফলেটটা বিলি করা হয়েছিল কি না, যাতে 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' নামের কবিতাটি রয়েছে।
বিচারক	ঃ	কী ? কবিতা ?
বীরুবাবু	ঃ	আজ্ঞে স্যার, 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' মেটেরিয়াল একজিবিট নাম্বার ওয়ান। আচ্ছা, সমীরবাবু এটা পড়ে আপনার কী মনে হয়েছিল ?
সমীর বসু	ঃ	এটাকে আমার একটা অশ্লীলতম লেখা মনে হয়েছে, আর সাহিত্যই হয়নি।"[২২]

মলয় রায়চৌধুরীর উকিল সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায় অনেকক্ষণ ধরে সমীর বসুকে জেরা করলেন। জেরার ঘাতক মারপ্যাঁচে সমীরবাবুর নাজেহাল অবস্থা। মিথ্যা সব ঝরঝরে পরিষ্কার প্রকাশমান হয়ে উঠেছে। কথার মিছরি ছুরির ঝনৎকার উপস্থিত সদাশয়রা উপভোগ করতে করতে হাসিতে ফেটে পড়ছিলেন। বিচারক অমল মিত্র বারবার কাঠের হাতুড়ি পিটে চুপ করাবার জন্য ব্যস্ততা দেখাতে লাগলেন। বীরুবাবু এবং গাঙ্গুলীবাবু নির্বাক পাংশু মুখে চিন্তিত হয়ে সত্যেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেরা গুলো শুনছিলেন। কাঠগড়া থেকে সমীর বসু বেরোতেই মলয় রায়চৌধুরীর আত্মীয় ছোট কাকার শালা বুড়ো এবং পিসেমশায়ের বড় ছেলে সেণ্টুদা তাঁকে পাকড়াও করতে গেলে ভিড়ের মধ্যে কোথায় বিলীন হয়ে গেলেন।

মক্কেলরা ভুয়ো সাক্ষী দেয়, কিন্তু সরকার পক্ষের ভুয়ো সাক্ষী দেখে মলয় রায়চৌধুরীর উকিল চণ্ডীবাবু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। একেবারে পাকা সাক্ষী। ত্রিদিব মিত্র আশ্বাস দিয়ে বললেন— ভুয়ো সাক্ষী দিয়ে কেস জেতা সহজ হবে না ; এখন পর্যন্ত তেমন নজির নেই। বুড়ো এবং সেণ্টুদা একদিন ৫/এ মতিলাল শীল লেনে গিয়ে খোঁজ খবর নিয়ে জানলেন, উক্ত ঠিকানায় সমীর বসু নামে কেউ নেই। কফি হাউসেও সমীর বসুকে কেউ চেনে না।

মলয় রায়চৌধুরী কোর্টে যেতে যেতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন। সাড়ে ন'মাসের ছুটাছুটি, অপমান, হেনস্তা, টানাহেঁচড়া, ইত্যাদির মধ্যে অনেকের সঙ্গে পরিচয় ও আলাপ গাঢ় হয়ে উঠল। ডাকাতরাও এখন মলয় রায়চৌধুরীকে ভালো বাসে। ২৪ জুন কেস ছিল দু'নম্বর ঘরে। তখন খাঁচার ভেতর থেকে একজন রুক্ষ চেহারার ডাকাত মলয় রায়চৌধুরীকে বলল— ভয় না পেয়ে লিখে যাবার জন্য। এর থেকে বোঝা যায় ডাকাতটিও 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' পড়ে মোহিত হয়েছিল।

ঈশ্বরের নামে শপথ করে সবাই কোর্টে মিথ্যা বলে। সত্য-মিথ্যার লড়াইতে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের দুপুর বেলা উইটনেস বক্সে সাক্ষী দিতে উপস্থিত হলেন উৎপলকুমার বসু। সাক্ষীর সংক্ষিপ্ত বয়ান নিম্নরূপ ঃ

"...বীরুবাবু	ঃ	আপনি হাংরি জেনারেশনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ?
উৎপলকুমার বসু	ঃ	হ্যাঁ, আমি এই আন্দোলনের একজন কবি। আমি এতে লেখেওছি।
বীরুবাবু	ঃ	হাংরি জেনারেশন কাগজে এখনও কি লেখেন ?

উৎপলকুমার বসু	ঃ	আর তো বেরোয়নি। লিখব কী করে ?...
বীরুবাবু	ঃ	মলয়বাবুর 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' কবিতাটি আপনি দেখেছেন ? পড়েছেন ?...
উৎপলকুমার বসু	ঃ	এটা আমার সম্পূর্ণ নতুন ধরনের কবিতা মনে হয়েছিল। এক্সপেরিমেন্টাল। তাছাড়া এটা অ্যাংগুইশড ও অ্যাংরি ধরনের লেখা। হাংরি লেখা।
বিচারক অমল মিত্র	ঃ	অ্যাংরি ? অ্যাংগুইশড ?
উৎপলকুমার বসু	ঃ	উত্তেজনা ধরে রাখার কবিতা। যেন একটা নাগরিক টেনশানের মাঝে লেখা।...
সত্যেনবাবু	ঃ	সেগুলো পড়ে আপনার কী মনে হয়েছে ? এই লেখাগুলোকে কি সাহিত্য বলা হবে ?
উৎপলকুমার বসু	ঃ	এতে যে লেখাগুলো বেরিয়েছে তা নিরীক্ষামূলক। বাংলাদেশে ঠিক এই সময়ে সাহিত্য নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, তা এঁরাই আরম্ভ করেছেন, আর তাতে বাংলা-সাহিত্য যথেষ্ট লাভবান হয়েছে।"[২৩]

চোদ্দো জুলাই তারিখ কোর্টে মলয় রায়চৌধুরীর সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন ত্রিদিব মিত্র ও আলো মিত্র, তাঁর বড় জ্যাঠা, বাবা এবং পিসেমশায়। বিপক্ষের লোক হিসেবে সুভাষ ঘোষ সেদিন সাক্ষীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শৈলেশ্বর ঘোষ। সুবিমল বসাক কোর্টের নির্ধারিত দিনে প্রত্যক্ষ থেকে সবার সাক্ষী ও জেরা ডায়েরি করে রাখতেন।

হাংরি আন্দোলন মামলায় ইনভেস্টিগেটিং অফিসার হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন কালীকিঙ্কর দাস। তাঁর সাক্ষী ও জেরা সংক্ষিপ্ত জেনে নেওয়া যাক ঃ

"...কা. কি. দাস	ঃ	হ্যাঁ, আমি ইনভেস্টিগেশন আরম্ভ করে বুকলেটটা পাই।
পি. এম.	ঃ	বুকলেটটার নাম কী ?
কা. কি. দাস	ঃ	আজ্ঞে, 'হাংরি জেনারেশন'।
পি. এম.	ঃ	কবে পেয়েছিলেন ?
কা. কি. দাস	ঃ	আগস্টে।
পি. এম.	ঃ	অন হোয়াট ডে আই ওয়ান্ট টু নো দি ডেট। দি এগজ্যাক্ট ডেট।
কা. কি. দাস	ঃ	আজ্ঞে মনে নেই।...
পি. পি.	ঃ	দেখুন তো, এটাই সেই কমপ্লেন্ট কি না ?
কা. কি. দাস	ঃ	হ্যাঁ, এটাই, এই তো ডেটেড ২.৯.৬৪ ...
সত্যেন বন্দ্যো	ঃ	সমস্ত বুকলেটটা পড়ে কোনও রিঅ্যাকশন হয়েছিল কি ?
কা. কি. দাস	ঃ	আই ক্যাননট এক্সপ্রেশ।
সত্যেন বন্দ্যো	ঃ	মলয় রায়চৌধুরীর কবিতাটা পড়ে কি রিঅ্যাকশন হয়েছিল ?
কা. কি. দাস	ঃ	অবসীন অ্যাণ্ড ভালগার।
সত্যেন বন্দ্যো	ঃ	আমি জানতে চাই রিঅ্যাকশন কি হল ?
কা. কি. দাস	ঃ	আমার কি ফিজিক্যাল রিঅ্যাকশন হয়েছিল তা এক্সপ্লেন বা এক্সপ্রেস করতে পারব না।"[২৪]

কোর্টের তারিখে উপস্থিতি, সাক্ষী ইত্যাদি শেষ হয়ে গেলে মলয় রায়চৌধুরী কখনও কলকাতা এখানে ওখানে থাকতেন, নইলে ট্রেন ধরে সোজা পাটনা বাড়িতে চলে আসতেন। পাটনায় মলয় রায়চৌধুরীদের বাড়ি একটি ঐতিহাসিক মহলে পরিণত হয়ে উঠেছিল তখন। যে কোনো সাহিত্যিক শিল্পী চিত্রকর পাটনায় এলেই মলয় রায়চৌধুরীর বাড়িতে উঠতেন। বিনা পয়সায় থাকা-খাওয়া ও জ্ঞানের খোরাক পেয়ে যেতেন। বিদেশি সাহিত্যিকরাও পাটনায় এলে মলয় রায়চৌধুরীদের বাড়িতে আশ্রয় নিতেন। বিটনিক সাহিত্যিকরাও তার ব্যতিক্রম নন। বেনারস থেকে নেপালে যাবার পথে এঁদের নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়ে উঠেছিল মলয় রায়চৌধুরীদের বাড়ি।

হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত জায়গা গুলো হল— হাওড়া, বহরমপুর, বর্ধমান, পাটনা, চাইবাসা, দুমকা, বেনারস, খালাসিটোলা, লালবাজার, কাঠমাণ্ডু, কলেজস্ট্রিট, ইত্যাদি। উল্লিখিত জায়গা গুলোতে মিশে রয়েছে হাংরি আন্দোলনকারীদের নিত্য দিনের দৌরাত্ম্য। কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়, অনিল করঞ্জই, করুণানিধান মুখোপাধ্যায়, সুবিমল বসাক, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মলয় রায়চৌধুরী, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় প্রমুখরা নারী-মদ-মাংস-গাঁজা-চরস প্রায় সব কিছুর সঙ্গে সখ্যতা করেছিলেন। নিষিদ্ধ পল্লী থেকে শুরু করে বিভিন্ন দেশিয় গোরা ও নিগ্রো যুবতীদের সঙ্গে মিত্রতার সম্পর্ক গড়ে তুলতে দ্বিধাবোধ করেননি তাঁরা। এখানেই হাংরি আন্দোলনকারীদেরকে অনেকে নষ্টগামী আনাড়ির ভূমিকায় বিশ্লেষণ করতে সাহস পেয়েছেন।

আদালতের কেস তখনও শেষ হয়নি। একেক দিনে অনেক টাকা খরচ। সপক্ষে সাক্ষী উপস্থিত করতে এবং উকিলের ফিস ও নানান ফর্মালিটিস করে মলয় রায়চৌধুরী অর্থহীন প্রায়। তিনি নিজেকে নিঃস্ব মনে করেন। এরই মধ্যে তাঁর দাদা সমীর রায়চৌধুরীর বন্ধু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এবং সত্রাজিৎ দত্তকে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ২০ অক্টোবর উইটনেস বক্সে আনা হয়। এঁরা দুজনই মলয় রায়চৌধুরীর পক্ষে সাক্ষী দিলেন। পণ্ডিত ব্যক্তি হলেও আদালতের উইটনেস বক্সে দাঁড়িয়ে মনস্তত্ত্ববিদ সত্রাজিৎ দত্ত ভয়ে অনেক বক্তব্য গোলমান করে ফেললেন, তার খানিকটা আমাদের গবেষণা সন্দর্ভে তুলে ধরা হল ঃ

"... সত্যেনবাবু	ঃ	ডাজ রিডিং দিস পোয়েম অ্যাফেক্ট ইউ ইন এনি সাইকো-সোম্যাটিক ম্যানার?
সত্রাজিৎ দত্ত	ঃ	নো।
সত্যেনবাবু	ঃ	উড ইউ কনসিডার দিস পোয়েম অ্যাজ এ হোল অবসিন ?
সত্রাজিৎ দত্ত	ঃ	নো।
সত্যেনবাবু	ঃ	হোয়াই নট ?
সত্রাজিৎ দও	ঃ	বিকজ দিস পোয়েম ডাজ নট ইনছেম ইয়োর প্যাশন।
সত্যেনবাবু	ঃ	উড ইউ কনসিডার এনি পার্ট অর এনি স্ট্যানজা অর ওয়ার্ড অর এনি পার্টিকুলার এক্সপ্রেশন ইন দিস পোয়েম অবসিন ?
সত্রাজিৎ দত্ত	ঃ	নো। আই ডোণ্ট ফাউন্ড এনি।
সত্যেনবাবু	ঃ	মিস্টার ডাট, উড ইউ প্লিজ টেল আস অ্যাজ এ টিচার অব সায়কোলজি, হোয়াট উড বি দি সাইকোলজিকাল এফেক্ট অব দিস পোয়েম অন অ্যান অ্যাভারেজ নর্মাল মাইন্ড ?

সত্রাজিৎ দত্ত : টু অ্যান অ্যাভারেজ নর্মাল মাইন্ড ইট উড ক্রিয়েট নো অ্যাবনর্মাল সেনশেসন। মাইণ্ড, দিস পোয়েম মে স্টিমুলেট প্যাশন, বিকজ এ ডিপ্রেভড অ্যাণ্ড করাপ্ট মাইণ্ড মে বি স্টিমুলেটেড বাই এনি থিং।

সত্যেনবাবু : দ্যাটস অল।"[২৫]

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ২১ অক্টোবর তারিখ দুপুরের বিরতির পর সাক্ষী দিলেন মলয় রায়চৌধুরীর পিসতুতো ভাই সেণ্টুদা অর্থাৎ অজয়কুমার হালদার। ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ৫ নভেম্বর পরপর সাক্ষী হয় বুদ্ধদেব বসুর জামাই, বড় মেয়ে মীনাক্ষীর স্বামী জ্যোতির্ময় দত্ত, তরুণ সান্যাল এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-এর। উইটনেস বক্সে যাবার সঙ্গে সঙ্গে প্রেসকার গাঙ্গুলীবাবু লাল-সালুতে আবদ্ধ সেই ধর্মীয় বইটা সামনে মেলে ধরেন। গাঙ্গুলীবাবুর নির্দেশ মত হুবহু নকল করা কথা সকলকেই বলতে হয়। জ্যোতির্ময় দত্ত উইটনেস বক্সে উঠলেন। তিনি যা বললেন তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য আমাদের গবেষণা সন্দর্ভের তথ্য স্বরূপ :

"...জ্যোতির্ময় দত্ত : আমি একজন সমালোচক, এবং কবি। আমার লেখা স্বদেশে-বিদেশে প্রকাশিত হয়। আমি বিভিন্ন পত্রিকায় রিভিউ করে থাকি।

সত্যেনবাবু : মিস্টার দত্ত, এই কবিতাটা পড়ুন। ইয়োর অনার, এটা মেটেরিয়াল একজিবিট ওয়ান।... কবিতাটা সম্পূর্ণ পড়লেন ? আচ্ছা মিস্টার দত্ত, কবিতাটা পড়ার ফলে আপনার কোনো শারীরিক বৈলক্ষণ্য ঘটেছে কী ?

জ্যোতির্ময় দত্ত : না, বিন্দুমাত্র নয়।

সত্যেনবাবু : পড়ার পর কোনো সাইকো-সোম্যাটিক পরিবর্তন অনুভব করছেন ?

জ্যোতির্ময় দত্ত : না।

সত্যেনবাবু : কবিতাটা পড়ার ফলে মেন্টাল ডিপ্র্যাভিটি ঘটেনি ?

জ্যোতির্ময় দত্ত : আমি মনে করি ঘটে না।

সত্যেনবাবু : ফিজিক্যাল সেনশেসন হয় কি ?

জ্যোতির্ময় দত্ত : সামান্যতম নয়।...

সত্যেনবাবু : কবিতাটা কি আপনার অশ্লীল মনে হয় ?

জ্যোতির্ময় দত্ত : না। কবিতাটা অশ্লীল নয়।...

বীরবাবু : মিস্টার দত্ত, একজন কমন ম্যান কি কবিতাটা অশ্লীল বলবেন ?

জ্যোতির্ময় দত্ত : কই, আমার তো তা মনে হয় না।

বীরবাবু : কবিতাটা পড়ে আপনার কী মনে হল ?

জ্যোতির্ময় দত্ত : আমার তো বেশ ভালই মনে হল। কিছু কিছু লাইন তো বেশ সুন্দর।..."[২৬]

জ্যোতির্ময় দত্তর সাক্ষী দেওয়া হয়ে গেলে তরুণ সান্যাল উইটনেস বক্সে এসে শপথ নিয়ে সাক্ষী দিলেন। তারপর সমীর রায়চৌধুরীর বন্ধু সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় উইটনেস বক্সে এসে দাঁড়ালেন। তিনি মলয় রায়চৌধুরীর অনুরোধে সাক্ষী দিতে এসেছেন। মলয় রায়চৌধুরী আরও অনেক কবি-সাহিত্যিকদের অনুরোধ করেছিলেন তাঁর পক্ষে সাক্ষী দেবার জন্য, কিন্তু কেউ রাজি হলেন না।

মলয় রায়চৌধুরীর ওপর রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে দিয়ে ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ৩-মে তারিখ সবাইকে ছেড়ে দেওয়া হল। তারপর মলয় রায়চৌধুরীর বিরুদ্ধে কেস শুরু হল এই অভিযোগে যে, সাম্প্রতিকতম হাংরি জেনারেশন-এ প্রকাশিত 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' কবিতাটি অশ্লীল। পরবর্তীতে কোর্টে কারও সাক্ষী এবং জেরায় 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' কবিতাটিকে তেমন ভাবে অশ্লীল প্রমাণ করা যায়নি।

প্রশ্ন হচ্ছে— অশ্লীলতা বলতে কী বোঝায় ? সাহিত্যে কোথাও অশ্লীলতার সংজ্ঞা সম্পর্কে তেমন উপযুক্ত বিশ্লেষণ দেওয়া হয়নি। সাহিত্যে অশ্লীলতা সম্বন্ধে কোথাও ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই। অশ্লীলতা সম্বন্ধে ম্যাজিস্ট্রেট অমল মিত্রের সামনে মলয় রায়চৌধুরীর 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' সম্পর্কে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় যে মতামত দিলেন তার সংক্ষিপ্ত ভাষ্য আমাদের গবেষণা সন্দর্ভের অমূল্য তথ্য হিসেবে গ্রহণীয় ঃ

NABIN CHANDRA COLLEGE LIBRARY
BADARPUR KARIMGANJ

"... সত্যেনবাবু	ঃ	আপনি মলয়ের কবিতা পড়েছেন ?
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	ঃ	হ্যাঁ, অনেকবার।
বিচারক অমল মিত্র	ঃ	আরেকবার পড়ুন।
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	ঃ	জোরে-জোরে পড়ব, না মনে মনে ?
বিচারক অমল মিত্র	ঃ	না-না, মনে মনে।
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	ঃ	হ্যাঁ, পড়ে নিলুম।
সত্যেনবাবু	ঃ	পড়ে কি অশ্লীল মনে হচ্ছে ?
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	ঃ	কই, না তো। আমার তো বেশ ভালো লাগছে পড়ে। বেশ ভালো লিখেছে।
সত্যেনবাবু	ঃ	আপনার শরীরে বা মনে খারাপ কিছু ঘটছে ?
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	ঃ	না, তা কেন হবে ? কবিতা পড়লে সে-সব হয় না।
সত্যেনবাবু	ঃ	দ্যাটস অল ইয়োর অনার।"[২৭]

প্রধান সাক্ষীদের জেরার দিন অর্থাৎ সাক্ষীর শেষ দিন বলে অনেকেই এসেছেন। রক্ত সম্পর্কের মধ্যে মলয় রায়চৌধুরীর দাদা সমীর রায়চৌধুরী, তাঁর বাবা, পিসেমশাই, কাকাবাবু, বুড়ো, সেন্টুদা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। হাংরি আন্দোলনকারী এবং অন্যান্যদের মধ্যে সেদিন পাশে ছিলেন— সুবিমল বসাক, ফালগুনী রায়, ত্রিদিব মিত্র, আলো মিত্র, শরদ দেওড়া, বেনারস থেকে অনিল করঞ্জাই, করুণানিধান মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে।

সাক্ষীদের জেরা শেষ হয়ে যাওয়ার পর সকলে চলে গেলেও মলয় রায়চৌধুরীর যাওয়া হয়নি। তিনি মুহুরিদের সঙ্গে বসে সার্টিফায়েড কপি তোলার জন্য লেখালিখি এবং সহি করতে থেকে গেলেন। উকিলদের রেস্ট রুমে বসে মলয় রায়চৌধুরী 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' কবিতাটির ইংরেজি একটা নোট তৈরি করলেন, যাতে বিচারের দিন তার সারমর্ম ঠিকভাবে বিশ্লেষিত হয়। বিচারের অপেক্ষায় দিন যেতে লাগল। বিচারক অমল মিত্র সকল সাক্ষীকে পোস্টমর্টেম করে দেখে তাঁর মূল্যবান সিদ্ধান্ত দেবেন। আশ্চর্যের বিষয়— এতবড় কাণ্ড ঘটলেও

মলয় রায়চৌধুরীকে একবারও উইটনেস বক্সে দাঁড়াতে হয়নি। লাল-সালুতে মোড়া বইটাতে হাত রেখে ধর্মীয় বাক্য আওড়িয়ে শপথ নেওয়ার প্রয়োজন পড়েনি।

১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ২৩-মে তারিখ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট অমল মিত্রের বিচারালয়ে মলয় রায়চৌধুরীর বিরুদ্ধে কঠোরভাবে মকদ্দমা আরম্ভ হয়। মলয় রায়চৌধুরী নিরপরাধ তা প্রমাণ করার জন্য নতুন কেস শুরু হল। তিনি হাংরি আন্দোলনের গড ফাদার ; 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' কবিতাটি তাঁর লেখা এবং তা যে অশ্লীল নয় তাই প্রমাণ করা। কেস আরম্ভ হয়ে যাবার পর ৯.৬.১৯৬৫ ইংরেজি তারিখ থেকে বেশ কয়েকদিন চলল সমীর বসুর সাক্ষী। সাব-ইন্সপেক্টর কালীকিংকর দাস সাক্ষী দিলেন ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ ইংরেজি তারিখ। আরও অন্যান্য যাঁরা সাক্ষী দিলেন তাঁরা হলেন— পবিত্র বল্লভ, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, উৎপলকুমার বসু, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, সুভাষ ঘোষ, তারকনাথ সেন, শৈলেশ্বর ঘোষ, সাব-ইন্সপেক্টর সত্যেন্দ্রমোহন বারড়ি, এবং জমাদার দুজন। এভাবে সরকার পক্ষ থেকে চোদ্দোজনকে জেরা করা হয়। সরকার পক্ষের সাক্ষী চলে ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত।

মলয় রায়চৌধুরীর পক্ষে সত্রাজিৎ দত্ত সাক্ষী দেন ২০.১০.১৯৬৫ ইংরেজি তারিখ। তারপর মলয় রায়চৌধুরীর পিসতুতো দাদা অজয় হালদার সাক্ষী দেন ২১.১০.১৯৬৫ ইংরেজি তারিখ। জ্যোতির্ময় দত্ত সাক্ষী দেন ৫.১১.১৯৬৫ ইংরেজি তারিখ। অন্যান্যদের মধ্যে আরও যাঁরা সাক্ষী দেন তাঁরা হলে— সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, তরুণ সান্যাল প্রমুখ।

সরকারী পক্ষের উকিল হাংরি আন্দোলনকে বাংলা সাহিত্যে একটি কলঙ্কময় অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন। কবিতাটি অশ্লীল এবং ভালগার হিসেবে অনেকের সাক্ষ্যে নাকি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নব-প্রজন্ম এতে বুঝি বিপথগামী হচ্ছে। এক কথায় 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' কবিতাটি পর্ণোগ্রাফী পর্যায়ে ফেলা যেতে পারে বলে সরকারী উকিল মত পোষণ করেন। তাই এমন অপরাধীকে কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তি দেওয়া উচিত বলে সরকারী উকিল জানান।

টানা এক বৎসররেরও বেশি সময় বাদী-প্রতিবাদীর বক্তব্য শুনে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট অমল মিত্র ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ডিসেম্বর তারিখ মকদ্দমার ঐতিহাসিক রায় দিলেন। "অভিযুক্তের অপরাধ প্রমাণিত এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯২ ধারায় দণ্ডিত এবং সেই ধারা বলে তাকে ২০০ টাকা জরিমানা করা হল, অনাদায়ে এক মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে।"[২৮] দুঃখের বিষয়, কবিতা লিখে জরিমানা কিংবা জেল হাজত— এটা কোনো মতেই মেনে নেওয়া যায় না। কবিতা লিখে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯২ ধারা ভঙ্গ হয়ে থাকে এবং কবিতায় অশ্লীল অভিযোগ তুলে যে শাস্তি ধার্য হয়, তাকে চ্যালেঞ্জ জানাতে মলয় রায়চৌধুরী সিদ্ধান্ত নিলেন— এ-ব্যাপারে হাইকোর্টে পিটিশন দায়ের করবেন।

রিভিশন পিটিশন স্বরূপ মলয় রায়চৌধুরী হাইকোর্টে রেজিস্ট্রেশন করলেন ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দের ২ ফেব্রুয়ারি। উকিল হিসেবে নিযুক্ত করলেন— মৃগেন সেন, অঙ্গন ধর, করুণাশঙ্কর রায় এবং এ. কে. বসুকে। এখন অপেক্ষা রায় কবে বেরোয়। মলয় রায়চৌধুরী জেনেছেন, এই শুনানি এক বছরেও হতে পারে, দশ বছরেও হতে পারে। বেকার, অসহায়, মানসিকভাবে দুর্বল মলয় রায়চৌধুরীর পক্ষে হাইকোর্টে উকিলদের হাজার হাজার টাকা ফিস্ সংগ্রহ করা

শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। আশ্রয়হীন হওয়ার ফলে যেখানে সেখানে, এ-বাড়ি ও-বাড়ি রাত কাটাতে লাগলেন। দু'মুঠো খাবার জন্যও যেন পরমুখাপেক্ষি হয়ে উঠতে হয়েছে তাঁকে। সেই সময় অবশ্য সুভাষ ঘোষ প্রাত্যহিক আহারের জন্য একটি হোটেল ঠিক করে দেন।

হাংরি আন্দোলনে এক-সময় যুক্ত থাকা শরিকরা এখন মুক্ত। কিন্তু মলয় রায়চৌধুরীর মাথায় রয়েছে ভয়ের আকাশ। যে কোনো সময় সেই আকাশ ভেঙে পড়তে পারে। মলয় রায়চৌধুরীকে নিরাশ্রয় করে হাংরি আন্দোলনকারীরা অনেকেই এখন এসট্যাবলিশমেন্টে আশ্রয় নিয়েছেন। প্রায় সকলে আন্দোলনের মূল বৈশিষ্ট্য থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজের নিজের মতো করে পত্রিকা প্রকাশ ও লেখালেখিতে মগ্ন হয়ে পড়েন। সেই সময় বিদেশে হাংরি আন্দোলনকে নিয়ে প্রচুর লেখালেখি চলে। সংকলন প্রকাশ হয়। আমেরিকার কবি ক্যারল বার্জ 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার'-কে ইংরেজিতে অনুবাদ করে গ্রন্থের আকার দেন। সেই সঙ্গে নিউইয়র্ক শহরে সেইন্ট মার্কস গীর্জায় টিকিট করে মলয় রায়চৌধুরীর কবিতার পাঠ ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই টিকিট বিক্রির পয়সা মলয় রায়চৌধুরীকে তাঁরা পাঠিয়ে দিলে সেই টাকা তিনি হাইকোর্টের কেসে ব্যবহার করেন।

হাইকোর্টের নিয়ম অনুসারে পূর্ব তথ্য, নথি, বিভিন্ন বয়ান, অশ্লীলতা সম্বন্ধে ধারণা, কবিতার বক্তব্য অনুবাদ ইত্যাদি যথা সময়ে জমা দিলেন মলয় রায়চৌধুরী। উকিলরা তাঁদের মতো করে মলয়বাবুকে নিরপরাধ সাব্যস্ত করতে প্রায় এক-দিস্তা সমান কাগজ টাটপ করে কোর্টে জমা দিলেন। কোর্টে আসা যাওয়া এবং বিভিন্ন ভাবে অনিয়ম করতে করতে মলয় রায়চৌধুরী রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। শরীরের অবস্থা একেবারে ভগ্নপ্রায়। তিনি এখন ঘরে একা থাকতে ভালোবাসেন। রাত জাগা ছেড়ে দিয়েছেন। সভা-সমিতি, কবিতা-আসর সমস্ত কিছু বন্ধ। লেখালেখিও করেন না। হাংরি শরিকদের সঙ্গে মিশতেও আর ইচ্ছে নেই। এখন ফাঁকা মগজে সব ফাঁকা অনুভব করেন।

এমনি চলতে চলতে হাইকোর্টে মকদ্দমার রায় বেরোবার দিন চলে এলো। মলয় রায়চৌধুরী কোর্টের সমস্ত সংবাদ পেয়ে যান সুবিমল বসাক মারফত। ২৬ জুলাই ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে জজ টি.পি.মুখার্জী মলয় রায়চৌধুরীর কেসের রায় দিলেন। কিন্তু মলয়বাবু সেদিন পাটনা থেকে কলকাতা এলেন না। কয়েকদিন পর সুবিমল বসাক একগাদা কাগজ-পত্র নিয়ে পাটনা মলয় রায়চৌধুরীর বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। সুবিমল বসাক হাসি মুখে জানালেন, মলয় রায়চৌধুরী সম্পূর্ণভাবে নিরপরাধ বলে তাঁকে খালাস দেওয়া হয়েছে।

এরপরই মলয় রায়চৌধুরী সমস্ত যোগাযোগ এবং লেখা ছেড়ে দিয়ে স্বেচ্ছায় নির্বাসন নিয়েছেন। ততোদিনে হাংরি আন্দোলনের আগুন নির্বাপিত হয়ে এসেছে। 'দ্রোহপুরুষ' মলয় রায়চৌধুরী যেখানে সরে পড়েছেন সেখানে আন্দোলনের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে বাকিরা ছিটকে গেছেন। সকলে নিজেদেরকে সাহিত্যের জগতে দাঁড় করানোর জন্য ব্যস্ত। মানুষের মনেও হাংরি সম্বন্ধে তেমন আর আগ্রহ নেই। মকদ্দমা শেষ, হাংরি আন্দোলনও স্তিমিত হয়ে গেছে। সেই হিসেবে এখানেই হাংরি আন্দোলনের ইতিহাস তার সীমানায় দৃশ্য প্রাচীর রচতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু অদৃশ্য ভাবে থেকে গেছে তার ভাবনার বীজ অন্ধকারের গহ্বরে। ভবিষ্যৎ সে খবর আমাদের সময়মতো জানাতে ভুলবে না।

উল্লেখপঞ্জি

১। গঙ্গোপাধ্যায় সুনীল, 'হাংরি আন্দোলন', হাওয়া ৪৯, তদেব, পৃষ্ঠা-৫৪, ৫৫

২। বসাক সুবিমল , মলয়, সম্পাদক ঃ মুর্শিদ এ. এম, আবিষ্কার প্রকাশনী, বাঁশদ্রোণী, কলকাতা-৭০, প্রথম প্রকাশ ঃ বৈশাখ ১৪০৮, পৃষ্ঠা-২৪২

৩। রায়চৌধুরী মলয়, 'হাংরি আন্দলনের মজাগুলো', হাওয়া ৪৯, পৃষ্ঠা-৯৬

৪। দাশ উওম, 'হাংরি জেনারেশন ঃ একটি সমীক্ষা' হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, পৃষ্ঠা-২০

৫। তদেব, পৃষ্ঠা-২০-২১

৬। রায়চৌধুরী মলয়, 'হাংরি কিংবদন্তী', পৃষ্ঠা-৩৯

৭। দাশ উওম, 'হাংরি জেনারেশন ঃ একটি সমীক্ষা' হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, পৃষ্ঠা-২২-২৩

৮। রায়চৌধুরী মলয়, 'হাংরি কিংবদন্তী', পৃষ্ঠা-৩৯

৯। দাশ উওম, 'হাংরি জেনারেশন ঃ একটি সমীক্ষা' হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, পৃষ্ঠা-২৩-২৪

১০। সান্যাল তরুণ, 'হাংরি আন্দোলন' হাওয়া.৪৯, প্রকাশক ও সম্পাদক ঃ সমীর রায়চৌধুরী, হাংরি আন্দোলন সংখ্যা, পৃষ্ঠা-৩৩,৩৪

১১। রায়চৌধুরী মলয়, হাংরি কিংবদন্তী, পৃষ্ঠা-৮০

১২। তদেব, পৃষ্ঠা-৮১

১৩। তদেব, পৃষ্ঠা-৮১,৮২

১৪। তদেব, পৃষ্ঠা-৮২

১৫। তদেব, পৃষ্ঠা-৮২,৮৩

১৬। তদেব, পৃষ্ঠা-৮৩

১৭। তদেব, পৃষ্ঠা-৮৩, ৮৪

১৮। তদেব, পৃষ্ঠা-৮৪, ৮৫

১৯। রায়চৌধুরী মলয়, 'হাংরি প্রতিসন্দর্ভ' হাওয়া ৪৯, প্রকাশক ও সম্পাদক ঃ সমীর রায়চৌধুরী, হাংরি আন্দোলন সংখ্যা, পৃষ্ঠা-২৭

২০। তদেব, পৃষ্ঠা-১২১, ১২২

২১। বসাক সুবিমল, 'আমি আর মলয়' মলয়, সম্পাদক ঃ মুর্শিদ এ.এম, পৃষ্ঠা-১০৩,১০৪

২২। রায়চৌধুরী মলয়, 'হাংরি প্রতিসন্দর্ভ' হাওয়া ৪৯, প্রকাশক ও সম্পাদক ঃ সমীর রায়চৌধুরী, হাংরি আন্দোলন সংখ্যা, পৃষ্ঠা-১৫,১৬,১৭

২৩। তদেব, পৃষ্ঠা-২৪,২৫,২৬

২৪। তদেব, পৃষ্ঠা-১০২,১০৩,১০৪

২৫। তদেব, পৃষ্ঠা-১৩৩

২৬। তদেব, পৃষ্ঠা-১৩৫

২৭। তদেব, পৃষ্ঠা-১৩৯

২৮। রায়চৌধুরী মলয়, হাংরি কিংবদন্তী, পৃষ্ঠা-৯৩ □

পঞ্চম অধ্যায়

হাংরি আন্দোলনের বহুচর্চিত সাহিত্যের বিশ্লেষণাত্মক অধ্যায়ন

হাংরি আন্দোলনের প্রথম ইশতিহার প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গে মলয় রায়চৌধুরী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, দেবী রায় এবং সমীর রায়চৌধুরী আচোলনার কেন্দ্র বিন্দুতে চলে আসেন। তখন পর্যন্ত এই চারজনই হাংরি আন্দোলনের 'নিউক্লিয়াস'। শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে বাদ দিলে বাকি তিনজন এখনও জীবিত।পরবর্তীতে এই আন্দোলনকে সাড়া দিয়ে অনেক কবি, গল্পকার, চিত্রকর প্রমুখ যোগদান করেন। এঁদের অনেকে হাংরি ইশতিহার এবং পত্রিকাগুলোর মধ্যে কেউ একটি, কেউ দুটি, কেউ একাধিক লেখা প্রকাশ করেন। আনন্দ ও সৃষ্টির নেশায় আত্মহারা হয়ে যে যেখান থেকে পেরেছেন, যেভাবে পেরেছেন ইশতিহার, পত্রিকা ইত্যাদি প্রকাশ করেছেন। নিজেদেরকে পরিচয় দিয়েছেন হাংরি আন্দোলনকারী হিসেবে। হাংরি মতাদর্শে যে সমস্ত বুলেটিন, পত্রিকা প্রকাশিত হয় তারমধ্যে উলেখযোগ্য— জেব্রা, ফুঃ, ব্লুজ, শকুন জিরাফ, উন্মার্গ, কনসেনটেশন ক্যাম্প, স্বকাল, আর্তনাদ, রোবট, ধৃতরাষ্ট্র, গেরিলা, ক্রমশঃ, প্রতিদ্বন্দ্বী, চিহ্ন, ওয়েস্টপেপার, ইত্যাদি।

হাংরি আন্দোলনকারীদের মধ্যে সমীর রায়চৌধুরী, মলয় রায়চৌধুরী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ চৌধুরী, শৈলেশ্বর ঘোষ, ফালগুনী রায়, ত্রিদিব মিত্র, সুবো আচার্য, সুবিমল বসাক, বাসুদেব দাশগুপ্ত, সুভাষ ঘোষ প্রমুখের বই প্রকাশিত হলেও সমীর রায়চৌধুরী সহ অনেকের লেখাতে হাংরি আন্দোলনের ছাপ অস্পষ্ট। তবে বেশিরভাগ হাংরি আন্দোলনকারীর কোনো গ্রন্থ তখন পর্যন্ত প্রকাশিত না হলেও এঁরা যে হাংরি আন্দোলনের জোরালো সাহিত্যিক তা প্রমাণিত হয়ে যায়। হাংরি আন্দোলনে যুক্ত সমীর রায়চৌধুরী, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, উৎপলকুমার বসু, বিনয় মজুমদার, রবীন্দ্রগুহ প্রমুখরা তখনও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বন্ধু। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ আবার 'কৃত্তিবাস' গোষ্ঠীর লেখক হিসেব পরিচিত।

মলয় রায়চৌধুরীর মতে— "শিল্পের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কবিতা রচনার প্রথম শর্ত।"[১] কিন্তু আন্দোলন কবিতাতে থেমে থাকেনি ; গল্প, ছবি ইত্যাদি পর্যায়ে পৌঁছে যায়। বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তিকেন্দ্রিক পরিবর্তনকে নস্যাৎ করে বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে যৌথ আন্দোলন সূচিত করে হাংরি গোষ্ঠী। "সাহিত্যের মূলধারার বাইরে প্রতিভাবান ও মৌলিক এই সাহিত্য সৃষ্টি আমাদের বদ্ধ জীবনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।"[২]

হাংরি আন্দোলন যে বাংলা সাহিত্যে নতুন ধরনের আন্দোলন এবং একমাত্র সার্থক আন্দোলন তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে মলয় রায়চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম ইশতিহারেই। পরবর্তীতে গল্প সম্পর্কিত ইশতিহার নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয়। হাংরি আন্দোলন পূর্ববর্তী কবিরা তাঁদের সৃষ্ট কর্মে যে ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন তাতে লক্ষ্য করা যায় একক সমগ্রতা। হাংরি কবি-সাহিত্যিকরা তাদের চিন্তায় যুক্ত করলেন বহুবিধ সাবজেক্ট পজিশন কিংবা প্রতিস্বস্থিতির জন্য

পারিবারিক-সামাজিক শব্দ ও ভাষা। প্রধান শর্তস্বরূপ ঘোষিত হল— প্রতিষ্ঠান বিরোধীতা। নান্দনিক সাহিত্য রচয়িতাদের আক্রমণ। কল্পনাকে কবিতা-সাহিত্যে প্রত্যাখ্যান। বাংলা ভাষার খোলশ ঝেড়ে ফেলা। অধিপত্য প্রণালীর বিরোধীতা করা। কবিতায় পালাবদল। আধুনিকতার মূল জাগয়া থেকে সরে আসা। ব্যাকরণের দেওয়াল ভাঙা। কোনো কবিতা-শরীরে বহুবিধ সাবজেক্ট পজিশন ছড়িয়ে দেওয়া। কবিতায় গণভাষা ব্যবহার। পদ্য ও গদ্য ছন্দের অবলুপ্তি এবং একটি সহজ-সরল নতুন শৈলী ব্যবহার। বাস্তব কথা বলার শব্দ অবিকল কবিতায় ব্যবহার করা। যৌনশব্দ, অশ্লীলশব্দ, ইতরশব্দ ইত্যাদির বহুল প্রয়োগ। নান্দনিক সমস্ত চিন্তাকে কবিতায় প্রশ্রয় না দেওয়া। জীবনের বাস্তব নগ্নরূপকে কবিতায় হুবহু তুলে ধরা। ঔপনিবেশিক অচলায়তন ফাটিয়ে বেরিয়ে পড়া। ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রশ্ন। সমস্ত কিছুতে সন্দেহ। শিল্পনামক অশ্রাব্য বস্তুতে বিশ্বাসহীনতা। সাহিত্যের কালো-বাজারে হামলা করা ইত্যাদি।

হাংরি আন্দোলনকারীদের কবিতা-সাহিত্যে উল্লিখিত সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলো উজ্জ্বলভাবে পরিরক্ষিত হয়। উত্তম দাশ— মলয় রায়চৌধুরীর 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' কবিতাটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন— "প্রথম পাঠেই মনে হবে আমাদের সংস্কারের বাইরে এ কবিতা। কিন্তু গেঁথে যাবে আর্তচিৎকার— অসহায়। মনে হবে খুবই আবেগী ও উচ্ছ্বসিত, প্রচণ্ড কাঁচা ছন্দ বর্জিত, মলয়ের ইশতাহারে ছিল একথা, প্রচলিত ছন্দ বর্জন করে স্বাভাবিক ভাষায় কবিতা লেখা। এখানে উচ্চারণ স্বাভাবিক, যতিও মুখের ভাষার অনুগত।"[৩] এ-কথাগুলো প্রায় সকল হাংরি কবির কবিতা সম্পর্কে প্রযোজ্য।

মলয় রায়চৌধুরী হাংরি আন্দোলনের স্রষ্টা। হাংরি আন্দোলন চলাকালীন তাঁর চারটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই অল্পদিনে বাংলা সাহিত্যের এতগুলো ভিত কাঁপানো কাব্য কেউই লেখেননি। লেখার শক্তিও কারো ছিল বলে মনে হয় না। কারণ মলয় রায়চৌধুরী ছিলেন মেধাবী, বহু পড়ুয়া, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। তাঁর প্রথম জীবনের চারটি কবিতা 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ— শয়তানের মুখ (১৯৬৩), জখম (১৯৬৫), তুলকালাম আত্মহত্যা (১৯৬৫), আমার অমীমাংশিত শুভা (১৯৬৬), মেধার বাতানুকূল ঘুঙুর (১৯৮৭), হাততালি (১৯৮৯), চিৎকার সমগ্র (১৯৯৫), ছত্রখান (১৯৯৫), যা লাগবে বলবেন (১৯৯৬), আত্মধ্বংসের সহস্রাব্দ (২০০০) পোস্টমডার্ন আহ্লাদের কবিতা (২০০১) কৌণপের লুচিমাংস (২০০৩) ইত্যাদি। তাছাড়া তাঁর অনেক কবিতা অগ্রন্থিত অবস্থায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে।

লক্ষ্য করা যায় হাংরি আন্দোলনের পুরোধাপুরুষের জ্ঞানভাঁড়ে ঝলসে ওঠে আধুনিকতা নামক ভূষিমালের হদিস। শুরু হয় বিদ্রোহ। তাই সাহিত্যে সমস্ত আধুনিকতার বিরুদ্ধে কবির মুষ্ঠি উত্তোলন। তাঁর সম্পর্কে আরোপ, তিনি— 'মানব সমাজের পেরিফেরির জীব'; 'কালচারাল বাস্টার্ড'; 'নিম্নবিত্তের ছোটলোক'; 'সাংস্কৃতিক জারজ'; 'বাংলা মূলসংস্কৃতির আউটসাইডার' ইত্যাদি। অজিত রায় এই কবি সম্পর্কে বলেন— "তুমি একটা কৃষ্টিদোগলা। তোমার কলমে নিম্নবিত্ত রক্ত। তোমার টেক্সট আলদা।"[৪] এই দ্রোহপুরুষের কাব্যকীর্তি সম্বন্ধে উৎপলকুমার বসু বলেন— "মলয় রায়চৌধুরী এখনকার বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট নাম।"[৫]

আধুনান্তিক চিন্তা চেতনায় মলয় রায়চৌধুরী বাংলা কবিতা পরিবর্তনের ইতিহাসে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। বেশিরভাগ সার্থক লেখকের কবিতা লেখা শুরু প্রকৃতি, প্রেম, বিদ্রোহ নিয়ে। কিন্তু মলয় রায়চৌধুরীর কবিতার শুরু 'শূণ্যতা' দিয়ে। তাঁর প্রথম কবিতা 'স্পর্ধা' রচিত হয় ১৬ ডিসেম্বর ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে। কবিতাটি পরে 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। 'কৃত্তিবাস'-এ তাঁর আরো তিনটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলো হল— 'স্পর্শের প্রহরে শিল্প' (ডিসেম্বর ১৯৫৮), 'মৃত্যুমেধ' (মার্চ ১৯৫৯) এবং 'প্রব্রজনিকা' (১৯৫৯)। পরবর্তীতে 'শয়তানের মুখ' কাব্যগ্রন্থে তিনটি কবিতা স্থান পেলেও 'প্রব্রজনিকা' খুঁজে না পাওয়ার ফলে 'শয়তানের মুখ' থেকে ফসকে পড়ে।

মলয় রায়চৌধুরীর উদ্দেশ্য ছিল বুলেটিন প্রকাশ এবং বাংলায় নতুন ধরনের কবিতা লিখে নান্দনিক কবিতা রচয়িতাদের চমকে দেওয়া। যেদিন হাংরি বুলেটিনে মলয় রায়চৌধুরীর কবিতা প্রকাশ হল, সেদিন বোঝা গেল তাঁর উৎকৃষ্ট মহাযজ্ঞের গূঢ় মন্ত্র। কিংবা বারুদ স্ফুলিঙ্গ। কেননা মলয় রায়চৌধুরী বাংলা কবিতা-সাহিত্যের ভিত কাঁপানোর প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলেন। তাঁর কবিতা বিশ্লেষণে আমরা তাই দেখতে পাবো।

হাংরি আন্দোলন নতুন সাহিত্য রূপ দেখাতে সক্ষম হয়েছে বহুভাবে। বিশাল মহীরুহের মতো। আর তার কৃতিত্ব একা মলয় রায়চৌধুরীর। তাঁর কবিতা বিশ্লেষণ করলে আমরা এর প্রমাণ পাই। মলয় রায়চৌধুরীর কবিতায় ভাষা, ছন্দ, অলংকার, শব্দ চয়ন, বাক্য গঠন, বিষয় নির্বাচন, আঙ্গিক, উপমা ব্যবহার, বাক্যে গণিত সংস্থাপন এতো সুন্দর ভাবে পরিবেশিত হয়েছে যা আস্বাদন করে পাঠক চমৎকৃত হন। "বিশেষত মলয় রায়চৌধুরীর লেখায় যৌনতার সঙ্গে এলো ব্যঙ্গ, আত্মপরিহাস ও অসহায় মানুষের নিষ্ফলতার যন্ত্রণা।"[৬] মলয় রায়চৌধুরীর কবিতা বুঝতে হলে এবং তাঁর কবিতা পড়তে গেলে বহু-পড়ুয়া হতেই হবে। জানতে হবে পৃথিবীর বিভিন্ন আন্দোলন, ডায়াসপোরা, ইংরেজি সাহিত্য, উত্তর-আধুনিকতা, আঞ্চলিক শব্দ, দেশি শব্দ, আভিধানিক শব্দ, অশ্লীল শব্দ, যৌন শব্দ, ইতর শব্দ, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, ভূগোল; জানতে হবে নারীকে, জানতে হবে সমাজকে, ঘুরতে হবে পতিতা পল্লিতে, উঁকি মারতে হবে বেশ্যার হৃদয়ে।

মলয় রায়চৌধুরীর লেখা 'কৃত্তিবাস'-এ শুরু হলেও পরবর্তীতে নিজেকে প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে সংশোধন করেন হাংরি আন্দোলন দ্বারা। মলয় রায়চৌধুরী যে মেধাবী কবি তা স্বীকার করেছিলেন বলেই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় চেয়ে নিয়ে 'কৃত্তিবাস'-এ তাঁর কবিতা ছাপিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, মলয় রায়চৌধুরীর 'শয়তানের মুখ' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশকও সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।

'শয়তানের মুখ' কাব্যগ্রন্থটি সর্বমোট চল্লিশটি কবিতার সংকলন। প্রথম কবিতা 'স্পর্ধা'। প্রথম কবিতা পড়েই মনে হয় তিনি জাত কবি। উঁচুদরের কবি। বিদগ্ধ কবি। কোনো হাত কাঁপা নেই। বাক্য গঠন গম্ভীর। বিষয় নির্বাচন আন্দোলনেরই প্রস্তুতিপর্ব। কবিতাটিতে ফুটে উঠেছে মলয় রায়চৌধুরীর চিন্তাদগ্ধ নিদ্রাহরণের ছবি। 'শয়তানের মুখ' কাব্যগ্রন্থটিতেই আমরা লক্ষ্য করতে পারছি আন্দোলন পূর্ববর্তী কবিতার যে ছাঁচ কিংবা সূতোয় ফুলগুচ্ছের সংযোজন রূপ কবিতা লেখার সৌন্দর্যতা— তাকে ভেঙে গুড়িয়ে দিলেন মলয় রায়চৌধুরী। আর আন্দোলনের শরিকরা দীক্ষিত হলেন সেই মন্ত্রে।

হাংরি আন্দোলন চলাকালীন মলয় রায়চৌধুরীর প্রথম কবিতা 'ধোলাই'। রচনা— ৩০ ডিসেম্বর ১৯৬১। কবিতাটি সেই সময়ের হাংরি বুলেটিনে প্রকাশিত হয়। মলয় রায়চৌধুরীর 'ধোলাই' পড়তে পড়তে মস্তিষ্ক ধোলাই হয়ে যায়। চিন্তার দরজায় জোরে ধাক্কার শব্দে সমস্ত কিছু ভেঙে চুরমার হলে দেখতে পাই কলকাতার মানুষের বুজরুকি, ভণ্ডামি, কষ্ট, ব্যথা, ঘৃণা, লুটপাট, নারী মাংসের খাবলা-খাবলি, অবিশ্বাস, ক্ষমতার ভাওতা, ইত্যাদি। আছে— আমলার কথা, যুবকের কথা, বৃদ্ধের কথা, পকেটমারের কথা, লজ্জাবতী কালীর কথা, বেশ্যার কথা, দরদির কথা, শিশুর কথা। কবির অভিজ্ঞতার বাষ্পঘন স্বরূপ দুটো চরণ পাঠে আমরা উপলব্ধি করতে পারি ঃ

"ট্যাঁকমারে আড়াআড়ি আদিগঙ্গার গর্ভপাত ঘটে ঠনঠনে
জিভ বের করে থাকে লজ্জাবতী— মন্দির গিজগিজ করে বেশ্যাদের তীর্থে"[৭]

আটটি কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয় 'কবিতা সংকলন'। হাংরি আন্দোলনের সময়-সীমায় কবিতাগুলো লিখিত হলেও গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে। 'কবিতা সংকলন'-এর কবিতাক্রম— কামড়, ফুলিয়ার হাতটান, উৎখাত, তুলকালাম আত্মহত্যা, কপর্দকহীনতা, লোহার রড, রবীন্দ্রনাথের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা, প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকায় কবি হিসেবে মলয় রায়চৌধুরীর আত্মপ্রকাশ ঘটলেও তাঁর কবি হওয়ার উত্থান হাংরি আন্দোলন শুরু হবার পর।

'কবিতা সংকলন' গ্রন্থের সবচেয়ে বিতর্কিত কবিতাটির নাম 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার'। হাংরি আন্দোলন যখন চরমে তখন মলয় রায়চৌধুরী উক্ত কবিতাটি রচনা করেন। বলা যেতে পারে— হাংরি আন্দোলন বিশ্বের দরবারে অন্যতম সাহিত্যিক আন্দোলনের মর্যাদা পাওয়ার মূলে ওই একটি কবিতা। কবিতাটি হাংরি আন্দোলন ভেঙে যাবার আগে লেখা। কবিতাটি লিখিত হয়েছিল ১৯৬৪-র অক্টোবর মাসে এবং সেই সময়ই হাংরি বুলেটিনে প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটির জন্য সংখ্যাটি নিষিদ্ধ হয়ে যায়। বিশ্বজিৎ সেন লেখেন— "'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার'-এ বাঁধন ছেঁড়া রাগ ছিল মলয়ের কবিতার পরিচিতি চিহ্ন।"[৮] অনেক সমালোচকের মতে মলয় রায়চৌধুরী মনের কথাকে ব্যক্ত করতে অনেক বেশি জায়গা নিয়েছেন, কিন্তু আমরা তা মনে করি না। দ্রুত বৈদ্যুতিক শক্ দিতে এমন জায়গায় দরকার ছিল। তাই এই শক্ বারবার পাঠককে ভাবায়।

'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার'-এর জন্য মলয় রায়চৌধুরী কারাবরণ করেন। তাঁকে হাতকড়া ও কোমরে দড়ি বেঁধে কয়েদির মতো নিয়ে যায় পুলিশ। বিচারে একমাসের কারাদণ্ড অথবা দুশো টাকা জরিমানা হয়।

মলয় রায়চৌধুরী 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' সম্পর্কে বলেছেন— "আমার নিরীক্ষার আগ্রহে অন্যান্য যে ব্যাপার গুলি এই পাঠকৃতিটি তৈরি করার সময়ে ছিল, তার মধ্যে প্রধান দুটি হল দীর্ঘ কবিতার কাঠামোয় স্পিড বা গতি আনা এবং তাকে চিৎকার-নির্ভর করা। এই দুটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাংলা কবিতায় তার আগে, বোধহয় পরেও বিশেষ কাজ হয়নি। উদ্দেশ্য ছিল

পাঠবস্তুটিকে ইলেকট্রিফাইং করে তোলা এবং পাঠককে তুমুল বৈদ্যুতিক প্রবাহে আটক রাখা, যা থেকে সে ছাড়াবার চেষ্টা করবে কিন্তু পারবে না।”[৯] বৈশিষ্ট্য দুটি লক্ষ্য রাখলে পাঠবস্তুটি আমাদেরকে একটি সঠিক বিষয়ে উপনীত করে। কবিতাটি পড়া আরম্ভ করলে আর থাকা সম্ভব নয়। পাঠক্রিয়াটি চিৎকার নির্ভরতায় ইলেকট্রিফাইং করে তোলে। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশের কবিতার পাশে ‘প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার’ উপস্থাপন করলে বোঝা যায় কবিতার আমূল পরিবর্তন ঘটে গেছে। আর তা সম্ভব করে তুলেছেন মলয় রায়চৌধুরী।

মলয় রায়চৌধুরীর বক্তব্য “পাঠবস্তুটিতে কোনো কেন্দ্র নেই। না আছে আঙ্গিক। না আছে বিষয়। না আছে থিম। না আছে বক্তব্য। না আছে ছন্দ। না আছে প্রতীক, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক। মেইনস্ট্রিম কবিতার প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসেবে আমি এই লেখাটির প্রান্তিক অবস্থান নির্ধারণ করতে চেয়েছিলুম মাগধি ও ভোজপুরি ইথসের সাহায্য। তখনকার সাহিত্যিকরা পাঠকৃতিটির ওই ইথসকে বরদাস্ত করতে পারেননি।... রচনাটিতে এভাবে ওপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক সংঘাতক্ষেত্র গড়ে ওঠে।”[১০] একথা সত্য যে, তখনকার সাহিত্যিকরা পাঠকৃতিটির ওই ইথসকে সহ্য করতে পারেন নি। বিংশ শতাব্দীর ষাট পূর্ববর্তী কবিদের সমস্ত চিন্তায়, ধাক্কা দিয়েছিল মলয় রায়চৌধুরীর ‘প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার’। অশ্লীলতার তাণ্ডব দ্বারা কবিতার শরীরকে সাজিয়ে সমস্ত নন্দন চিন্তাকে আঁছড়ে দিয়ে অঘোর-পন্থীর মতো অমাবস্যা রাতে তপস্যায় উপবিষ্ট হয়ে মলয় রায়চৌধুরী রচনা করলেন ‘প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার’। “আমার কাছে ‘প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার’ ছিল একটি অফুরন্ত আহ্লাদের বহুরৈখিক প্রোজেক্ট।”[১১] মলয় রায়চৌধুরী ‘প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার’-এ শব্দ নিয়ে খেলা করেছেন বিস্তর এলাকা জুড়ে। কবিতাটির ডিসকোর্স ভাষার সন্ত্রাস হিসেবেই দাপট চালিয়ে গেছে। ভাঙচুরের প্রবণতা নিয়েই কবিতাটির ছড়ি চালনা। “রচনাটিকে অনির্ণেয়তা দেয়া হয়েছিল নারী যৌনাঙ্গের আরোপিত উল্লেখের সাহায্যে। ক্লিটোরিস ও লাবিয়া ম্যাজোরা শব্দ দুটি সংগ্রহ করে আরোপ করতে হয়েছিল। তার আগে আমি শব্দ দুটির সঙ্গে পরিচিত ছিলুম না। শব্দার্থকে মুলতুবি রাখতে সাহায্য করেছে এরা এবং অন্যান্য দ্যোতক যেমন— বরাঙ্গ, বীর্য, মুত্রাশয়, সতীচ্ছদ, য়ুটেরাস, ঋতুস্রাব, যোনিবর্ত্ম, শুক্র, যোনিকেশর, পোঁদ, প্রস্রাব, ইত্যাদি। আমি জানতুম যে, অভিব্যক্তির এই আধেয় চিহ্ন গুলোর সাংস্কৃতিক স্থিতিস্থাপকতা অসাধারণ, এমন কি তাঁদের সঙ্কেত ব্যক্তিগত গোপন স্তরে আক্রমণাত্মক প্রক্রিয়া সৃষ্টি করবে।”[১২]

উল্লিখিত শব্দগুলো আমাদেরকে কাবু করে ফেলে। সবার সামনে কবিতাটি আবৃত্তিযোগ্য নয়। প্রথম পাঠে শব্দগুলো অশ্লীল মনে হলেও বুদ্ধির তন্ত্রীতে জোর লাগালে রহস্যময়ভাবে বেরিয়ে আসে কবিতাতন্ত্রের নতুনত্ব। কলকাতার বাইরে বাসকরার ফলে কবির মগজে চিন্তা ছিল প্রান্তিকতার। তাই এমন কিছু করতে চেয়েছিলেন যাতে এসট্যাবলিশমেণ্টের চিন্তায় হাইপ্রেসার দেখা দেয়। কবি যা চেয়েছিলেন তা করতে সফলও হয়েছিলেন। এরফলে পশ্চিমবঙ্গের মসনদ টলে গিয়েছিল। কবির উদ্দেশ্য ছিল— নান্দনিক আদর্শ, ধর্ম, আইন ও তদানীন্তন নৈতিকতার প্রেক্ষিতটিকে টুটি ধরে নাড়িয়ে দেবার।

মলয় রায়চৌধুরী ‘প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার’-এর আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন—

"যুবসমাজের যে সর্বজনীন মডেলটি স্বীকৃত ছিল, তার সামনে আমি ছিলুম আঞ্চলিক। 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার'-এর এথ্‌নিসিটি তাই ভিন্ন হতে বাধ্য ছিল। উপর্যুপরি দ্রুত ধাবমান ছবিগুলো, যেমন জাফ্রান মশারির আলুলায়িত ছায়া, কর্টেক্সে কাঁচ ভাঙা, শিরায় অশ্রুস্রোত, কঙ্কালরূপে ভূমিষ্ঠ হওয়া, যোনিকেশরে কাঁচের টুকরো, জন্মমুহূর্তের আলো, রূপালী য়ুটেরাস, তীক্ষ্ণধী চুম্বকের আঁচ, পাঁজরে ঝুরি, হৃদয়বত্তার স্বর্ণসবুজ, চিৎ আধবোজা নারী, মাটি ফুঁড়ে জলের ঘূর্ণি, বীর্য থেকে ডানা মেলা তিনলক্ষ শিশু, মারমুখী আয়না, এই সমস্ত ও অন্যান্য ছবিগুলো মূলত মুহূর্মুহু রূপচার, যা সে সময়ের জীবনযাপনের কারণে অনিবার্য ছিল।"[১৩] পাঠবস্তুটি নতুন হওয়ার ফলে, বঙ্গসমাজের কাছে একটি সাংস্কৃতিক সমস্যা বটে। অনেকে পাঠবস্তুটিকে কাঁচা হাতের লেখা মনে করেন। আবার অনেকে এটিকে কবিতাই মনে করেন না। কারো কারো মতে 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' বাংলা কবিতার ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য কবিতা। যদি উল্লেখযোগ্য কবিতা না হত তাহলে কবিতাটি নিয়ে এত হৈ চৈ হত না। অশ্লীলতার অভিযোগ আসত না। মলয় রায়চৌধুরীকে জেল যেতে হত না। বিশ্ব কবিতা সংকলনে কবিতাটি স্থান পেত না, ইত্যাদি।

মলয় রায়চৌধুরী যখন চিৎকার করেন, শুভার সঙ্গে প্রেম প্রেম খেলা করেন, কিংবা সত্য নিয়ে সত্য কথা বলেন তখন সেই চিৎকার সংযোজন আমাদেরকে ইলেকট্রিফাইং করে তোলে। 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' ইংরেজি অনুবাদ বারবার বহু জায়গা থেকে প্রকাশিত হয়। কবিতার ছত্রে ছত্রে চিৎকার দ্রুত পাঠসমাপ্তি মণ্ডপ ঘরে শেষ আরতির জন্য নিয়ে যায়, তাই আমরা এলোমেলো কিছু চিৎকার সংযোজন করে আমাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে সচেষ্ট হই—

"ওঃ মরে যাব মরে যাব মরে যাব...
সাহিত্য-ফাহিত্য লাথি মেরে চলে যাব শুভা...
আমি জানি শুভা, যোনি মেলে ধরো, শান্তি দাও...
মা তুমি আমায় কঙ্কাল রূপে ভূমিষ্ঠ করলে না কেন ?...
ধর্ষণকালে নারীকে ভুলে গিয়ে শিল্পে ফিরে এসেছি কতদিন...
সব ভেঙে চুরমার করে দেব শালা...
আমাকে ধর্ষণ ও মরে যাওয়া শিখে নিতে হয়নি...
আমি আমার নিজের মৃত্যু দেখে যেতে চাই...
তোমার ঋতুস্রাবে ধুয়ে যেতে দাও আমার পাপতাড়িত কঙ্কাল...
আমার বাবার অন্য নারীর গর্ভে ঢুকেও কি মলয় হতুম ?...
তোমার সেলোফেন সতীচ্ছদের মধ্যে দিয়ে পৃথিবীটা দেখতে দাও...
আজ মনে হয় নারী ও শিল্পের মত বিশ্বাস ঘাতিনী কিছু নেই...
৩০০০০০ শিশু উড়ে যাচ্ছে শুভার স্তনমণ্ডলীর দিকে...
কয়েকটা ন্যাংটো মলয়কে ছেড়ে দিয়ে তার অপ্রতিষ্ঠ খেয়োখেয়ি... "[১৪]

সাতাশি লাইনের কবিতাকে চোদ্দো পংক্তিতে সাজিয়ে দেখা যায় একই ইলেকট্রিফাইং। একই দ্রুততা। কবিতাটি পাঠকালে আমাদের সংস্কার বিরোধী বলেই চিহ্নিত হয়ে ওঠে। "প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার মলয়ের চেতন-অচেতন মনের রেকর্ডিং। একদিকে প্রচণ্ড অসহায়বোধ থেকে

মাতৃগর্ভে ফিরে যাবার তৃষ্ণা, অন্যদিকে এক নিশ্চিন্তবোধের কাছে আত্মসমর্পণ। কবিতাকে কি এভাবেই ফেরৎ দিতে চেয়েছেন জীবনে। সেখানে আপাত অশ্লীল শব্দগুলো বিষয়ের চাপে অস্তিত্বের অংশ হয়ে গা থেকে সংস্কারের গন্ধ ঝেড়ে ফেলে। আধুনিক জীবনের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করতে নিশ্চিন্ত প্রয়োজন নতুন শব্দের, যা আমাদের অভ্যাসের দাসত্ব করে না। আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যায় শব্দের আদিম অর্থের কাছে, যা কেবল তাই প্রকাশ করে যা সে নিজে। ১৯৬৮-র Link পত্রিকার এক সংখ্যায় রাজীব সাক্সেনা ব্যঙ্গই করতে চেয়েছেন হাংরি আন্দোলনকে কিন্তু তাঁকে বলতে হয়েছে : The shocking experiences of the modern reality have to be conveyed in an equally shocking language.”[১৫]

কবিতার আলো-আঁধারীতে ফুটে ওঠে মলয় রায়চৌধুরীর কোঁকানো, অন্তরের জ্বালা, অস্তিতের সংকট এবং তার ফলে চিৎকার। তাই প্রেমিকার সঙ্গে বারবার কথার ঝাঁঝালো বিষাদ উদ্গীত হয়। সাহিত্য-ফাহিত্য তাঁর কাছে মিথ্যা এবং বেকার। অস্তিত্বের সংকট দেখা দিলেও শুভার শারীরিক আস্বাদ সে সংকটকে মুছে দেয়। সেই সঙ্গে মনেরও জ্বালা কমে আসে শুভার সান্নিধ্যে।

মলয় রায়চৌধুরী যে সময় কাব্য আন্দোলনে মশগুল তখন চলছে পৃথিবীর ইতিহাসে ভাঙাগড়ার খেলা। চীনে তখন পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ ঘটে যায়। চীন-ভারত যুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজন ঘটে। ভারতে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা তখন চরমে। বাংলার বুকে চলছিল রাজনৈতিক অস্থিরতা। সাহিত্য জগতে ঘুণধরার ভাঙন রোধে এগিয়ে এলেন হাংরির কর্ণধার মলয় রায়চৌধুরী। 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' সেই চিরাচরিত নড়বড়ে অভ্যাসে ঘুণ সরিয়ে চিৎকার করে নতুন রঙ লাগাল। যৌনতা বলে লেপটে দেওয়া চোরা কথা চালান হল কবিতায়। যৌন কথাবার্তার মধ্যে ছিল সত্য কথা বলার বহুমাত্রিক সুস্থতার ব্যায়াম। কবিতায় যৌনতা এলো বলে আমরা অশুদ্ধ হলাম– একথা মনে করিনা। সত্য উচ্চারিত হয়–

> “আমাকে ধর্ষণ ও মরে যাওয়া শিখে নিতে হয়নি
> প্রস্রাবের পর শেষ ফোঁটা ঝাড়ার দায়িত্ব আমায় শিখতে হয়নি
> অন্ধকারে শুভার পাশে গিয়ে শুয়ে পড়া শিখতে হয়নি
> শিখতে হয়নি নন্দিতার বুকের ওপর শুয়ে ফরাসি চামড়ার ব্যবহার”[১৬]

উল্লিখিত বাক্যগুলোর কোথাও মিথ্যা নেই। সত্য কথা চিৎকার করে বলতে অন্যায় দেখি না। তাহলে ছোট বেলায় কেনো শেখানো হয়– 'সদা সত্য কথা বলিবে'। মলয় রায়চৌধুরীর ধাক্কাটার জোর ওইখানেই। সত্য বলতে বলতে মলয় রায়চৌধুরী এগিয়ে গেছেন প্রেমের পাওনা কথায়, বিদ্রোহের চূড়ায়। কখনও তিনি অন্তরের জ্বালা মেটাতে তৎপর, আবার কখনও দৈহিক ও শারীরিক ক্ষুধার তাড়নায় বলে ওঠেন–

> “শুভাকে হিঁচড়ে উঠিয়ে নিয়ে যাব আমার ক্ষুধায়”[১৭]

যাকে কবিদল শিল্প বলে চিৎকার করছে, তা যে আসলে শিল্প নয় তাই চিৎকার করে বুঝিয়ে দিতে চান মলয় রায়চৌধুরী। তিনি মাঝে মাঝেই পলায়ন প্রক্রিয়ায় শুভার সঙ্গে শারীরিক সুখ ছিন্ন করে ফিরে আসেন যথার্থ শিল্পের তাগিদে। বাস্তবিক “শিল্পের চর্বিতচর্বন সূতিকাগারে

তিনি আবদ্ধ থাকতে চান না, তিনি চান গতানুগতিক বিশুদ্ধ শিল্পের নামে ধর্ষিত শিল্প ভাবনার জগৎটিকে ভেঙে চুরমার করে দিতে।”[১৮] তিনি বারবার ধিক্কার জানান বহুচর্চিত পরমপরা চলে আসা কবিতার ধারাকে নকল করে যারা কবিতা শিল্পের হাট বসান তাদের চিন্তাবিশ্বে। 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার'-এ 'শুভা' কবি কল্পনার শিল্প ফসল। শুভাকে কবিতার কেন্দ্রে উপস্থাপন করে যতসব চিন্তাবীজ বপন করছেন নামটাকে উচ্চারণ করতে করতে। যে কোনো সৃষ্টির উৎস নারী এবং পুরুষ। কবিও সেই শুভা নামক নারীর ওপর ফলাতে চান কবিতার ফসল। সৃষ্টি করতে চান যথাযথ শিল্প মহীরুহ।

আমরা বাস্তবিক লক্ষ্য করি বিদেশি সাহিত্যকে নকল করে একদল শিক্ষিত যুবক আধুনিকতার নাম দিয়ে যে কবিতা রচনা করছে, তা কলোনিয়েল চিন্তাধারার গোলামি মাত্র। কলকাতার কবিকুল মেতে রয়েছেন ওই 'বরাঙ্গের' মিছিলের মতো। 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার'-এ মলয় রায়চৌধুরী কলকাতার বাঙালি কবিদের সমালোচনায় মশগুল হয়েও মাঝে মাঝে আত্মজিজ্ঞাসায় নিজেকে এলিয়ে দেন। তুলনা করেন তাঁদের সঙ্গে নিজের। বাস্তবিক ওই ভিড়ে মলয় রায়চৌধুরীর অস্তিত্ব সত্যিই সংকটময়। তাই বলেন–

“মলয় রায়চৌধুরীর প্রয়োজন পৃথিবীর ছিলনা।”[১৯]

কবি বোঝেন, তাঁর প্রয়োজন নেই বাংলা কাব্য ভাণ্ডারে। এই দুঃখ মনের মধ্যে বিরাজ করলেও অল্পপরেই সব ভুলে গিয়ে অগ্রসর হন ধিক্কার জানাতে, ব্যঙ্গের কষাঘাতে সামনের জনকে বিদ্ধ করতে। শরীর ও মনের ঘাম ঝরিয়ে কবি চেয়েছিলেন শিল্পের সুস্থতা, কবিতার সুস্থতা। তিনি চেয়েছিলেন–

“যোনিকেশরে কাঁচের টুকরোর মতো ঘামের সুস্থতা”[২০]

অশ্লীল বাক্য সংযোজনের মাধ্যমে উপমিত হয় সেই সৃষ্টির সুস্থতা। কাঁচের টুকরোর মতো এক একটি সুন্দর স্বচ্ছ শিল্প ভাবনার বহিঃপ্রকাশের সুস্থতা। 'যোনি' সৃষ্টির প্রতীক। তাঁর চিৎকারের মূল, যে কবিতাকে যথার্থ শিল্পসৃষ্টি বলে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে তা বাস্তবিক 'ধর্ষিত'। অর্থাৎ নষ্ট। “কৃত্রিম-ভাবনালোক ত্যাগ করে মলয় চান সত্যসন্দর্শনের প্রকৃত জীবনযন্ত্রণার অক্ষরের পিনবিদ্ধ রক্তঘামে-ভেজা রক্ত-মাংসজনিত সাবলীল ভাবনালোক। কবিতা তাঁর কাছে ঈশ্বরী না হয়ে– হয়ে উঠুক সময়কালের দর্পণে জীবনযন্ত্রণায় পোড়া সত্যিকারের মানবী। তাই দেখি শুভাকে তিনি শিল্পের মানবীসত্তার প্রতীকীব্যঞ্জনায় আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন তাকে বারবার রমনে ও মননে। 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' কবিতাটির সারসত্য এটাই।”[২১]

কবির মাতৃগর্ভে ফিরে যাবার মূলে রয়েছে যন্ত্রণা। বিষাক্ত পৃথিবীর যন্ত্রণা। সময়ের যন্ত্রণা। মিথ্যার যন্ত্রণা। দাপটের যন্ত্রণা। প্রতিষ্ঠানের দাপাদাপির যন্ত্রণা। সত্যকে টুটি টিপে হত্যার যন্ত্রণা, ইত্যাদি। শুভাকে তাই শেষ পর্যন্ত বোঝা যায় একটি শিল্পচেতনা মাত্র। প্রেরণা মাত্র। মানবী হয়েও শুভা শিল্পের কল্পতরু।

কবিতাটি পাঠ আস্বাদনে মহাকাব্যিক বিশালতা ফুটে ওঠে অন্তরে। যেমন— জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' পাঠ করতে করতে ঘুরে বেড়াই মননের মহাভারতে। আলোচ্য কবিতাটিতে অশ্লীলতা ধরা দিলেও তার দ্বিবাচনিকতা একটি প্রতিবাদী কবিতার আকার হিসেবে সুবিশালতার ছায়াপাত ঘটায়। 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' কবিতাটি যতবার পাঠ করা যায় ততই তার আলোচনার ব্রহ্মত্ব বিস্তার করতে থাকে। এখানেই যে কবিতাটির সার্থকতা। নইলে এই কবিতাটির জন্য মলয় রায়চৌধুরী অ্যারেস্ট হতেন না। মলয় রায়চৌধুরীর যত খ্যাতি ও কুখ্যাতির পারা বাড়তে থাকে তা সেই 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার'-এর প্রকাশকাল থেকে। কবিতাটি হাংরি আন্দোলনকে পৃথিবীর দরবারে পৌঁছে দেয় তাঁর পাণ্ডিত্যের বহুজ্ঞানের দ্বারা। তাই কবিতার পালাবদলের ইতিহাসে 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' সর্বশ্রেষ্ঠ কবিতা।

* * * * *

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে হাংরি আন্দোলনের প্রথম ইশতিহার প্রকাশিত হয়। হাংরি আন্দোলন শুরুর অল্প দিন পরেই শক্তি চট্টোপাধ্যায় সরে পড়েন। তাঁর হাংরি সম্পর্কিত লেখা একেবারেই নগণ্য। শক্তি চট্টোপাধ্যায় হাংরি আন্দোলন থেকে সরে 'রূপচাঁদ পক্ষী' নামে বিভিন্ন জায়গায় লেখা প্রকাশ করেন এবং লেখার জ্যামিতি বিশুদ্ধ করে নেন। আসলে হাংরি আন্দোলনের মাধ্যমে যে "ব্রেক থ্রু তিনি চাইছিলেন তা পেয়ে গিয়েছিলেন।"[২২] অবশেষে হাংরি আন্দোলন তাঁর কাছে একটা রহস্যময় ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। হাংরি আন্দোলন ছেড়ে চলে আসার পর শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় বিস্তর পরিবর্তন ঘটে।

বোহেমিয়ান জীবন-যাপন থেকে দূরে বাস ছিল হাংরি জেনারেশন কবিদের। এঁরা সবাই এসেছিলেন গরিব মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে। হাংরি আন্দোলনে যুক্ত প্রায় সকলই কলকাতার বাইরের মানুষ। এই যুবকরা এসট্যাবলিশমেন্টকে একহাত দেখে নেবার ইচ্ছায় একত্রিত হয়েছিলেন 'হাংরি' নামক বিশুদ্ধ আগুনঝরা মন্ত্রের পবিত্র তাপে। দরিদ্র বলেই দরিদ্রজীবনের কথা, কথা হয়ে যায় কবিতায়। দরিদ্রতার রূঢ় নগ্ন বাস্তব রূপ ফুটে ওঠে অনেকের পাঠপ্রতিক্রিয়ায়। সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগতে এঁরা "নিজেদের ভেতর থেকে আনকোরা নিজেদের নিয়ে"[২৩] এসেছিলেন।

'কৃত্তিবাস' গোষ্ঠীর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক থাকার ফলে শক্তি চট্টোপাধ্যায় পঞ্চাশের কবি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকেন, কিন্তু তাঁর কবি-প্রতিভার স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায় ষাটের দশকে। ইতিহাস সাক্ষ্য মতে শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে পাঠক চিনতে পারেন হাংরি আন্দোলনে যোগদানের পরবর্তী সময়ে। হাংরি আন্দোলনে অংশীদার হওয়ার ফলে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় এক নতুন মাত্রা যোগ হয়। ড০ অশোক কুমার মিশ্র লিখেছেন— "পারিপার্শ্বিক সমাজ পরিস্থিতির প্রতিকূলতা— প্রতিষ্ঠা, স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে তোলার প্রতিবন্ধকতার সংঘর্ষে হৃদয় যন্ত্রণা সার্থক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর এ সময়কার কবিতাগুলিতে।"[২৪]

জীবনানন্দের পর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শক্তিমান কবি হিসেবে সমালোচকরা শক্তি চট্টোপাধ্যায়কে চিহ্নিত করার প্রয়াস করেছেন। কিন্তু কালের বিচারে যে কোনো কবিরই কয়েকটি মাত্র কবিতা উল্লেখের দাবি রাখে। তেমনই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি বিখ্যাত

কবিতা 'সীমান্ত প্রস্তাব ১-মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি নিবেদন'। হাংরি বুলেটিনে প্রকাশিত শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এটি প্রথম কবিতা এবং কবিতাটি হাংরি বুলেটিনের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সেই বুলেটিন যৌথ ভাবে সম্পাদনা করেন— দেবী রায় এবং মলয় রায়চৌধুরী। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কবিতাটি পাঠক মহলে সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছিল।

হাংরি আন্দোলন শুরু হয়েছিল বাংলা কবিতার গতানুগতিক চামড়া চেঁছে ফেলে দিয়ে। তার প্রমাণ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'সীমান্ত প্রস্তাব ১-মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি নিবেদন' কবিতাটি। দীর্ঘ ৫৬ পংক্তির পাঠবস্তুটিতে ক্ষুধায় জর্জরিত জীবনের চিত্র তুলে ধরে আধুনিকতার নন্দন চিন্তাকে নস্যাৎ করতেই যেন কবি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কবিতায় জীবনের মানে খোঁজা নিরর্থক বলে মনে করেন হাংরি কবিরা। কিন্তু শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের উক্ত কবিতাটিতে ভাতের কথা, ভিখারি ছেলের কথা, ঈশ্বরের কথা, ভারত-চীন যুদ্ধের কথা, বোমাবাজির কথা, প্রেম-প্রেম খেলার কথা, হিউএন সাঙ-এর ভারত আবিষ্কারের কথা, নারীর চেহারায় ক্ষুধার ছাপ, রোমান্টিক কবিদের তুচ্ছতা, মার্কসবাদকে জীবন ভাবা জ্যোতি বসুর কথা, কবিতাকে লোকে ভালো না বাসার কথা, নারীর ছলনার কথা ইত্যাদি ফুটে উঠেছে। সমস্ত শব্দগুলোর মধ্যে অনেক ক্ষুধা পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। পেটের ক্ষুধা, ভিখারি ছেলের নানান স্বপ্নের ক্ষুধা, ইশ্বরকে তুচ্ছভাবে চিহ্নিত করার ক্ষুধা, ভারত-চীন যুদ্ধে মানুষের স্বার্থের ক্ষুধা, বোমা-বাজির মাধ্যমে মানুষ মারার ক্ষুধা, নারী এবং পুরুষ মিথ্যা প্রেমের মাধ্যমে খুঁজে বেড়ায় দেহের ক্ষুধা, হিউএন সাঙ-এর মতো ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে ইতিহাসেই আবদ্ধ রাখার অপচেষ্টার ক্ষুধা ইত্যাদি।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় যে অনেকগুলো ক্ষুধার কথা প্রকাশ পেল তা পরবর্তী হাংরি শরিকদের কবিতার লেখনিতে ভাষা যোগায়। মলয় রায়চৌধুরী এর আগেই হাংরি আন্দোলনের প্রস্তুতি স্বরূপ একাধিক কবিতা লিখে নিয়েছিলেন। শংকর ব্রহ্ম লিখছেন— "শক্তি এখানে মলয়ের মতবাদের জোরালো সমর্থক।"[২৫] শক্তি চট্টোপাধ্যায় হাংরি বুলেটিনে 'কবিতা বিষয়ক প্রস্তাব'-এ উল্লেখ করেছেন— "বিদেশে সাহিত্যকেন্দ্রে যেসব আন্দোলন বর্তমানে হচ্ছে কোনটি বীট জেনারেশন, অ্যাংরি বা সোভিয়েত রাশিয়াতেও সমপর্যায়ী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে যদি বাংলাদেশেও কোনো অনুক্ত বা অপরিষ্কার আন্দোলন ঘটে গিয়ে থাকে তবে তা আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক বা সামাজিক পরিবেশে 'ক্ষুধা সংক্রান্ত' আন্দোলনই হওয়া সম্ভব। ওদিকে ওদেশে সামাজিক অবস্থা অ্যাফলুয়েন্ট, ওরা বীট বা অ্যাংরি হতে পারে। আমরা কিন্তু ক্ষুধার্ত। যে কোনো রূপের বা রসের ক্ষুধাই একে বলতে হবে। কোনো রূপ বা কোনো রসই এতে বাদ নেই, বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। একে যদি বীট বা অ্যাংরি দ্বারা প্রভাবিত বলার চেষ্টা হয় তবে ভুল বলা হবে। কারণ এ আন্দোলনের মূল কথা 'সর্বগ্রাস'।"[২৬] হাংরি কবিতা কী ? হাংরি কবিতা কেমন হওয়া উচিত ? হাংরি কবিদের উদ্দেশ্য ইত্যাদি সম্পর্কে উক্ত প্রস্তাবে রক্ষিত আছে। মলয় রায়চৌধুরী হাংরির প্রথম ইশতিহারে এ-বিষয়ে আরো পরিষ্কার শক্ত ভাষায় কবিতা সম্পর্কে হাংরি মিত্রের মত পোষণ করেন।

ড০ মুহম্মদ শহীদুল্লাহের মতে ভাষা বিকাশের স্রোত প্রকৃত পক্ষে অভিজাততন্ত্রের বিপরীতে জনসাধারণের অধিকার কায়েমের ইতিহাস। তাই যে জেনানা কবিত্ব ও ভাষা অভিধানে অভিজাত চিন্তা-চেতনার গোলামিতে পরিণত হচ্ছিল গোঙাতে গোঙাতে রবীন্দ্র পরবর্তী

"নিসর্গবাদী গাংশালিখ কাব্য স্কুলের কবিতা"[২৭] তা থেকে ছিটেকে বেরিয়ে পড়ে আমজনতার জন্য গ্রহণযোগ্য কবিতার প্রয়োজন মেটালেন হাংরি কবিরা। "ক্ষতখুংখার, দিবাস্বপ্নহীন রুথলেস ধ্বনিমগ্ন মননমৌলিক চোখা বেগব্যাপ্ত কৃতবর্ম উন্মদীপ্র এক নতুন কবিতার পওন করতে চাইছিল হাংরি কবিতা।"[২৮] তাই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'সীমান্ত প্রস্তাব ১-মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি নিবেদন' কবিতাটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

"নির্বাক দেবতা কথা বলতে পারে
লোহা বলতে পারে
কাঠের ভূভাগ পারে চিৎহয়ে নারীদের মতো ?
তবু সে ভিখারি ছেলে ভালোবেসে দেখেছিল ভাত।"[২৯]

জীবনের সমস্ত অভিজ্ঞতাকে সত্যের নির্মম চেতনায় প্রকাশ করাই হাংরি কবিতা। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের উক্ত কবিতায় তারই বহিঃপ্রকাশ এক অনন্য ব্যাকরণের মাধ্যমে। পৃথিবীর সব জড়কে নিয়ে মানুষ যখন মিথ্যার আশ্রয়ে সত্যকে সন্ধান করে তখন এক ভিখারি ছেলের কাছে ভাতই সত্য। নির্বাক দেবতা তাকে কিছু দিতে পারে না। লোহা পারে না প্রেম দিতে কিংবা কাঠও কখনো নারীর মতো চিৎ হয়ে কোনো সুখও দিতে পারে না। ভাতই ভিখারি ছেলের একমাত্র কাম্য। তার কাছে ভাতই সব তাই সে জ্যোৎস্নায় ধানগাছ দেখে অনেক স্বপ্ন দেখলেও বাস্তবিক ধানগাছ কখনও ভাত হয়ে ওঠেনি।

জীবনকে ভালোবেসে ভিখারি ছেলে আশার সাম্রাজ্য গড়ে অনেক 'দর্শন' উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছে। কখনও জীবনকে তুচ্ছ ভেবে বিভিন্ন মাদক নেশায় আক্রান্ত হয়ে দেখেছে। ভাত, নারী, প্রেম ইত্যাদিকে ভুলে কখনও স্রষ্টাকে স্মরণ করে ভিখারি ছেলে হয়েছে নিরাশ। ভিখারির ভালো ছেলে ছাড়া মন্দ ছেলেও আছে অনেক কিন্তু তারা ভালোবাসা ছাড়া, সুখ ছাড়া 'অনাবিল' বেঁচে আছে। স্বার্থের জন্য মানুষ যুদ্ধ করে ; একে অপরকে মারে। তারপর যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য মরিয়া হয়ে রাজনীতি করে। চারদিকে মৃত্যুর বিবাহ-বার্ষিকীতে মানুষ মেতে উঠেছে। যে নারীর পতি যুদ্ধে মারা গেল, সে তো আর কোনো দিন মা হতে পারবে না। তাই কবির দৃঢ় হুংকার 'হিংসা মেগাটোন যুদ্ধ অগ্ন্যুৎপাত' বন্ধ না করলে ক্ষুধার্তরা মানুষের মাংস খাবে ছিঁড়ে ছিঁড়ে।

ভারত সীমান্তে যুদ্ধের দামামা। যেখানে উচ্চারিত হওয়া উচিত ছিল হিউএন সাঙ-এর ভারত আবিষ্কারের কথা কিংবা বুদ্ধের অহিংস বাণী, কিন্তু দেখা যাচ্ছে ক্ষুধার্তের বিভিন্ন রূপ। নারীর চেহারায় 'ক্ষুধা'-র স্পষ্ট ছাপ দেখে মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি কবির অনুরোধ সেখানে একদল ক্ষুধার্ত কবিকে যেন তিনি পাঠিয়ে দেন। কবিদের প্রতি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের তুচ্ছতা। কেননা যখন বাংলার (পশ্চিমবঙ্গ) মানুষ ক্ষুধার জন্য প্রাণ হারাচ্ছে, ছটফট করছে, অনাহারে রয়েছে তখন একদল আরামপ্রিয় প্রাতিষ্ঠানিক কবি সীমান্তের (ভারত-চীন) যুদ্ধকে ভুলে গিয়ে আধুনিকতার চর্চায় মশগুল হয়ে ওঠেন। তাঁরা ক্ষুধার্ত মানুষের ছবি আঁকতে যেন ব্যর্থ। নন্দন চিন্তায় আত্মহারা কবির দল কফিহাউসে বসে বাংলাদেশে ৩-টে-৩০-এ কারো বিয়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিতির

কথা ভাবেন। জ্যোতি বসু কমিউনিস্ট দলের নেতা হলেও তিনিও যেন ওই কবি গোষ্ঠীর মতো, তাই তাঁকেও শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গোক্তি। শেষে কবির দুঃখময় উচ্চারণ ঃ

"কবিতা ভাতের মতো কেন লোকে নিতেই পারছে না
যুদ্ধ বন্ধ হলে নেবে ? ভিখারিও কবিতা বুঝেছে
তুমি কেন বুঝবে না হে অধ্যাপক, মুখ্যমন্ত্রী সেন ?"[৩০]

ক্ষুধার্তের কাছে ভাতই সর্বস্ব। ভাত যেমন মানুষকে প্রাণ বাঁচায় ঠিক তেমনি কবির কাছে কবিতাও ভাতের মত ক্ষুধা মেটায়। "বলা বাহুল্য ভাত এখানে জীবন। জীবন ও কবিতা অঙ্গাঙ্গী, সমার্থক এবং একে অন্যের পরিপূরক। এই ভাত মলয় কথিত বহিরাত্মার ক্ষুধা নিবৃত্তির শক্তি। শক্তি সে অর্থে মলয়ের মতবাদ আরো সমর্থ করলেন।"[৩১]

হাংরি আন্দোলনের যে 'হাংরি' শব্দটি তার বহু অর্থ থাকলেও পেটের ক্ষুধার কথাই যে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় সর্বাত্মক রূপ নিয়েছে তা আমাদের অবগত। হাংরি আন্দোলন চলাকালীন ভারতবর্ষ তথা বাংলার বুকে মানুষ ভারত-চীন যুদ্ধের শিকার হয়ে ক্ষুধার্ত জীবন যাপন করতে লাগল। খাদ্য সংকট চরম আকার নেয়। তখন পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন প্রফুল্ল সেন। তাঁর কাছে ক্ষুধার্ত মানুষ ভাত প্রার্থনা করলে তিনি কাঁচাকলা খাবার কথা বলেন। অর্থাৎ মানুষ যা কিছু করে বাঁচুক কিংবা মরুক তাতে তাঁর কোনো দায়বদ্ধতা নেই বলেই একপ্রকার মত পোষণ করেন। যথাসম্ভব এরই পরিণতিতে পশ্চিমবঙ্গে কমিউনিস্টের উত্থান ঘটে এবং নকশাল আন্দোলনের রূপ নেয়।

সমস্ত কবিতাটি জুড়ে রয়েছে পেটের ও দেহের ক্ষুধার কথা। প্রতিবাদের কথা। ঈশ্বরে অবিশ্বাসের কথা। সন্দেহের কথা। তুচ্ছতা বা ঘৃণার কথা। জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা ইত্যাদি। শক্তির এই সমর্থন হাংরি আন্দোলনকে প্রচার দিয়েছিল। হাংরি কবিতা বাংলা সাহিত্যে এক নতুন মাত্রা যুক্ত করতে মুষ্ঠিবদ্ধ শক্তি সংগ্রহ করেছিল। তাই ঝাকঝাক যুবক এই আন্দোলনের শরিক হয়েছিলেন।

হাংরি আন্দোলনের সময় লিখিত এবং হাংরি বুলেটিনে প্রকাশিত 'শিল্প ও কার্তুজ' নামক কবিতায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ

"দুঃসাহসী কেউ নেই যে এসে পেচ্ছাব করবে মুখে
জানে কামড়ে দেবো, জানে অঙ্গহানি হলে বুদ্ধদেব
কে পুনর্গঠিত করবে, পাগলা রামকিংকর বেইজ ছাড়া ?
জীবনেই একবার শিল্প-অনুরাগিণীর কাছে
ন্যাংটার উদ্বৃত্ত অংশ হাতড়ে বলেছিলুম, কী ভাবো
শিল্পই যথেষ্ট ! কেন কার্তুজ লটকানো হলো দেহে ?"[৩২]

শক্তি চট্টোপাধ্যায় স্বীকার করেছেন 'ব্যানাল পদ্য' তিনি দিনে পঁচিশ-ত্রিশ-টা লিখতে পারেন। কিন্তু হাংরি কবিতা লিখতে তাঁকে অনেক সময় নষ্ট করতে হয়েছে। অনেক ভাবতে হয়েছে। অনেক ঘাম ঝরাতে হয়েছে। বাংলা অভিধানের চোরা রাস্তায় ঘুরে ঘুরে শব্দ সংগ্রহ করতে হয়েছে। সত্যকথা বলার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে হয়েছে। একেবারে উলঙ্গ সত্যকে নিংড়ে কবিতার শরীর সাজিয়েছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়। জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত অশ্লীল শব্দগুলোও বাদ পড়েনি কবিতার দেহ নির্মিতিতে। এতে অনেকের কাছে অরুচিকর মনে হলেও দেহের অঙ্গ হিসেবে পুরুষ লিঙ্গ মিথ্যা নয় এবং অশ্লীলও নয়। শরীরে যৌন অঙ্গ থাকলে যৌনতাও থাকবে। সৃষ্টি যৌন-নির্ভর। যৌনতাকে মানুষ অশ্লীল আখ্যা দিয়ে থাকেন, যা একেবারে অযৌক্তিক। কবিতাটির মধ্যে কিছু শব্দ রয়েছে যাকে বাঙালি পাঠক অশ্লীল বলবেন। কিন্তু এই শব্দগুলো আমাদের দেহ সম্পর্কিত সত্য স্বরূপ। সত্য বলাই হাংরি কবিদের প্রধানতম উদ্দেশ্য। এতে কৌশলে বলার কোনো কৌশল নেই। কবিতাটি যে একটি সার্থক হাংরি কবিতা তাতে আর সন্দেহ থাকে না।

* * * * *

হাংরি আন্দোলনের আরো এক অন্যতম কবি সমীর রায়চৌধুরী (১৯৩৪ –)। তাঁকে সকলে 'কৃত্তিবাস' গোষ্ঠীরই একজন বলে জানে। কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য মতে হাংরি আন্দোলনের প্রথম বুলেটিনেই সমীর রায়চৌধুরীর উপস্থিতি প্রত্যক্ষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। যদিও হাংরি বুলেটিন কিংবা হাংরি পত্রিকায় তেমন লেখেননি তিনি। হাংরি বুলেটিনের প্রকাশক হিসেবেই ছিল তাঁর পরিচিতি। তবে একথা সত্য যে, হাংরি বুলেটিনের তৃতীয় সংখ্যায় 'ক্ষুৎকাতর আক্রমণ' বলে একটা নিবন্ধ লিখেছিলেন। তিনি জানিয়েছেন— দেশব্যাপী খাদ্য সঙ্কটের ফলে তাঁকে বাধ্য করেছে 'ক্ষুৎকাতর সম্প্রদায়'-এ অন্তর্ভুক্ত হতে। যদিও পরবর্তী কালে তিনি মামলার রোষে পড়ে নিজেকে গুটিয়ে নেন।

* * * * *

বিশ্বভারতীর ছাত্র থাকাকালীন প্রদীপ চৌধুরী (১৯৪৩ –) হাংরি কবিতা ও হাংরি আন্দোলনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন এবং সুবিমল বসাকের হাত ধরে হাংরি আন্দোলনের কর্ণধার মলয় রায়চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। মন্ত্রস্বরূপ হাংরি ইশতিহারগুলোকে মস্তিষ্কে বিশুদ্ধীকরণ করে অভিযান শুরু হয়। তারফলে কিছু দিনের মধ্যেই বিশ্বভারতী থেকে চিরতরে বহিষ্কৃত হন। তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা হল— 'বাবা আমার বর্বরতা', 'সাময়িকতা', 'চর্মরোগ', 'অন্যান্য তৎপরতা', ইত্যাদি। সে সময় প্রদীপ চৌধুরীর 'চর্মরোগ' (১৯৬৪) কাব্য গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের মধ্যমণিদের চিন্তার খোরাক হয়ে উঠেছিল। তাঁর কবিতা পড়লে আমরা বুঝতে পারি ঘনতর বেদনার বিষবাষ্প। এই মনুষ্য জীবন প্রদীপ চৌধুরীর কাছে অসহ্য। তার কারণ তাঁর জীবন-যুদ্ধে বারবার হোঁচট খাওয়ার অভিজ্ঞতা। তাই তিনি লিখতে পারেন ঃ

"মা তোমার গর্ভের চেয়ে সাংঘাতিক মনে হচ্ছে সভ্যতা ও ব্লাস্টফার্নেস,
৭২ বর্গমাইল বালুর মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে আছি, সময় চেতনাহীন,...
শয়তান একদিন শয়তানের গলা টিপে ধরবে— আমার ১৬, ১৬ —
এই অবস্থায় আমি ভাল মানুষের মতো বেঁচে থাকায় লিপ্ত হতে চাই,
নিজেকে ঠকাতে চাই খুব, পেচ্ছাব করতে করতে ফিল্মের গান
গেয়ে উঠতে চাই বিরহ ও নৌচলাচল সম্পর্কে, নিসর্গের ভয়াবহতা
সম্পর্কে— স্বপ্ন-ডাইমেনশনে চীৎকার করতে করতে আমার গলার
রগ ছিঁড়ে যাচ্ছে— চেপে ধরেছি ফুসফুস— যা এইমাত্র চৌচির হয়ে গেল—
মা এসো ৩ নং দেশী মদ ও ফিনাইলের ককটেল গিলে আমরা
রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি, তোমাকে এই অবস্থায় চালান করে দেয়াই আমার
একমাত্র ... পরজন্মের আর দরকার নেই— ১০,০০০ বছর পরও শেষ হবে না এই
শতাব্দী, এর ঝুল সরাতে সরাতে মানুষ একদিন বধির ও ক্ষমতাবিমুখ হয়ে যাবে।"[৩৩]

প্রদীপ চৌধুরীর জীবন ভাঙচুরময়। কারণ বিশ্বভারতী থেকে অশ্লীল কবিতা লেখার অভিযোগে ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি বহিষ্কৃত হন। একসময় বিশ্বভারতীতে ঈশিতা ঠাকুর এবং পরে যাদবপুরে ইলিনা রায়-এর সঙ্গে অ্যাফেয়ার বা ইনফ্যাচুয়েশন এবং তার-পরিণতি স্বরূপ দীর্ঘ নিরাশা। ১৯৬৪-তে অশ্লীল কবিতা রচনার অভিযোগ শিরোধার্য করে গ্রেফতার হন এবং অবশেষে কলকাতায় তাঁর বিরুদ্ধে মকদ্দমা শুরু হয়। অভিজ্ঞতাযুক্ত শব্দের সমাহারের ফলে যে কবিতা জন্ম নেয়, তাতে অশ্লীলতা, যৌনতা, ইতরতা, ঘৃণা ইত্যাদি সহজে আছড়ে পড়ে। প্রদীপ চৌধুরীর কবিতা পড়তে গিয়ে সেই অশ্লীল কিংবা যৌনতা কিংবা ইতরতা কিংবা ঘৃণার ঘন ব্যঞ্জনা আমাদেরকে কাব্যের এক নব ব্যাকরণের সন্ধান দেয়। যে ভাষা বা বাক্য চিরাচরিত প্রথা থেকে আলাদা বলে আমরা হোঁচট খাই বারবার। গোপনে তাঁর পাঠবস্তু একবার, দুবার, তিনবার, বারবার পড়ে কবিতা শরীরের রহস্যময়তা উদ্ঘাটনের চেষ্টা করি।

'চর্মরোগ' সম্পর্কে যে গূঢ় ব্যঞ্জনা তা আমাদেরকে অভিভূত করে। 'চর্মরোগ' বাংলা কবিতার ইতিহাসে এক অসাধারণ সৃষ্টি। তাঁরই বিখ্যাত কবিতা 'ফিনাইলের ককটেল'। 'ফিনাইল' এবং 'ককটেল' শব্দ দুটোর সঙ্গে যথারীতি আমাদের পরিচয় রয়েছে। ফিনাইল— বিষাক্ত তরল পদার্থ, যার দ্বারা কীটানু নাশ করা হয়। 'ককটেল' শব্দের অর্থ মিশ্রণ বা মিলন। তরল কারণ-জাতীয় পদার্থ নিয়ে যাদের কারবার তাদের মুখে এই 'ককটেল' শব্দটা প্রায়ই শোনা যায়। বাংলা কবিতায় চিরাচরিত যে নামকরণ, তার থেকে প্রদীপ চৌধুরীর কবিতার নামকরণ সম্পূর্ণ আলাদা। এই প্রথা হাংরি কবিরা বারবার রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। প্রদীপ চৌধুরীও এই ক্ষেত্রে হাংরি আন্দোলনের শর্ত মান্য করে এক সফল কাব্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

'ফিনাইলের ককটেল' একটি গদ্যধর্মী কবিতা। রাবীন্দ্রিক কিংবা জীবনানন্দীয় কিংবা আধুনিক কবিতার যে ছন্দ তা সম্পূর্ণ বর্জিত একটি পাঠবস্তু। কবিতাটিতে বিরতি চিহ্ন ব্যবহৃত হলেও পাঠক ইচ্ছে মতো যেখানে খুশি তার শ্বাসবায়ু নির্গত করতে পারেন। কিন্তু পাঠপ্রক্রিয়াটি বিষয়ের এলোমেলোতার জন্য অধুনান্তিক চিন্তাচেতনায় জটিল ও রহস্যময় করে তুলেছে। সেই সঙ্গে ছন্দ ভাঙার ক্রীড়া স্বরূপ গণিত ব্যবহার করেছেন কবি আনন্দের লহমায়।

সুন্দর বা সুন্দরী প্রবৃত্তির ছন্দ-অলংকার মিশ্রিত ঝটিতি ফর্মকে নস্যাৎ করে মুক্ত কবিতা রচনার বিশিষ্ট প্রতাপ ফুটিয়ে তুলেছেন প্রদীপ চৌধুরী তাঁর কবিতাচিন্তায়। "কিন্তু জীবনের পুরো ব্যাপারটা নিয়ে প্রদীপের যে কারবার, নিজেকে আলাদা করে রাখার চেষ্টা, সবাইকে এড়িয়ে যাবার ঝোঁক, নিজের বাড়িতে ঘরকুণো, তাঁর কবিতা কেউ পড়ছে কিনা সে ব্যাপারে আগ্রহের অভাব, কাব্যগ্রন্থের আলোচনা বা রিভিউ সম্পর্কে স্পৃহাহীনতা, সব মিলিয়ে অত্যন্ত জটিল একজন প্রদীপের পরিচয় পাই। যন্ত্রণার অভীষ্টে নিশ্চয়ই কোনো গোপন আনন্দ আছে।"[৩৪] বাস্তবিক প্রদীপ চৌধুরীর কবিতায় যন্ত্রণারই নিংড়ানো কশ চুঁয়ে চুঁয়ে এক অনন্য নাশকতার সৃষ্টি করে। তাই কবিতাগুলো স্বয়ংসম্পূর্ণ।

'ফিনাইলের ককটেল'-এ ফুটে উঠেছে নিরাশা, দুঃখ, ঘৃণা, বেদনা, ইত্যাদি। কবির হাহুতাশ— সমাজ ব্যবস্থা ও আধুনিকতা নামক ঝাণ্ডার পতপতানি শব্দের প্রতি। এই জঞ্জালময় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে কবি বুঝতে পারছেন না তিনি কোথায় আছেন। তাঁর মনে হচ্ছে শরীরের সঙ্গে মাথাটাও যেন সঠিক স্থানে নেই। আজ হঠাৎ কবির এমন অনুভূতি হল। এখন 'নিরাপত্তাবোধ ও যৌনতা' সন্দেহের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মায়ের থেকেও বেশি প্রয়োজন দেখাচ্ছে স্বার্থপর মানুষরা সভ্যতা ও ব্লাস্টফার্নেসকে। ধূ...ধূ... মরুভূমির মধ্যে দাঁড়িয়ে কবি অনুভব করছেন, সময় চেতনাহীনতার ব্যাপার। মানুষ মানুষের দিন দিন ক্ষতি করে তার রক্ত-মজ্জা শুষে নিচ্ছে, তবুও কোনো প্রতিবাদ নেই। কবির বিশ্বাস শয়তানরাই একদিন শয়তানের গলা টিপে ধরবে।

কবি সমস্ত কিছু থেকে আপনাকে দূরে সরিয়ে রেখে একজন ভালো মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকতে আগ্রহী। তিনি নিজেকে ভালো মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার অর্থ— নিজেকে ঠকানো ছাড়া আর কিছু নয় বলেই তাঁর দৃঢ় মত। তাই তিনি দুঃখে ফিল্মের গান গেয়ে আনন্দে জীবন অতিবাহিত করতে চান। প্রকৃতির ভয়াবহতা সম্পর্কে ভাবতে ভাবতে অন্তরে অন্তরে চিৎকার মারফত অসুস্থ হয়ে পড়ছেন কবি। চিৎকার করার ফলে তাঁর বুক ফেটে যাচ্ছে বলে তিনি ফুসফুস চেপে ধরছেন। তাই তিনি মা-কে সঙ্গে নিয়ে দেশি মদ ও ফিনাইল মিশিয়ে পান করে মাতাল সেজে জীবনের খানিক আনন্দের পরই প্রাণত্যাগ করতে চান। কেননা, মা সন্তানকে বহু কষ্টের পর জন্ম দিয়ে লালন-পালন করে বড় করলেও তার পরিবর্তে পুত্র মাকে বারবার-ই আঘাত দিয়ে চলেছে বিভিন্ন ভাবে। মা-কে সুখী করতে চাইলেও পুত্র ব্যর্থ হওয়ার ফলে সে মাতৃ-দুগ্ধের ঋণ শোধ করার পরিবর্তে প্রাণ নিয়ে তাঁকে মুক্তি দিতে চায়। তাই, হে কলকাতা— তুমি কলকাতাতেই থাকো। পৃথিবীতে প্রদীপ চৌধুরীর মতো মানুষের দরকার নেই বলেই কবি মনে করেন, সেই অর্থে তিনি পরজন্মের প্রয়োজন অনুভব করেন না।

কবি জেনে গেছেন, এই সাধারণ অবহেলিত আউটসাইডার হাংরি আন্দোলনের 'লম্পট' কবি মানুষটি ইতিহাসে কোনো দাগ রেখে যেতে পারবেন না। আধুনিকতা নামক কনসেপ্টকে নিয়ে একদল মানুষ যে অহংকার করে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, সেই আধুনিক শতাব্দীটা দশ-হাজার বছরেও শেষ হবে না বলে কবি মনে করেন। এর সমস্ত কলঙ্ক সারাতে সারাতে মানুষ একদিন আর কিছু শুনতে পাবে না এবং তার ক্ষমতাও তারা হারিয়ে ফেলবে।

নারীর প্রসব যন্ত্রণার মতো কবি একটি কবিতা প্রসব করে আনন্দ অনুভব করেন। তাই সভ্যতার চেয়েও কবিতা অনেক জরুরি। প্রদীপ চৌধুরী একে একে নির্মাণ করে চলেন কবিতার নতুন দিগন্ত। অনুভব করেন পৃথিবীর চর্মরোগ। তিনি লেখেন—

> "কোলকাতার নীচতা ও দাম্ভিকতা, ঘরবাড়ী, বেশ্যা আমার
> 48 Kg অস্তিত্ব নিয়ে চিৎপটাং হয়ে আছে,... আমার চামড়ার
> এই মারাত্মক ক্ষেদ তোমার নাভির মোচর থেকে উঠে আসছে,
> কলকাতা— আমার পাকস্থলীর কলকব্জা, আমার অবৈধ অনুপ্রেরণা"[৩৫]

চর্মরোগ হলে রক্ত ও চামড়াকে দূষিত করে ফেলে এবং তারফলে পঁচন দেখা দেয়। ঠিক তেমনি প্রদীপ চৌধুরী অনুভব করছেন পৃথিবীর চর্মরোগের। যার ফলে মানুষের চিন্তা-চেতনায়, মনুষ্যত্বে পঁচন ধরে গেছে, সেই পঁচন-ই হচ্ছে 'চর্মরোগ'। কিংবা বলা যায় পৃথিবী হচ্ছে একটা চামড়া এবং মানুষ হচ্ছে সেই চামড়ার মস্ত রোগ। "পৃথিবীর চামড়ার উপর সবচেয়ে বড় অসুখের নাম মানুষ।"[৩৬] সত্য সন্ধানই কবির অভীষ্ট। তাই কবি মানুষ নামক রোগটাকে চিহ্নিত করে দুঃখ, যন্ত্রণা, অপমান ইত্যাদির জ্বালা মেটান। 'চর্মরোগ' নামক কবিতাটিতে চরম বিশৃঙ্খলা, মিথ্যাচার, অন্যায়কে প্রচণ্ড তীব্রভাবে ফুটিয়ে তুলে গূঢ় সত্যকে উদ্ঘাটিত করেছেন প্রদীপ চৌধুরী। কবিতার এই 'বহুতল' বিশিষ্ট নামকরণটিও হয়ে উঠেছে সার্থক।

প্রদীপ চৌধুরীর জীবনের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অন্যান্য তৎপরতা ও আমি' (১৯৬৪)। এই কাব্যটিও গদ্যধর্মী প্রক্রিয়ায় রচিত। দীর্ঘ কবিতা। পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। কবিতাটি সম্পর্কে জয়দীপ মাইতি লিখেছেন— "'অন্যান্য তৎপরতা ও আমি' একটি বিমূর্ত বিচূর্ণ শৃঙ্খলা, এক প্রবল মানসিক নিপীড়ন এবং সমসায়িকতায় একজন মানুষের নিজেকে দেখা অন্ত অনন্তের দ্বন্দ্বাভিঘাতে"[৩৭] পাঠবস্তুটি সম্পূর্ণ মস্তিষ্কগত করার পর নামকরণ প্রমাণ করে ব্যক্তি প্রদীপ চৌধুরীর অতীত জীবনে ঘটে যাওয়া প্রেম-ভালোবাসা-দুঃখ-অপমান-যন্ত্রণা ও জীবনের বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত এবং অন্যান্য তৎপরতার সত্য ইতিহাস। কবিতায় 'আমি'-র উপস্থিতি সব সময়ই সত্য রূপে প্রতিভাত হতে দেখা যায়। তাই হাংরি মন্ত্রে দীক্ষিত প্রদীপ চৌধুরীর কবিতায় তার ব্যতিক্রম কল্পনা অবাস্তব।

পাঠবস্তুটিতে কবি 'আমি'-কেই বেশিভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন এবং 'আমি'-কে কেন্দ্রে রেখে মাঝে মাঝে অন্যান্য বিষয়ের প্রতি যত্নবান হয়েছেন। নিজের বাস্তব জীবনের গোঙানো মুচড়ানো দিনগুলোর কথামালা শব্দ শৃঙ্খলার এক অনন্য সাধারণ রূপ নেয় কবিতাকারে। প্রদীপ চৌধুরীর আশার ঝাপি বারবার রুদ্ধ হয়ে যায় নানা প্রক্রিয়ায়। কবি প্রতিনিয়ত এক-একটি শব্দ যোজন করে নিজের স্বকীয় আত্মার কাছে ফিরে আসেন। প্রদীপ চৌধুরীর কাছে সব কিছুই যেন এখন মৃত্যু মনে হয়। স্বাধীন চিন্তাকে বারবার মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে এক শ্রেণির মানুষ। তারা চায় না সত্যবাদী, সৎ, সাহসী দামাল কোনো যুবক মাথাচাড়া দিয়ে উঠুক এবং তারফলে প্রাচীন পন্থীর মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হোক। মৃত্যু সম্পর্কে কবি লেখেন—

"মৃত্যু
মৃত্যু
মৃত্যুজ্ঞ
জীবনযাত্রা মৃত্যু, আবিষ্কার মৃত্যু, আত্মহত্যা মৃত্যু, যশ ও ক্ষমতার শ্বেতমাদক
মত্যু, অনাহার মৃত্যু, পাগলামো মৃত্যু, নেশা করা মৃত্যু, জীবনযাত্রা ও বদমাইশি
মৃত্যু, সন্ন্যাসী মৃত্যু, হাইতোলা মৃত্যু, বিবাহ মৃত্যু, প্রদীপ চৌধুরী মৃত্যু,"[৩৮]...

অদৃষ্টের বিধান, তাই কবিকে স্থানান্তরিত হতে হচ্ছে বারবার। যেখানে যাচ্ছেন সেখানে ভালো-খারাপ সব কিছুকে নিয়ে যাচ্ছেন। জীবনে যা 'হাবিজাবি' লিখেছেন সেগুলোও রয়েছে সঙ্গে। আরও রয়েছে ফটোগ্রাফ ও অন্যান্য অনেক জিনিস। তাই '১০ লক্ষ শিরার ভেতর দিয়ে' তাঁকে চলে যেতে হচ্ছে অর্থাৎ অসংখ্য অপমান সহ্য করে রক্তের ঝাঁকুনি অনুভব করছেন শিরায় শিরায়। ক্রমাগত বদল ঘটার ফলে 'মুখচ্ছবি' কেউ মনে রাখতে পারে না। একজন হাংরি কবির অস্তিত্ব মুছে দিতে মানুষের মস্তিষ্ককে শোধন করার সঙ্গে সঙ্গে অপমানের তিলক লেপে দেওয়া হচ্ছে প্রতিনিয়ত। কিন্তু কবি তাঁর বিশুদ্ধ হৃদয়ে অল্প সময়ের জন্য নিজেকে গুটিয়ে রাখার চেষ্টা করলেও তিনি আবার যথাস্থানেই ফিরে আসেন। চলন-বলনে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। তার ফলে সুখের মৃত্যু ঘটছে অহরহ এবং আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে সুসম্পর্ক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সততা রক্ষায় কবির কোনো ধরনের কার্পণ্য নেই। কবি মনে করেন এমন দুরূহ কাজ সম্পর্কে সবাই জ্ঞাতব্য।

কবি যখন 'অন্যান্য তৎপরতা ও আমি' লেখেন তখন তিনি কলকাতার বাসিন্দা, তাই পুরো শহর চষে বেড়ান। পাঁচমাথার মোড়ে তিনি দাঁড়িয়ে দেখেন মুণ্ডহীন মানুষের চলাফেরা অর্থাৎ এরা মানুষ, কিন্তু বাস্তবিক মানুষ বলে ঠিক মনে করেন না কবি। মানুষ যে প্রতিনিয়ত মিথ্যা কথা বলছে তার প্রমাণ হয় যখন কোনো মানুষকে কাঠগড়ার সামনে ১৬ ইঞ্চি মাথা হেট করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এই মানুষদের পরিচয় কখনও চোর এবং কখনও সন্ন্যাসী হিসেবে। এদের দেখে বিদেশি যে কেউ সহজেই বুঝে নেবেন এই মানুষ নামক কলকাতাবাসী হাজার বছর ধরে মিথ্যে কথা বলার অভ্যেস করেছে। নেশাগ্রস্ত মানুষের চেতন ফিরলে সে যেমন সহজ হবার ভান করে মাত্র তারপর আবার নেশায় মেতে ওঠে। যীশুর মৃত্যুর ২০০০ বছর পর আবার মানুষের মধ্যে 'তেজস্ক্রিয়' ঘটনার প্রয়োজন হতে পারে বলে কবি অনুভব করেন। আমাদের সভ্যতা কোন পথে চলছে তা স্পষ্ট বোঝা যায় কলকাতার পাঁচমোড়ে দাঁড়ালে। কবি লিখেছেন—

"পাঁচমাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে ঘাড়কাটা মানুষের চলাফেরা দেখছি,
কাঠগড়ায় ১৬ ইঞ্চি মাথা হেট করে চোর ও সন্ন্যাসী, বিদেশী
যে কেউ ধরেই নেবেন যে কয়েক হাজার বছর ধরে মানুষ
মিথ্যেকথা বলা অভ্যাস করেছে"[৩৯]...

তৃতীয় পরিচ্ছেদে কবি 'আমি'-কেই যেন মেলে ধরেন। অসংখ্যবার (৮৭ বার) আক্রমণ করার পরও কবি ও তাঁর শরিক বন্ধুরা সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে এক অনন্ত আলোর দিশারী হন। তবুও শেষ পর্যন্ত কলকাতার হোটেল-মেস প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করে একদিন তাঁকে দূরে চলে যেতে হল।

কবি অনুভব করেন, একই কথা বারবার বলে কোনো নারীকে বেশি দিন বশে রাখা যায় না। দু'বছর আগেও কবি আত্মীয়-স্বজনদের থেকে অতিরিক্ত ভালোবাসা পাওয়ার উৎসাহ রাখতেন, কিন্তু এখন সমস্ত ভালোবাসার মধ্যে তিনি আবিষ্কার করেন লোভ অপরাধপ্রবণতা, ঘৃণা, আত্মপীড়ন ইত্যাদি। নারী এবং পুরুষ বলে যে দুটো মেরু রয়েছে ঠিক তেমনি কবি উপলব্ধি করেন— সমস্ত ভালোবাসার মধ্যে দুটো মেরু। তাই তিনি স্বপ্নের মধ্যেও ভয়ে চিৎকার করে ওঠেন। কোনো সহানুভূতি তাঁকে চরিতার্থ করতে পারছে না। কবি যখন 'হাংরি জেনারেশন' নিষিদ্ধ সংখ্যায় লেখার অপরাধে গ্রেফতার হলেন তখন তাঁর সতেরোবার মৃত্যু ঘটে। এটা কবির আত্ম উপলব্ধির গোঙানি মাত্র। অন্যান্য তৎপরতায় উদ্দেশ্যহীনভাবে জানালার দিকে তাকিয়ে সমস্ত স্মৃতি-বিস্মৃতিকে মন থেকে মুছে দিয়ে এখন মানুষের কাছাকাছি যাওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় সংকল্প হন তিনি। অন্যকে ভালোবাসার সুযোগ দিয়ে স্বার্থবোধ থেকে মুক্ত হতে চান। উপলব্ধি করেন— ঈশ্বর ও সভ্যতার চেহারার পরিবর্তন ঘটাতে ভালোবাসাই সবচেয়ে বড় অবলম্বন। তারপর কবি রচনা করেন—

> "আমার প্রিয় কুকুরীর জন্য সমবেদনা জানাতে কোনো
> বাটপাড় এখন জেগে থাকবে না... গত বছর জন্মদিনে
> যত মদ গিলেছিলাম— অর্থাৎ জীবন, লাল পাথরের
> দেয়ালে তোমার মাই টিপে ধরেছিলাম প্রেয়সী, প্রেয়সী !...
> ১০০০০ পাওয়ার বাল্বের নিচে উলঙ্গ অবস্থায় নিজের
> মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছি,... আমার ২২ বছর বয়স,
> ২২ বছর,... প্রদীপ চৌধুরী প্রদীপ চৌধুরী, আর কি ধরনের
> বলাৎকার হতে পারে"[৪০]

কবির যন্ত্রণা দিন দিন বেড়ে চলে। আরামদায়ক নিদ্রায় এখন তাঁর চামড়া ছিঁড়ে যাবার উপক্রম, কারণ ভবিষ্যৎ জীবনে এগিয়ে যাবার পথে নিজেকে প্রস্তুত করতে শরীর ও মনের মধ্যে একটা বিদ্রোহ, প্রতিবাদ সত্যরূপে তোলপাড় করে উঠছে। অনুভব করছেন— চারদিক থেকে তাঁর সমসাময়িক যোদ্ধারা ঘিরে ফেলছে তাঁকে। সমস্ত রুদ্ধ মনোভাব ও আত্মাকে চৌচির করে একটি অতিরিক্ত আকর্ষণ কবিকে নিঃস্ব করে দিচ্ছে। কবি কিছুদিন একা থাকতে চেয়েছিলেন, তার কারণ— সমস্ত তুচ্ছ প্রাণীকুলকে তিনি আঁকড়ে ছিলেন আপন হৃদয়ের মাধুরী মিশিয়ে দিতে। এখন পোস্ট অফিসে গিয়ে কিছু লাল পোস্টকার্ড কেনার কথা ভাবছেন। এই লাল পোস্টকার্ডে কবি আপন হৃদয়ের জ্বালা চিৎকার করে ঘোষণা করবেন, এই তাঁর অঙ্গীকার। এরফলে কৈশোর জীবনের সমস্ত স্মৃতি ভেসে আসছে এবং সেইসঙ্গে প্রেমিকারা ভবিষ্যৎ থেকে দূরে কোথাও বিশ্রাম নিচ্ছে। একদিন প্রেমিকা ও কৈশোর- স্মৃতি সম্পূর্ণ হারিয়ে যাবে। এখন বিভিন্ন দুঃখ-কষ্টের মধ্যে পেট থেকে মোচড় দিয়ে বেরিয়ে আসছে গত জন্মদিনের নেশার কথা, যা চির সত্য, তা হল— প্রেয়সীর নরম শরীরের স্পর্শ। কবি সমস্ত স্মৃতিকে ভুলে, সমস্ত সুখকে ভুলে, সমস্ত দুঃখকে ভুলে নিজেকে যতই শেষ করার কথা ভাবছেন ততোই নিজের সম্পর্কে সন্দেহ বেড়ে যায়।

বাঁচার স্বাদ সবারই সমান। মানুষ মাত্রেই আশাবাদী। তাই ঝকঝকে আলোর নিচে বিবসন অবস্থায় নিজেকেই সন্ধান করছেন কবি। কিন্তু এক জীবন চলাফেরার মধ্যে মানুষ জন্মকে শেষ করে দিলেন তিনি। কবি বুঝতে পারছেন না এই মিথ্যার সাম্রাজ্যে আরো কতদিন তাঁকে মিথ্যা কথা বলতে হবে ! আর কতদিন এই প্রাণ রক্ষা করে মিথ্যাবাদীদের সঙ্গে একাসনে জীবন কাটাতে হবে ! এখন শান্ত জীবনের সন্ধানে কবি আত্মমগ্ন হতে চান। এই বাইশ বছর বয়সে এক ঝাটকায় সমস্ত অভিজ্ঞতা আয়ত্ত করে অনুভব করছেন— শিশুরা ভয়াবহতার মধ্যে জন্মাচ্ছে। কলকাতার মানুষ নিজের ভাগ্যকে উলট-পালট করে দেখার চেষ্টা করছে। কবি সমস্ত দুঃখ বিসর্জন দিয়েছেন। এই বাইশ বছর বয়সেই মৃত্যু সন্ধানী বলে অন্যেরও মৃত্যু কামনা করেন। সহ্যশক্তি প্রচণ্ডভাবে প্রেরণা দেয়, তবুও বোঝেন শরীর ও মনের একটা অমিল ব্যাকরণ। প্রদীপ চৌধুরীর জীবনটা আর কত রকমে বিষাক্ত হয়ে উঠতে পারে তা কে উপলব্ধি করতে পারেন। কবি পঞ্চম পরিচ্ছেদে লিখেছেন—

> "কলেজে পড়তে পড়তে অগুণতি কবিতা লিখেছি তোমাকে
> নিয়ে, বোকামি, আমি বোকা হতে চেয়েছিলাম, প্রেমের জন্যে
> যতটা বোকা হওয়া দরকার, নিজের লেখা পাণ্ডুলিপি তোমার
> নোট বইয়ের ভেতর গুঁজে দিয়ে শারীরিক ভাবে জ্বলেছি,
> সারারাত বাউণ্ডুলে স্বপ্নের ভেতর, দরকার হলে আমি
> এভেন্যুতে হাজার চোখের সামনে তোমাকে চাবকাতাম,...
> TO BE OR NOT 2B,"[৪১]

কবির যৌবনকালে পাঠাভ্যাসরত সময়-সীমায় প্রেম এবং তার পরিণতি স্বরূপ উত্থান-পতন, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনাময় জীবনে যে ভাবে দিন-রাত কেটেছে তারই হিসেব-নিকেশ এই পঞ্চম অধ্যায়ে প্রথম ও দ্বিতীয় চরণে বর্ণিত হয়েছে। হাংরি কবিরা মিথ্যা বলেন না, সত্যকে রঙ দিয়েও সাজানো এঁদের দর্শন বিরুদ্ধ। প্রেমের ব্যাপারে একটি যুবক নিজেকে কতটুকু নিঃশেষ করে বিলিয়ে দেয় তারই সত্য কথন কবি যেন পলি-মাটি দিয়ে উপস্থাপন করেছেন, যা হাংরি কবিতার যথাযথ বৈশিষ্ট্যে প্রতিষ্ঠিত।

ভালোবাসায় নিজেকে সম্পূর্ণ করে দিয়ে কবি হতাশ হয়ে পড়েছেন। কম বয়সের প্রেম অস্থায়ী হওয়ার ফলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জীবনকে করে দেয় বেদনাময়। এখন কবি সমস্ত কিছুকে ভুলে কলকাতার বুকে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। বুঝতে পারছেন, যৌবনের উন্মত্ত অসুখের মধ্যে প্রণয়িনীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল ; এমন দেখা না হলেই ভালো হতো। তবুও তিনি সমস্ত কাজের চাপে, সংসারের ঘানিতে ঘুরতে ঘুরতে যেন প্রণয়িনীর কাছে ফিরে আসছেন। সমস্ত বাধাকে চৌচির করে তাকে পেতে চান কবি। সমস্ত স্মৃতিকে আওড়ে অনুভব করছেন— প্রণয়িনীর সঙ্গ খুবই জরুরি। কিন্তু এই প্রেমকে কতটুকু মর্যাদায় স্বীকার করতে পারবেন— সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ। কেননা— ভালোবাসা এখন অন্তর থেকে অন্তর্হিত প্রায়। কবির এই স্বীকারোক্তি কিংবা গোঙানি সত্যরূপে প্রতিভাত হয় আমাদের সামনে।

প্রদীপ চৌধুরীর আরো একটি বিখ্যাত কবিতা 'বাবা আমার বর্বরতা' (১৯৬৪)। কবিতাটি 'হাংরি জেনারেশন'-এর নিষিদ্ধ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তখন কবি ত্রিপুরায় বসবাসরত। নিষিদ্ধ সংখ্যায় লেখা প্রকাশ করার জন্য কবিকে লালবাজার পুলিশ ত্রিপুরা থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে কলকাতায়। কবিতাটি পাঠকালে অশ্লীল বলেই আমাদের মন সায় দেয়—

"কে কার পেশীর মাংস খাবলে ধরবে আমি ছাড়া কে ঐ দগদগে মূত্রাশয়ে
আঙ্গুল চালাতে গিয়ে ঘৃণা ও লজ্জার চেয়ে আরো দীর্ঘ অনাহার ও
সাঙ্ঘাতিক চরিত্রহীনতা ...
মা, শেষ দুষ্কৃতকারী আমি তোর নীল মূত্রাশয়ে
বাবা, আমার বর্বরতা তোমার বর্বরতাকে ধর্ষণ করেছে।"[৪২]

আমরা যাকে অশ্লীল বলছি সেটা কী ? অশ্লীল বলে কোনো শব্দ থাকলেও তার সংজ্ঞা আজ পর্যন্ত কেউই উপস্থাপন করতে পারেননি। আর অশ্লীল বলে যদি কোনো জিনিস নিষিদ্ধ করা হয় তাহলে— পার্বতীর যোনির মধ্যে গেঁথে থাকা শিব লিঙ্গের পূজাও নিষিদ্ধ। কামাখ্যা মন্দিরে বছরে একবার মা কামাখ্যার রজঃস্রাব বহির্গত ব্যাপারটা নিয়ে মহড়া করে পূজা নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ বলে— কোনারকের সূর্য মন্দিরে সূর্য দেবতার উলঙ্গ মূর্তি ভেঙে দেওয়া উচিত। সেই মন্দিরের গাত্রে চৌষট্টি কাম-কলার দৃশ্য নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন। জৈন ধর্মের ধর্মগুরুরা উলঙ্গ অবস্থায় শিশু-নারী-যুবতীদের সামনে বসে হাস্যমুখে কথা বলাটাকে নিষিদ্ধ করে তাঁকে জেলে পাঠানো দরকার। কিংবা রামায়ণ, মহাভারত, গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ইত্যাদি গ্রন্থগুলোর বিভিন্ন ঘটনা ও বাক্য কর্ণগোচর করে নিষিদ্ধের লেবেল দেওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। প্রদীপ চৌধুরীর মতে কোনো জিনিস বা expression কে নিষিদ্ধ না বলে গ্রহণীয় নয় বলা ঠিক।

গ্রহণীয় নয় এমন কিছু শব্দ উচ্চারিত হয়েছে 'বাবা আমার বর্বরতা' কবিতায়। গ্রহণীয় না হওয়ার কারণ— আমাদের সমাজ ব্যবস্থা কতগুলো নিয়মে গড়া। এই সমাজ ব্যবস্থায় কিছু শব্দ প্রকাশ্যে উচ্চারণ করা অপরাধ বলে গণ্য হয়। যে সমস্ত শব্দ কবি তাঁর কবিতায় উচ্চারণ করেছেন সেগুলো আমাদের জীবনের গোপন ইন্দ্রিয়ের সুখ সম্পর্কিত কিংবা অপরাধ সম্পর্কিত। তবুও বলা চলে জীবন সম্পর্কিত। খুল্লমখুল্লা নয় বলে আমাদের কাছে বেমানান। কিন্তু কবি কোনো কিছুর পরওয়া করেন না বলেই বর্বরতার পরিচয় দেন।

কবির দৃষ্টিতে সবই বর্বর। কবি নিজে বর্বর, তাঁর মা, বাবা, আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবী, প্রেমী সবাই বর্বর। বর্বর অর্থে— নিষ্ঠুরতা, নীচতা, মূর্খতা, অসভ্যতা ইত্যাদি বোঝায়। কবিতাটির মধ্যে বর্বরতার বিভিন্ন প্রকাশ পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়। কবি লেখেন নষ্ট হওয়ার কথা, নষ্ট করার কথা, ভ্রষ্টাতার কথা, জখম করার কথা, বলাৎকার করার কথা, হত্যার কথা, ইত্যাদি। কবি শেষ চরণে লিখেছেন— তাঁর বাবা যত বড় বর্বর ছিলেন তিনি তার থেকেও বড় বর্বর। শক্তিশালী যেমন দুর্বল রমণীকে ধর্ষণ করে ঠিক তেমনি কবি ধর্ষণ করেছেন বাবার বর্বরতাকে। পৃথিবীর মানুষ এখন বর্বরতায় পূর্ণ। তাই কবিতাটির নামকরণও সার্থক।

প্রদীপ চৌধুরীর কবিতা নাশকতা সম্পর্কিত এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। "প্রত্যেক কবিরই নিজস্ব ফোনেটিকাল কাঠামোয় গড়ে ওঠে তাঁর কবিতা।... প্রদীপের ফোনেটিকাল কাঠামো এবং তাঁর কবিতার মডুলেশন— যোগ্যতা একেবারে আলাদা।... রুদ্ধতা বদ্ধতা বন্দীত্ব ভবিষৎহীনতা ধূসর বিবর্ণ শূন্যগর্ভতা নেতি এইসব থেকে প্রদীপ মুক্ত, কেননা প্রথম থেকেই অনির্বাণ যৌনতা তাঁর অস্তিত্বের কেন্দ্রে।... যে কালে বিজ্ঞাপন হয়ে উঠেছে সংক্ষিপ্ত এবং মেদহীন, প্রদীপ মনে করেন সেকালে কবিতাকে হতে হবে ভারবোজ, অতিকথনের লতায় জড়িয়ে দিতে হবে পাঠককে, বোধের ধারাপ্রবাহকে আখছার চিন্তা দিয়ে টুকরো করতে হবে, কেননা কবিতা লেখার আছিলা হয় না। একের পর এক হাইপাররিয়াল ছবি আসতে থাকে ওঁর কবিতায়।"[৪৩] প্রদীপ চৌধুরীর কাব্যভুবনে প্রবেশ করে বোঝা যায় তিনি জীবন নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মেতে উঠেছিলেন। সেই অর্থে তাঁর কবিতায় আছে পালাবদলের ইঙ্গিত। তাই তিনি হাংরি জেনারেশনের বিশিষ্ট কবি হিসেবেই চিহ্নিত হয়ে থাকবেন বাংলা কাব্যের ইতিহাসে।

* * * * *

হাংরি আন্দোলনের চারজন 'নিউক্লিয়াস'-এর একজন হলেন দেবী রায় (১৯৩৮ —)। সে সময় তিনি মলয় রায়চৌধুরীর অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। হাংরি আন্দোলনে যুক্ত হবার আগে তিনি হারাধন ধাড়া নামে নিজেকে পরিচয় দিতেন। আমরা লক্ষ্য করি তিনি প্রথম হাংরি ইশতিহারে সম্পাদকের আসনে প্রতিষ্ঠিত। দেবী রায় হাংরি আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত থাকলেও ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁর একটিও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে যে কবিতা লিখেছেন তাতে তাঁকে হাংরি আন্দোলনের একজন অন্যতম কবি হিসেবেই চিহ্নিত করতে হয়। বাস্তবিক হাংরি আন্দোলনের সময় খুব বেশি লেখা কেউই লেখেননি। কারণ সবারই উদ্দেশ্য ছিল কম লিখবেন, কিন্তু বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির ভিত কাঁপিয়ে দেবেন এবং তাঁরা সফলও হয়েছেন সর্ব সাকুল্যে। ষাটের দশকের পূর্ববর্তী কবিদের একঘেয়েমি চিন্তা এবং আধুনিকতা নামক পাহারাওয়ালার মাথায় জোরে আঘাত দেবার যে ইচ্ছা তার সমস্ত কিছুই দেবী রায়ের কবিতায় স্পষ্ট। তাঁর কবিতায় ফুটে উঠেছে ষাট দশকের কালজিজ্ঞাসার অভিব্যক্তি।

দেবী রায়ের কবিতার প্রিয় বিষয় মানুষ। তিনি একটি কাব্যগ্রন্থের নামকরণও করেছেন— 'মানুষ মানুষ' (১৯৭১)। মানুষের অস্তিত্ব ও জীবন তাঁকে বারবার আন্দোলিত করেছে বিভিন্ন মৌল জিজ্ঞাসায়। "জীবনকে তিনি নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন এবং তাঁর এই ঘনিষ্ট অবলোকন থেকে জন্ম নিয়েছে এক একটি উজ্জ্বল কবিতা। অপমান এবং লাঞ্ছনা থেকে জন্ম নিয়েছে ক্রোধ এবং এই ক্রোধ সংক্রমিত হয়েছে এক মরিয়া জীবনবোধে। যে বিন্দুতে পৌঁছলে মানুষ কোনো বিপর্যয় বা প্রতিকূলতারই মোকাবিলা করতে পিছু-পা হয় না।"[৪৪] কলকাতা শহরে কবির জন্ম না হলেও অন্তরে অন্তরে কলকাতা তাঁর প্রিয় শহর হয়ে উঠেছিল। দেবী রায়ের বিভিন্ন কবিতায় কলকাতার কথা আছে। কাব্য ও কবিতার নামকরণেও কলকাতা উঠে এসেছে। কলকাতা এবং কলকাতার মানুষকে কেন্দ্রে রেখে এত কবিতা বোধ হয় আর কোনো কবি লেখেননি। তাঁর একটি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের নাম— 'কলকাতা ও আমি' (১৯৬৮)। কলকাতা বিষয়ক কবিতার কয়েকটি হল— 'প্রতিবাদ কলকাতা', 'কলকাতা ও কলকাতা', 'আরেক কলকাতা', 'কী দেবে কলকাতা', 'আমার পৃথিবী... কলকাতা', ইত্যাদি।

হাংরি আন্দোলনের সময় লিখিত শরিকদের কবিতা পাঠে বোঝা যায় আধুনিকোত্তর চিন্তার ফসল ফলানোর ভাষ্য। সমস্ত নন্দন প্রতাপের রক্তচক্ষুকে অবজ্ঞা করে এক ভাঙা-গড়ার মজুতদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে যুক্তিনিষ্ঠতাকে ফাঁসির মঞ্চে ঝুলিয়ে যা সত্য ও ঠিক মনে করেছেন তাঁরা তাকেই কাব্য-কবিতায় স্থান দিয়েছেন। এঁদের দর্শন ভিন্ন হওয়ার ফলে 'আনকোরা' ভাষায় কাব্য আস্বাদনে মাথায় ঝিমঝিম এসে যায়। তবে অন্যান্য হাংরি কবিদের বলন প্রক্রিয়ায় অশ্লীল ও যৌন শব্দের যে আলঙ্কারিকতা তা দেবী রায়ের কবিতায় অনেকাংশে ম্রিয়মাণ। হাংরি আন্দোলনের সময় লিখিত 'আমি ও কলকাতা' কবিতার অংশ বিশেষ পাঠ করে দেবী রায়ের কাব্য ধারণা সম্পর্কে অবগত হতে পারি।

"— ফ্রণ্ট দুয়ার বন্ধ, কলকাতা তোমার পাছ-দুয়ার খোলা
ড্রাইডে-তে আমি চলে আসি— তোমার কোমরের আরো নিচ বরাবর
আমার দুঃখের দিনে—
কলকাতা আমার সুখের দিন বড়ো কম— তোমার কড়ে আঙুল—
গুণেও তো বলা যায়—"[৪৫]

কিংবা—

"২৮ বছর নিরাপত্তা-বোধ ছাড়াই আমার কেটে যাচ্ছে—
কলকাতা তোমাকেও বহাল তবিয়তে রাখতে প্রয়োজন, কার্ফুর ?"[৪৬]

সমালোচকদের মতে উক্ত কবিতাটি গিন্সবার্গের 'আমেরিকা' কবিতার অনুপ্রেরণা প্রসূত। অ্যারিস্টটলের মতে সমস্ত কিছুই অনুকরণ যোগ্য হয়ে থাকলে, একজন কলকাতা প্রেমীর কাছে ভারতের আকাশ যেমন আমেরিকার আকাশও তেমনি। কলকাতা শহরের সঙ্গে কবির নাড়ীর টান। হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি কলকাতার ফুটপাত চষে বেড়িয়েছেন রোদে-বৃষ্টিতে-রাতের অন্ধকারে। তাই কলকাতাকে দেখেছেন অভিজ্ঞতার সকল দৃষ্টি মেলে। কবির জন্য কলকাতার 'ফ্রণ্ট দুয়ার' বন্ধ, কারণ হাংরি আন্দোলন যখন চরমে তখন দেবী রায় হাংরি ইশতিহার সম্পাদনার সঙ্গে সঙ্গে প্রেসে ছাপার কাজ দেখা, বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেয়া এবং কলেজ স্ট্রিটে ফুটপাতে বিলিকরা ও কফি হাউসের দেয়ালে আঠাদিয়ে লাগিয়ে দেবার দায়িত্বও ছিল। এই সমস্ত কারণে কলকাতায় সহজ ভাবে চলাফেরার পথ দেবী রায়ের জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল প্রায়। কিন্তু কবির জন্য কলকাতার পাছ দুয়ার খোলা ছিল। তাই সকলকে ফাঁকি দিয়ে কবি কলকাতায় ঘুরে বেড়াতেন এবং নিজের কাজের পরিণতি দিতেন। কেননা তিনি ছিলেন দায়িত্ববান যুবক। কবি দেবী রায় যেমন বিভিন্ন ব্যাপারে সুখে নেই ঠিক তেমনি কবির দৃষ্টিতে কলকাতা শহরেরও অনেক অনেক শত্রু, অনেক দুঃখ। কবি তারপরই লেখেন—

"নিত্য আমি আয়নার সাম্নে—
ঝেড়ে ফেলতে চেয়ে
দেখি, তুমি বারবার-ই আটকে যাচ্ছো— চিরুনির দাঁড়ায়
কলকাতা, মধ্যরাত্রের পর নিত্যই— ফুটপাতে তোমার
বিছানা বদল
মশারী— এমন কি, দারুণ শীতেও দেখি তুলোর কম্বল ছাড়াও—
তোমার— কীভাবে যে কাটে রাত !"[৪৭]

কবিতাটির অংশ বিশেষ পাঠ করে দৃশ্যত হয়— চিত্রধর্মীতা। রোমান্টিকতার মেড়মেড়ে কথাবস্তুকে অগ্রাহ্য করে সরল বাচনভঙ্গির মাধ্যমে যন্ত্রণার সত্য রাগ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে কাব্যাংশটিতে। মাটির টান, সমাজমনস্কতা, মানুষের ভালোবাসা ও গভীর বিশ্বাস সত্য রূপ দিয়েছে পাঠবস্তুটিতে। "একজন ছাপোষা মানুষ এই কলকাতার পথ থেকে সারাদিন ঘুরে ঘুরে লক্ষ্য করছে মানুষের গ্লানিময় বেঁচে থাকা, ভণ্ডামি, চাতুরী, শঠতা, সারি সারি মুখোশ, উঁকি মেরে দেখছে সুন্দরী কলকাতার উজ্জ্বল পোশাকের নিচে গোপন করে রাখা ভয়ংকর নগ্নতা।"[৪৮] তাই দেবী রায়কে কবিতার লিপিঘরে আলাদা ভাবে চিনিয়ে দেয় সমস্ত ভিড় ঠেলে। তাঁর ক্ষুধা কলকাতাকে ভালোবাসার ক্ষুধা। মানুষকে ভালোবাসার ক্ষুধা, মাটি এবং মা-কে ভালোবাসার ক্ষুধা।

হাংরি জেনারেশন-এর নিষিদ্ধ সংখ্যায় 'সার্চ' নামে দেবী রায়ের একটি কবিতা প্রকাশ হওয়ার ফলে তাঁকেও কারাবরণ করতে হয়। তখন তিনি বর্ধমান-এ ডাক বিভাগে চাকরি করতেন। দীর্ঘ এক বছর চাকরি থেকে অপসারিত ছিলেন। চাকরি করলেও দেবী রায়ের জীবনে অর্থনৈতিক সমস্যা ছিল প্রচণ্ড। অভিমান ও দুঃখ নিয়ে চলেন তিনি। আজও তাঁর অভিমান ও দুঃখ সমান। তিনি সত্য বলে যা অনুভব করেন তাকেই কবিতায় রূপ দেন। কবিতার জন্যই তাঁর কবিতা লেখা। বিপন্নতা থেকে মুক্তি অসম্ভব, তাই তুচ্ছ বিষয়কে তুচ্ছ শব্দব্রহ্ম দ্বারা ইঙ্গিতময় করে ভারপীড়িত কবির মার্জিত কৌতুক প্রকাশিত হয়—

"মে মাস— তারিখের কোনো প্রয়োজন বোধ নাই—
তারিখ— তারিখের উপযোগিতা টের পাই
মানিব্যাগের স্বাস্থ্য যখন ফেরে— এখন আমার
মানিব্যাগের ক্ষীণতা— অপুষ্ট পীড়া দিচ্ছে
আঃ মানিব্যাগ— মানিব্যাগ— 'হৃদয় বা মন
মস্তিষ্কেরই একটা অংশ' একথা মলয়ের কাছে—
শিখে নেওয়ার পর পর্যাপ্ত তোমাকে আদর
করতে পারিনা আর—"[৪৯]

'সার্চ' কবিতার অংশ বিশেষ প্রমাণ করে কবির অর্থনৈতিক সমস্যার কথা। এককথায়, কবির ক্ষুধা অর্থের। হাংরি আন্দোলনের সময় দেবী রায় মলয় রায়চৌধুরীকে গুরু হিসেবে অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করে নেন। বাস্তবিক মলয় রায়চৌধুরীর কৃপাতেই দেবী রায় হাংরি আন্দোলনে যোগ দেন এবং পরবর্তীতে তিনি বিখ্যাত বা কুখ্যাত হয়ে ওঠেন। তবে মলয় রায়চৌধুরীর কাছে শিখে নিয়েছেন— শিল্পের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাটাই প্রথম শর্ত। মলয় রায়চৌধুরীই শিখেয়েছেন— 'হৃদয় বা মন মস্তিষ্কের একটা অংশ'। এজন্য অর্থের কষ্ট ক্ষুধার্তের কাছে সহ্য শক্তির অফুরন্ত শিক্ষা।

কবি মে-মাসের প্রচণ্ড গরমে পথ চলতে চলতে পরিশ্রান্ত হয়ে উঠেছেন। গরমে চামড়া পুড়ে যাচ্ছে। কবি লিখছেন— 'রক্তে পুড়ে যাচ্ছে চামড়া'। তাঁর মুখ ও চোখের 'কোল' বসে যাচ্ছে, আয়নার দিকে তাকিয়ে তিনি সেটা অনুভব করছেন। একটু একটু ছিঁচকা বৃষ্টি এবং ছুটন্ত ট্রাকের বাতাস কবিকে আরাম দিয়ে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা পাবার উদ্দেশে খাট থেকে মেজেয় নেমে তন্ন

তন্ন করে ঘরময় খুঁজে বেড়াচ্ছেন শীতলতা। মৃতের মতো গোটা শরীরকে বরফ করে দিয়ে এমন কোনো বুকের সন্ধান করছেন যেখানে শুধু শীতলতা, যেখানে শুধু শান্তি, যেখানে শুধু সুখ আর সুখ। এই যে ক্ষুধা, এ-ক্ষুধা দেবী রায়ের ক্ষুধা। এ কোনো প্রেমিক কবির ক্ষুধা নয়, এটা হাংরি কবির ক্ষুধা।

* * * * *

'কৃত্তিবাস' গোষ্ঠীর অন্যতম একজন কবি উৎপলকুমার বসু (১৯৩৭ –)। 'কৃত্তিবাস'-এ থাকাকালীন হাংরি সৈনিকদের নতুন চিন্তাভাবনায় নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে তাঁদের মতো বেশ কয়েকটা কবিতা লিখেছিলেন। তিনি আজও প্রকাশ্যে স্বীকার করেন— হাংরি আন্দোলনকারীরাই বাংলা সাহিত্যে পালাবদল করতে সক্ষম হয়েছিল এবং তার প্রধান প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি মলয় রায়চৌধুরী। কিন্তু হাংরি বিষয়ক মামলায় নিজেকে আলগে রেখে তিনি সরে পড়েন এবং পরবর্তীতে অন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে হাংরিয়ালিস্টদের থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নেন। কোর্টের কাছে জবানবন্দিতে তিনি ঘোষণা করেন— "I feel that their literary movement degenerated into deprevity and I have disassociated myself from Hungry Generation."[৫০]

উৎপলকুমার বসুর বেশ কিছু কবিতা হাংরি বুলেটিনে প্রকাশিত হয়। 'কৃত্তিবাস' থেকে সরে এসে তিনি একটু আলাদা ধরনের কবিতা লিখতে চাইছিলেন এবং সফলও হয়েছেন। হাংরি বুলেটিনে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত কবিতাটি হল— 'পোপের সমাধি'। সে-সময় কবিতাটি পাঠকমহলে হই চই ফেলেদিয়েছিল। তখন থেকেই উৎপলকুমার বসু বিশিষ্ট কবি হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যান। দীর্ঘ কবিতা, কিন্তু অশ্লীলতা তাঁর কবিতায় স্থান করে নিতে পারেনি। কবিতাটির অংশবিশেষ লিপিবদ্ধ করে পাঠ বিশ্লেষণ করা যাক—

"আমি কলকাতায় তোমাকে বলেছিলাম
'পোপের সাম্রাজ্য
আর তার অসুখের রহস্যময় বীজাণুর স্থিতিস্থাপকতা
কতখানি দেখা যাক।'
বীজাণুর সঙ্গে তুমি চাও না কি যুদ্ধ হোক ?
অন্তত আমি তা চাই না
কারণ সে যুদ্ধ যদি ধর্মযুদ্ধ না হয় তাহলে
কুরুক্ষেত্রে কার মুখব্যাদানের অন্ধকারে
আমি ছোট পৃথিবীর গ্লোবের প্রতিচ্ছায়া দেখে
হতচকিতের মতো
কৌরবের খেলার পুতুল হব ?"[৫১]

পোপের সাম্রাজ্য আর সেই সামাজ্যের স্থিতিস্থাপকতা এখন রহস্যময় বীজাণুর দ্বারা অসুস্থ হয়ে পড়েছে। কবি লাল-হলুদ কাঁচের জানালার দিকে তাকিয়ে বিকেলের সূর্যরশ্মির মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অপরিচ্ছন্ন মুহূর্তে সেদিন অকস্মাৎ জটিলতাহীন ভাবে অনুভব করেছেন

পোপের সাম্রাজ্যের আন্তঃপৃষ্ঠ। পৃথিবীর দিকে আঙুল তুলে তিনি কলকাতায় বলেছিলেন— পোপের সাম্রাজ্য আর তাঁর অসুখের রহস্যময় বীজাণুর স্থিতিস্থাপকতা নির্দিষ্ট করে দেখাবেন। কবি 'Pope John XXIII'-এর সাম্রাজ্যে ধর্মের অন্তরালে ধর্মহীনতার যে আভাস লক্ষ্য করেছেন তাই যেন কবিতাটিতে ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন। 'Pope John XXIII'-এর মৃত্যু সংবাদটি হাংরি জেনারেশনের message স্বরূপ কবির 'পোপের সমাধি' রচনা। কবিতাটি লেখার পূর্ব শর্ত স্বরূপ উৎপলকুমার বসু লেখেন— "A Hungry Generation message on the death of Pope John XXIII. "[৫২]

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে ধর্মযুদ্ধের আখ্যা দিলেও হাঁ-করা অন্ধকারে এই ছোট্ট পৃথিবীতে কবি হতচকিতের মতো কৌরবের খেলার পুতুল হতে চান না। কবির বুদ্ধিতে ঝাকুনি দিয়ে সত্যের সন্ধান স্বরূপ বুঝিয়ে দিচ্ছে— সমস্ত ধর্মযুদ্ধই বীজাণুর, সিকি-আধুলির এবং সন্ত্রাস সৃষ্টির প্রয়াস মাত্র। আজও আমরা লক্ষ্য করি ধর্মের নামে মুনাফা আদায়, মানুষের মনের মধ্যে দুর্বলতা সৃষ্টি করা এবং সন্ত্রাস ছড়ানো। এটা সর্বকালেই ছিল ; কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ তার ব্যতিক্রম নয়। আর পোপের সমাধিতে তারই ইঙ্গিত যথাযথ।

সাতাশ-আঠাশ বছর পেরিয়ে আসা কবির জীবনে রক্তে শুধুই উত্তেজনা, আন্তরিক শরীরের প্রেমে বারবার দ্বিধা নেমে আসে। তিনি অনুভব করছেন— যথার্থ মাতাল, পাপী, ধর্মজ্ঞানী, সাধু ও চোরের সঙ্গে কোনো রকম গূঢ় সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি তাঁর। প্রকৃতিকে উপলব্ধি করা হল না, ভালোবাসায় পরিণতি পেলো না, কারো সঙ্গে তেমন বিবাদও হল না। সমস্ত দুঃখকে ভুলে তিনি ক্যাথলিক মিশনের কাছে ভারতের অপুষ্ট শিশুর জন্য গুঁড়ো দুধ চাইবেন মনের আনন্দে।

ঊনচল্লিশ পোপের সমাধির পর চল্লিশতম পোপের জন্ম হয় দীর্ঘায়ু সঙ্গে করে।অল্পায়ু ভারতীয়ের মতো আরো কুড়ি-বাইশ বছর আছে ভেবে বিমানবন্দরে জাহাজের ওঠানামা দেখা অথবা ছাপাখানায় নিজের কবিতা ছাপানো বন্ধ করে দিতে বলতেই তিনি প্রস্তুত। এখন কবি সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যেতে চান। তাই রহস্যের জানালায় অন্ধকার নেমে আসে, তখন সবকিছু তুচ্ছ কিংবা বৃথা মনে হয়। তবুও আলো ফুটলেই আমাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের চিন্তা সমস্ত মন ও জীবনকে বীজাণুতে ভরে দেয়। এই ভাবে ধীরে ধীরে ক্ষয় হতে হতে আজ পোপের সাম্রাজ্য বীজাণুর মতো ছোট, সংখ্যাহীন হয়ে ঈশ্বরের আবির্ভাব দেখা দিয়েছে আমাদের চারপাশে।

হাংরি আন্দোলনের শরিক কবিরা আক্রমণ করেছেন তৎকালীন কলকাতায় একশ্রেণির মাতব্বর, সাহিত্যে সাম্রাজ্য বিস্তারকারী সম্প্রদায়কে । সেই সম্প্রদায়কে পোপের সমাধির মতো চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে চান তাঁরা। তাঁদের বীজাণুর সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে অচিরেই। পোপের সাম্রাজ্য যেমন মুছে গিয়ে বীজাণুর মতো ছোট এবং সংখ্যাহীন হয়ে উঠেছিল, এঁদের একচেটিয়া নান্দনিক সাহিত্য রচনার সাম্রাজ্য ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে উঠেছে আজ। এই চিন্তা হাংরি কবির মস্তিষ্ক-প্রসূত। হাংরি আন্দোলনের শরিক উৎপলকুমার বসুর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নান্দনিক কবি-সাহিত্যিকদের বিরুদ্ধে। জোর কশাঘাত।

'হাংরি জেনারেশন'-এর যে সংখ্যাটিকে নিয়ে মামলা-মকদ্দমা-হেনস্তা, সেই সংখ্যায় উৎপলকুমার বসুর 'কুসংস্কার' নামে একটি গদ্যধর্মী কবিতা প্রকাশিত হয়। এই আঙ্গিকের কবিতা হাংরি আন্দোলনের পূর্ববর্তী কবিদের রচনায় প্রায় অনুপস্থিত। উৎপলকুমার বসু যে শক্তিশালী কবি 'কুসংস্কার' কবিতাটি তার দ্বিতীয় প্রমাণ। 'হাংরি জেনারেশন'-এর নিষিদ্ধ সংখ্যার অন্যতম কবিদের মধ্যে মলয় রায়চৌধুরীর পরই উৎপলকুমার বসুর নাম উজ্জ্বলতম নক্ষত্রের মতো। কবি লিখছেন—

"মাতালের সঙ্গে রাস্তাদিয়ে হেঁটে যাওয়া অপরাহ্নে
বেশ্যাপাড়ার দিকে আমাকে ক্রমশ তন্দ্রাচ্ছন্ন করে তোলে
এবং মাছির কথা ভুলি নি— সেজন্য দু'মুহূর্ত 'মিষ্টান্ন
ভাণ্ডারে' দাঁড়াতে হল— বেলার জন্য কচুরি এবং অপরাহ্নেই
আমি ব্রণসমেত বেলাকে পেতে চাই বাথরুমের ভিতরে"[৫৩]

পাঁচটি স্তবকে কবিতাটির সমাপ্তি। কবিতাটির নাম 'কুসংস্কার' হলেও, নামকরণ তেমন গুরুত্ব পায়নি। হাংরি আন্দোলনকারীদের কবিতার ভাব নামকরণের ক্ষেত্রে তেমন যত্নবান হয়ে ওঠেনি ইচ্ছাকৃত চিন্তায়। কিন্তু একেবারেই যে তার গুরুত্ব নেই সেকথা মেনে নেওয়া যায় না। হাংরি আন্দোলনকারীরা চেয়েছিলেন কবিতায় সবক্ষেত্রেই পরিবর্তন। এই পরিবর্তনের রূপকার হিসেবে উৎপলকুমার বসু যে পিছিয়ে ছিলেন না 'কুসংস্কার' কবিতাটি তার জ্বলন্ত প্রমাণ।

কবি একটি মাতালের সঙ্গে রাস্তাদিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বেশ্যাপাড়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, এমন সময় তাঁর প্রেমিকা বেলার কথা মনে পড়তেই তার জন্য কচুরি কিনে রওয়ানা হলেন। সময় দুপুর। কবির ধারণা— বেলা নিশ্চয় এখন বাতরুমে স্নানে নিমগ্ন। তাই প্রেমিক কবি বেলাকে স্থানঘরে ভিজা চামড়ার আবরণে পেতে চান।

মাতাল যখন কাউকে 'ভাই আমার ভাই' বলে গোঙাতে থাকে তখন তার অন্তরে বিদ্রুপ এবং চাপা বেদনা উপচে পড়ে। বেশ্যাপাড়ায় যাওয়ার জন্য কবি মন স্থির করলে তিনি দেখতে পেলেন মিলিটারি ঘোরাঘুরি করছে। কবি ভারত সরকারকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন রাজনেতাদের দ্বারা গণ্ডগোল বাধার ফলে মিলিটারির কড়া প্রহরা আজ যুবক কবিকে দুশ্চরিত্র হওয়া থেকে আলগে রেখেছে। এই বেলা বেশ্যাপাড়ার এক যুবতী। যাকে সকলে অল্প সময়ের জন্য ইন্দ্রিয় সুখের সহযাত্রী করে। মিলিটারির সতর্ক প্রহরার জন্য বেলার কাছে যেতে না পারলেও হঠাৎ লেখিকা রেখা ভৌমিকের কথা মনে পড়ে গেল কবির। তাই কবির চোখের সামনে দৃশ্য-অদৃশ্যের মতো খুলে যায় দৈবী নদ, আর ওপার থেকে সামন্তদের 'শালইজাবার' কর্তা হেঁকে ওঠেন। এদের তরী ডুবন্ত প্রায়, তাই কলকাতায় বেশ্যাদের বাড়ির চারপাশে ঘূর্ণিজল বেড়ে ওঠে তৎক্ষণাৎ।

উৎপলকুমার বসু হাংরি আন্দোলনে যোগ দেবার পূর্বেও কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। তবে হাংরি আন্দোলনের মন্ত্রে নিজেকে দীক্ষিত করেছিলেন বলেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে

যশস্বী কবির মর্যাদায় অমর হয়ে থাকবেন। তাঁর কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ হল, 'চৈত্রে রচিত কবিতা' (১৯৬১), 'পুরী সিরিজ' (১৯৬৪), 'আবার পুরী সিরিজ' (১৯৭৮), 'লোচনদাস কারিগর' (১৯৮২) ইত্যাদি।

* * * * *

হাংরি আন্দোলনের শক্তিশালী কবিদের মধ্যে শৈলেশ্বর ঘোষের (১৯৩৮ —) নাম বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে জলন্ত অক্ষরে মুদ্রিত থাকবে। যদিও তিনি হাংরি আন্দোলন শুরু হবার অনেক পরে এই আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন। মলয় রায়চৌধুরী লিখেছেন— "শৈলেশ্বরের ১৯৬৩-তে লেখা 'ঘোড়ার সঙ্গে ভৌতিক কথাবার্তা' ও 'তিন বিধবা' কবিতাগুলি 'এষণা' পত্রিকায় পড়ার পর আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই টালা ব্রিজের শেষে একতলার এক ঘরে— বহু পুরোনো গ্রন্থ ও হলুদ বিষণ্ণ পত্রিকার মাঝে ছেঁড়া মাদুরের ওপর শুয়ে তিনি তখন অস্তিত্বের নাজেহাল মফসসলে বুঁদ।"[৫৪] শৈলেশ্বর ঘোষ হাংরি আন্দোলনে যোগ দেবার সঙ্গে সঙ্গে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একজন প্রধান হাংরি কবি হয়ে ওঠেন। এর মূলে ছিল তাঁর মেধা। সকল প্রচলিত কবিতার অবয়ব ভেঙে দেন নতুন কাব্য-ভাষার আক্রমণাত্মক প্রক্রিয়ায়। তাঁর মতে স্রষ্টাকে তার নিজের ভাষা তৈরি করে নিতে হয়। মানতে হয় যে হাংরি কবিদের ভাষা সত্যই স্বতন্ত্র। শৈলেশ্বর ঘোষের বক্তব্য অনুসারে এক যুগের ভাষা অন্যযুগে সমাদৃত হয় না।

কবি লিখছেন— "অধঃপতিত ভারতবর্ষের সন্তান আমরা। অর্থহীন শূন্যতা পরিবেশের সন্তান আমরা। বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের মধ্যে আমাদের জন্ম। শোষণ, হত্যা ও ধর্ষণের মধ্যে আমাদের বৃদ্ধি। অতীত আমাদের কাছে মিথ্যা, ভবিষ্যৎ অস্পষ্ট, কুয়াশাচ্ছন্ন। নব নব মৃত্যু শব্দ ভীতিশব্দ আমাদের হৃদয়কে মূক করে দিতে চায়, সন্ত্রস্ত করে চেতনাকে, আচ্ছন্ন করে রাখতে চায় দৃষ্টিকে। আমরা দেখতে পাই হাজার বছরের ঝর্ঝরে মূল্যবোধগুলি জীবনের নতুন ধারণার পথে রক্তচক্ষু মেলে দাঁড়িয়ে আছে।"[৫৫] কবিতা সৃষ্টি মানুষের শেষ ধর্ম বলেই তাঁরা মনে করেন। আত্মার সংগীত থেকে জেগে ওঠা গ্লানিহীন সমস্ত অপরাধ চেতনাই হচ্ছে কবিতা।

সাহিত্য বিষয়ে কতগুলো ধারণা স্পষ্ট করে শৈলেশ্বর ঘোষ হাংরি কবিতা-স্রোতের সহযাত্রী হন। তিনি মনে করেন— "নিজেকে দেখাই জগৎকে দেখা। নিজেকে ক্রমাগত ভাঙা এবং মেলে ধরা। সমাজ যে সব শব্দকে অশ্লীল বলে বর্জন করে সেগুলিকে ব্যবহার করা। সমস্ত বুর্জোয়া শিক্ষাকে অস্বীকার করা। পৃথিবীর সঙ্গে এবং নিজের সঙ্গে ভয়ঙ্কর সম্পর্ক গড়ে তোলা। মধ্যবিত্তের রুচি ও মূল্যবোধকে অস্বীকার করা । অস্তিত্বের গোপনতম প্রদেশে যা লুকিয়ে আছে তাকে প্রকাশ করে দেওয়া।... শিল্প নামক ভুষিমালে বিশ্বাস না করা। আপাদমস্তক কেবল নিজেকেই ব্যবহার করা। এসটাবলিশমেন্টের চাকর না হয়ে যাওয়া।... অবদমিত যৌনতাকে মুক্তি দেওয়া। স্ল্যাং সহ সমাজের নীচুতলার মুখের ভাষাকে ব্যবহার করা"[৫৬] ইত্যাদি। শব্দহীন শূন্যতার মধ্যে এঁদের জন্ম বলে এঁরা বুঝেছিলেন ভালোবাসার জন্যই তাঁদের ক্ষুধা। নির্যাতিত আত্মার স্পন্দন এঁরা হাজার হাজার বছর ধরে রক্তে অনুভব করছিলেন, তাই সমস্ত মূল্যবোধকে বিসর্জন দিয়ে ভাঙা-গড়ার খেলায় মত্ত হয়ে উঠলেন।

শৈলেশ্বর ঘোষের কবিতা সাহিত্যের গতিমুখকে সৃষ্টি রহস্যের আতুর ঘরে নিয়ে দাঁড় করায়। তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'ঘোড়ার সঙ্গে ভৌতিক কথাবার্তা' পাঠে কাব্য বিষয় সম্বন্ধে স্পষ্ট হয়ে উঠি যে, তিনি যোগ্য হাংরি কবি। কবিতাটি আটটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। তিনি লেখেন—

"তিন বিধবা গর্ভ করে শুয়ে আছে পুণ্য বিছানায়
হে ঘোড়া কোলকাতায় তিন গেলাস স্বাস্থ্য সুধাপান
পরিত্রাণবিহীনতা হাসে পুরুতের নামাবলী গীতা
ধাতুধর্ম সাতবার গড়াগড়ি যায়— তিন বিধবা"[৫৭]...

জীবনের অভিজ্ঞতার প্রবাহকে শৈলেশ্বর ঘোষ এক নতুন ভাষা-শৈলীর দ্বারা প্রাণ দিতে যত্নবান। আধুনিকতার দাঁত-বিজলানোকে দুর্ভেদ্য চেতনায় আঘাত করে সত্যের নগ্ন রূপায়ণ ঘটাতে তিনি অদ্বিতীয়। দীর্ঘ কবিতার কয়েকটি মাত্র চরণ আস্বাদন করে বিংশ শতাব্দীর ষাট পূর্ববর্তী কবিদের চিন্তার দাবিকে নস্যাৎ করে দিতে আমরা দ্বিধাবোধ করি না।

ঘোড়া— গতির এবং যৌবনের প্রতীক, আবার যুদ্ধের প্রধান সহায়ক। কবি অনুপস্থিতির মাধ্যমে ঘোড়ার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চান, কারণ কবিতার ইতিহাস বিশাল হয়ে উঠেছে, তাই শোবার ঘরে কবিতার গাছ সঞ্চার হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন। যে ঘোড়া কথা বলতে পারে না, যে ঘোড়া মানুষের সমস্ত ভাষা বোঝে কিন্তু বোঝাতে পারে না, তাই কবি ব্যঙ্গ করে মূক প্রাণীর সঙ্গে নিজের কৃতিত্বের কথা শোনান। এই ব্যঙ্গ বিংশ শতাব্দীর ষাট পূর্ববর্তী প্রাতিষ্ঠানিক কবিদেরকে আক্রমণ করা বললে বোধ হয় ভুল বলা হবে না। মলয় রায়চৌধুরী উল্লেখ করেছেন— শৈলেশ্বর ঘোষ একটা ঘরে অনেক কাগজপত্রের মধ্যে মাদুর পেতে ঘুমাতেন। কবি তাঁর কবিতার আত্মপ্রকাশ চান না, কবিতা ঘরে বসে লিখবেন এবং চিৎকার করে পড়ে ঘরের মধ্যে কবিতার গাছ বানাবেন। কখনও সে গাছ ভেঙে পড়ে, তাই শোবার ঘরে মনের যত ক্ষোভ-যন্ত্রণা-আক্রমণ চলে। কবিতার সঙ্গেই দীর্ঘদিন ধরে সৃষ্টি হয় সখ্যতা, প্রেম, ইত্যাদি। দশ বছর কলকাতায় বাস করে সমস্ত আশা আজ নীলাম হয়ে যায়। আলস্য দিন দিন বৃদ্ধি পায় এবং ঘুমের প্রতি প্রেম গভীর হয়ে ওঠে। হৃদয় দুমড়ে মুসড়ে গেলেও সারাদিন তেত্রিশ-জন নপুংশক শ্রেণির মানুষ অবৈধভাবে নিজের স্বার্থসিদ্ধি পূরণ করে। কিন্তু কবির ক্ষুধা গতিময়তার এবং কবিতা সৃষ্টির। সে সৃষ্টি প্রচারমুখী না হলেও ক্ষতি নেই।

অনেকদিন ধরে কবির প্রেম প্রবাহিত হয় নানান প্রকৃতির ভূত সদৃশ মানুষদের সঙ্গে। বিভিন্ন আক্ষেপের মধ্যে কলকাতার রাজপথে ঘুরে ঘুরে ঘোড়াকে অর্থাৎ প্রাণ চঞ্চল মনকে এখন যেন খুঁজে পাচ্ছেন না। অসংখ্য নারীর হৃদয়ে ঘুরে ঘুরে ক্ষুধা মিটিয়ে কবিতা ফলন হয়।

যুবতী বধূরা সুখী সংসার জীবনে গর্ভবতী হয়ে সৃষ্টি সুখের উল্লাসে প্রস্তুত হলেও কবিতারই শুধু রক্তপাত ঘটে। এখন কবি পেচ্ছাবখানাকেই দাতব্য চিকিৎসালয়ে পরিণত করেছেন। কলকাতা তরল হয়ে উঠেছে, তাই হৃদয়ে কষ্টের উৎপাত প্রচণ্ড। সমস্ত ক্ষতকে লেপে দেবার চেষ্টা চলে, তবুও শিল্পের নামে কবি তাঁর প্রতিভার ব্যবসা করেন না। মানুষ শয়তানে পরিণত হয়ে উঠেছে ; প্রত্যহ কলকাতার শরীরে নির্যাতনের মাধ্যমে কলকারখানা প্রসব করে মানুষ। চলে নারী নির্যাতন, সারা দিনের শেষে ঋতুস্রাবের মতো নিয়ম মেনে কবিতা বেরিয়ে আসে।

কবি ছাব্বিশ বছরের যুবক। এই বয়সের যুবকরা সৃষ্টিকে রক্ষা করার কাজে নিমগ্ন থাকেন, কিন্তু কবি কলকাতার এত সব ধ্বংসময় কাণ্ড দেখে শোকে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। এই বয়সে সুস্থ পৃথিবী গড়ার আশায় ঘুম উধাও হয়ে গেছে তাঁর। অন্যায় স্বরূপ আজও প্রতাপশালীরা দুর্বলদের সকল কষ্টের ফসল নিয়ে যেতে দেখেও ছাব্বিশ বছর বয়স কবিকে কষ্ট দেয়। কবি লেখেন—

"ছাব্বিশ বছরে খুব শোক হয় ছাব্বিশ বছর যেন তো নয়
ছাব্বিশ বছর নিদ্রারস পচে তবু দেখা নাই
হা লৌকিক হা অলৌকিক হা নিষ্ঠুর তবু দেখা নাই
ছাব্বিশ বছরে কুমির ফসল নিয়ে যায়—"[৫৮]

অভিশপ্ত বয়স হিসেবে কবি মনে করছেন ছাব্বিশ বছর সময়টাকে, কারণ— সৃষ্টিকে সুন্দর এবং সুন্দরতম করে গড়ে তুলতে অক্ষম কবি বাজে কাজে জীবনটাকে ভাসিয়ে দিচ্ছেন। কবির ছাব্বিশ বছর বয়স যেন বলাৎকার হয়ে যাচ্ছে। রক্তের মধ্যে কিছু একটা করার ক্ষুধা ক্রমাগত তোলপাড় করে, মনে আসে প্রেম, আসে দুশ্চিন্তা। এই বয়স সকলের সঙ্গে মিলে মিসে থাকার, সমস্ত ভেদাভেদ দূর করে আপন করে নেবার। এত সুন্দর এবং জীবনের সফলতম মধ্যাহ্ন বয়সে উপনীত হয়ে নিজেকে পৃথিবীর যোগ্য প্রহরী মনে করতে না পেরে ঘোড়ার সঙ্গে ভৌতিক ভাবে কথাবার্তা বলে মনের দুঃখ ব্যক্ত করছেন কবি।

ছাব্বিশ বছর বয়স সৃষ্টির ভার হিসেবে বহন করে নিয়ে চলেছেন কবি। ঘোড়া জানে তাদের পরিচয়, যারা নিজেকে অপ্রত্যাশিত ভাবে কলঙ্কিত করে চলেছে অহরহ। এই ঘোড়ার খুরের ধারালো ঝনৎকার সেই 'কালির ছাপ' মুছে দেয়। তবু এত কিছু দেখে কিংবা জেনেও ছাব্বিশ বছর বাঘের মতো অতিহিংস্র গর্জন শেখেনি, কিন্তু কিছু একটা করার প্রস্তুতি অন্তরে অন্তরে বপিত হতে থাকে। ছাব্বিশ বছর বয়স সারা দুনিয়াকে কিছু করে দেখাবার কথা ভাবলেও এই বয়স যেন আরামপ্রিয় হয়ে উঠেছে, তাই প্রাণ-পাখিকে বিছানাতেই যত্ন করে তোলেন কবি। কবি দেখেন— 'সমুদ্রময় গড়ে উঠেছে ত্রস্ত পোতাশ্রম'। ঘোড়াকে সাক্ষী রেখে কবি ভৌতিক কথাবার্তার মাধ্যমে 'প্রত্যাশালিপ্ত' জীবনের সিঁড়িতে দেখা হবার কথা দেন।

ঘোড়ার হৃদয়ে ভালোবাসা রয়েছে বলে কবির দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি মনে করেন এই প্রকৃতির রাজ্যে জীবনকে এত মায়া করার কিছু নেই, কারণ প্রকৃতি প্রত্যেকের পরমায়ু হিসেব করে আকাশের সিঁড়ি তৈরি রাখে। এখন নারী-পুরুষের ভালোবাসা শুধু শরীর নিয়ে খেলা। স্বার্থের দুনিয়ায় সংসারচক্র শুধুই ইতিহাস মাত্র। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুশোচনাবোধ জাগ্রত হলে মানুষের দুঃখ ছাড়া আর কোনো কিছু করার থাকে না। বুদ্ধদেব রাজত্ব বিস্তার করতে লক্ষ লক্ষ প্রাণ কেড়ে নেবার পর বুঝেছিলেন সৃষ্টিকে ধ্বংস করা সাংঘাতিক অপরাধ। কবির অনুমান এ-পৃথিবীতে তাঁর জন্মানোটাও ঠিক হয়নি। ঘোড়ার গতিময় প্রকৃতি কবির দৃষ্টি সম্মুখে ভেসে ওঠে বারবার, কিন্তু রক্তের মধ্যে অভিমান জন্ম নিলেও এই উত্তেজনা অবৈধ। চারদিকে যুদ্ধের সাজ সাজ উৎসবের আয়োজন ধ্বনিত হলেও কবিকে চুপকরে বসে থাকতে হচ্ছে প্রস্তুতির ভাঙা মন্দিরে।

বেদনার চিঠি পকেটে নিয়ে কবি ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষারত। সমস্ত অপরাধকে গুড়িয়ে দেবার চিন্তায় নিস্তব্ধ বন্দুক হাতে অনেকদিন 'ঘুম জাগা প্রহরায়' কাটিয়েছেন তিনি। দশমনুমেণ্ট ময়দান অপরের সম্পত্তি আত্মসাৎ করার লোকে থৈথৈ রৈরৈ। মনটাকে তিনঘণ্টা সুস্থ রাখতে বড় কষ্ট হয়, তাই আধুনিকতা নামক বাজারের খরিদ্দার হয়ে দেখেছেন— পাড়াগাঁর স্ত্রীলোকের স্বামীসম্ভাষণ লোক দেখানো ব্যাপার মাত্র। জনসংখ্যা বিস্ফোরক আকার ধারণ করার ফলে কলকাতা আক্রান্ত এবং সেই সঙ্গে আক্রান্ত কলকাতার শিশুদের তরতাজা প্রাণ। তাই বেদনাপ্রধান চিঠি পকেটে মনের মধ্যে অসংখ্য বিক্ষোভ জমা করে বন্দুক হাতে চিন্তামগ্ন হয়ে অনেক অনেক রাত কাটিয়ে দিচ্ছেন কবি, আর তার সাক্ষী ওই ঘোড়া, যে ঘোড়ার সঙ্গে কবির ভৌতিক কথাবার্তা হয়।

তিন বিধবা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে সমীর চৌধুরী বলেছেন— "সত্য শিব সুন্দর— তিনজনেই বিধবা, কেননা ঈশ্বর আজ মৃত। তারা গর্ভবতী, কেননা তারা ধর্ষিতা এই আধুনিক সভ্যতার হাতে। কিন্তু ধর্ষণের পর আধুনিক মানুষও আর মানুষ থাকে না, পরিণত হয় জন্তুতে, ভারবাহী পশুতে। যার সামনে অবশিষ্ট জীবনের জন্য 'পরিবহনযোগ্য রাস্তা বহুদূর শূন্য পড়ে' থাকে।"[৫৯] সমালোচকের এই মতকে সমর্থন না করে আমরা বলতে পারি, কলকাতা, সূতানুটি এবং গোবিন্দপুর— এই তিনটি গ্রাম নিয়ে বর্তমান 'কলকাতা' শহরের জন্ম। কবি এই তিনটি গ্রামকে তিন বিধবা হিসেবে উল্লেখ করে থাকবেন বলে আমাদের ধারণা। জব চার্ণক কলকাতা শহরের মালিক হয়ে উঠেছিলেন দীর্ঘ প্রায় তিনশত কুড়ি বছর আগে। সেই হিসেবে জব চার্ণক উল্লিখিত তিনটি গ্রামের ভূস্বামী। অর্থাৎ স্বামী।

ইংরেজরা ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষ থেকে মালিকানা শর্ত ত্যাগ করে চলে যায়। তখন থেকে জব চার্ণকের কলকাতা ভারতবাসীর কলকাতা অর্থাৎ জব চার্ণকের রাজত্বের মৃত্যু। তাই ওই তিন গ্রাম বিধবা। কিন্তু এই তিন গ্রাম বর্তমান গর্ভবতী। আধুনা কলকাতা বলে চিহ্নিত কলকাতা, সূতানুটি, গোবিন্দপুর গ্রাম তিনটি ফুলানো-ফাঁপানো শহরে পরিণত হয়েছে। ইংরেজদের কৃপায় কল-কারখানা, রেল, ট্রাম, বাস, উন্নত রাস্তা, সুচিকিৎসা, সুশিক্ষা ইত্যাদি কলকাতা শহরকে (কলকাতা, সূতানুটি, গোবিন্দপুর) গর্ভবতী করে তুলেছে। আজ কলকাতা শহরকে পুণ্যভূমি হিসেবে সকলে চেনে। কলকাতা শহরকে দেখার জন্য মানুষ জীবনের অনেক সময় নষ্ট করে। থাকার জন্য আশ্রয় খুঁজে। কবি তাই উচ্চারণ করেন— 'তিন বিধবা গর্ভকরে শুয়ে আছে পুণ্য বিছানায়'।

কিন্তু এই পুণ্য কলকাতার অন্য একটি গূঢ় সত্য চেহারা কবি দেখতে পান। যার বিবৃতি কবি সমস্ত কবিতা জুড়ে বেদনার সুরে কোঁকিয়েছেন। কলকাতায় তিন গ্লাস 'স্বাস্থ্য সুধাপান' স্বরূপ খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান পাওয়া যায় ঠিকই, পরিবর্তে 'পরিত্রাণবিহীনতা হাসে পুরুতের নামাবলী গীতা'। কিন্তু মনুষ্যত্ব 'ধাতুধর্ম' স্বরূপ কলুষিত হয়ে পড়ে অনিবার্য কারণে। তেত্রিশ পুরুষ ধরে এই কলকাতা শহরে তিন বিধবার মুখ চেয়ে আজও কষ্টের জীবন কাটিয়ে চলেছেন। পুণ্যচোর সদর দরজায় দাঁড়িয়ে চাষার মাশুল গুনে নেয়। গৃহস্থের মেয়েরা সব দুশ্চিন্তায় রাত জেগে কাটায়। তারা 'পুরাণ-গীতা পড়ে কুলধর্ম রক্ষা শেখে'। কবি ঘোড়ার সঙ্গে ভৌতিক কথা

বলে মানুষের প্রেমকে ক্ষণস্থায়ী দেখে দুঃখ প্রকাশ করেন। যেখানে সুখ-শান্তি লুপ্ত হয়ে গেছে সেখানে মানুষ গীতাপাঠ স্বরূপ ধর্মালোচনায় মগ্ন হওয়া সত্যকে অস্বীকার করা বোঝায়। ঘোড়া জানে হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতা রয়েছেন তবুও এই দেবতাদেরও হৃদয় বলে কোনো জিনিস নেই। তাই ঈশ্বরের প্রতি সন্দেহ জন্মায় কবির। তিন বিধবা রহস্যময় ভাবে ঘুমিয়ে আছে গর্ভকরে পুণ্যধর্মহীন। কিন্তু এই জীবনে চলার রাস্তা দূর দূরান্ত পরিবহনযোগ্য শূন্যই মনে হয়।

মানুষের অন্তরের দুটো সত্তা— নরম-গরম, জ্ঞান-নির্জ্ঞান, ভালো-মন্দ, বহমান-স্থির, আলো-অন্ধকার ইত্যাদি। কবি যে ঘোড়ার সঙ্গে ভৌতিক কথাবার্তা বলেছেন, সেই ঘোড়া কবির অন্তরের প্রথম সত্তা। সেই প্রথম সত্তা কবিকে প্রেরণা দেয় নগ্ন সত্যকে উদ্ঘাটন করতে। সংগ্রামী হতে। জীবন যুদ্ধে এগিয়ে যেতে, ইত্যাদি। কবি তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে না পারলেও চেষ্টা করেছেন বুকে যন্ত্রণার চিঠি নিয়ে। কবি ক্ষুধার্ত ছিলেন সমাজের রাকঢাকময় ছাল চামড়া ছাড়িয়ে রূঢ় সত্যকে প্রকাশ করতে। সে ক্ষেত্রে তিনি সফল হয়েছেন সর্বার্থে। তাই হাংরি কবিতার ইতিহাসে শৈলেশ্বর ঘোষের 'ঘোড়ার সঙ্গে ভৌতিক কথাবার্তা' কবিতাটি এক মহামূল্যবান সংযোজন।

১৯৬৪-র ২ সেপ্টেম্বর শৈলেশ্বর ঘোষ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও কবিতায় অশ্লীলতার অভিযোগে ক্ষুধিত প্রজন্ম ষড়যন্ত্র মামলায় প্রথম আসামি হিসেবে গ্রেফতার হন। কিন্তু হাংরি জেনারেশন-এর নিষিদ্ধ সংখ্যায় শৈলেশ্বর ঘোষ 'জনবিরল স্বপ্নে' নামক যে কবিতাটি লেখেন তাতে একটিও অশ্লীল শব্দ আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। যদিও তিনি তাঁর বিভিন্ন কবিতায় কিছু কিছু অশ্লীল শব্দ ইচ্ছাকৃত ভাবে স্থান দিয়ে থাকেন। 'জনবিরল স্বপ্নে' কবিতার বিষয় কলকাতা শহর ও সেই শহরবাসী মানুষের ক্রিয়া-কর্মের ফলে কবির আক্ষেপোক্তি। শৈলেশ্বর ঘোষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ অসাধারণ প্রতিভায় বিচ্ছুরিত হয় শব্দ যোজনায়—

> "স্বপ্ন থেকে কবরখানার ভিতরে হেঁটে চলে এলাম
> কেননা খানিক আরামপ্রদভাবে বসা চলে জনবিরল
> স্বপ্নের ভিতরে মাথার ভিতরে বুকের ভিতরে
> আলকাতরা সিঞ্চিত কলকাতার চূড়ার উপরে
> পাখিদেরও বিশ্রাম হয় না এবং যেখানে বোতাম
> টিপি সেখানে বাতি জ্বলে না"[৬০]...

কবি কলকাতা শহরে জীবন-যাপন করে হাঁপিয়ে উঠেছেন। বর্তমান স্বপ্নতেও তিনি সুখ অনুভব করেন না, তাই সমস্ত স্বপ্নকে দূরে ঠেলে একটুখানি আরাম বা শান্তি উপলব্ধি করার জন্য কবরখানার ভেতরে চলে এসেছেন। এখানে মানুষের ভিড় নেই, চিৎকার চেঁচামেচি নেই, একে অপরের ক্ষতি করার চিন্তা নেই, ইত্যাদি। কবি অনুভব করেন— স্বপ্নে অশান্তি, মাথার ভেতরে অশান্তি, বুকের ভেতরে অশান্তি। এই অশান্তির মূল কারণ— 'কলকাতা আলকাতরা সিঞ্চিত'। কলকাতার আকাশে পাখিরাও এখন স্বাধীন ভাবে উড়ে বেড়াতে পারে না। কলকারখার বিষাক্ত ধোঁয়া কলকাতার আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। কলকাতার মানুষ রাজনীতি করে বেশি। তারা গা বাঁচিয়ে চলে 'এবং কাপড় বাঁচিয়ে জলে নামে'।

আগুনের তাপ যতটা সত্য তার থেকে ভালোবাসা আরো বেশি সত্য। কিন্তু বিজ্ঞানের আবিষ্কার বিদ্যুৎ ততোধিক বেশি প্রয়োজন, তাই ট্রেন, কারখানা, সব কিছুতেই বিদ্যুতের চাহিদা ভালোবাসার আগে। এক শ্রেণির মানুষ মদের দোকানে গিয়ে বমি করে, স্ত্রীলোকের কাছে গিয়ে তার দেহের তাপ নেয়, প্রয়োজনে কাপড়ের মতো স্ত্রী বদল করে। অথচ বাজারে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ঢেউয়ে বাঙালি ঘরের মেয়েরা পারদর্শিতার সঙ্গে রবীন্দ্র সংগীতের মহড়া দিতে দিতে বয়স বাড়ায়। তারপর অনেক বয়সে ভালো পাত্রের সঙ্গে নতুন সংসারে পদার্পণ করে। কবি বহুদিন অন্তরে অন্তরে মনের কথা উচ্চারণ করেছেন তবুও জনবিরল স্বপ্নে তাঁর 'বীর্যপাত' ঘটে। কিন্তু মানুষ তার স্বার্থের জন্য যেরূপ ব্যবহার করে, সে কৌশল কবির আজও জানা হল না। তাই তিনি 'জনবিরল স্বপ্নে' একাকী সুখ খুঁজে অসুখ বাড়ান।

শৈলেশ্বর ঘোষের কবিতা সম্পর্কে বলতে গিয়ে মলয় রায়চৌধুরী লিখেছেন— "শৈলেশ্বরের কবিতা কেন্দ্রাতিগ হোক বা কেন্দ্রাভিগ, প্রতিটি কবিতার কেন্দ্রে তিনি নিজে। কোনো কবিতা কোনো এক বিশেষ স্পর্শকাতরতার ফসল নয়। তা অস্তিত্বের সামগ্রিকতাকে বাদ দিয়ে নয়। কথন ভঙ্গির ঠাস বুনোট শৈলেশ্বরের কবিতাকে অতিকথন ও মিতকথনের মাঝামাঝি এক অনন্যতা দিয়েছে— বারবার তিনি নিজেকে নিয়ে আসেন সম্পূর্ণ নতুন এক পরিস্থিতিতে, আর, নিজেকে রেহাই দেন না। সত্যি বলতে কি, শৈলেশ্বরের ওই ভয়াবহ শান্তির পরিপ্রেক্ষিতে, চল্লিশ দশকের অনেক কবিতাকে ইয়ার্কি মনে হয়। যে স্থিতধী প্রজ্ঞায় তিনি নিজেকে ষাট দশকের অন্যান্য কবিদের থেকে আলাদা করতে পেরেছেন তা আমূল আত্মাভিমান ও আত্মঘাত থেকে সম্ভব হয়েছে।"[৬১] শঙ্খ ঘোষ বলেন— "এইসব পণ্ডিতি ভাষণ সত্ত্বেও ইতিহাস অবশ্য থেকে যায়, আর এই ইতিহাসের অনেকটা অপচয় হয়ে গেছে সেকথা মনে রেখেও বিষণ্ণ হবার কারণ ঘটে না যখন একজন শৈলেশ্বর ঘোষের মতো কবি অবিচলিত থেকে কেবলই ভেবে যান জীবনের বিন্যাস, নিজের জীবনযাপনকে সমস্ত অর্থেই মিলিয়ে নিতে চান তাঁর কবিতার সঙ্গে।"[৬২] আমরা অনুভব করি শৈলেশ্বর ঘোষের কবিতা আলাদা ধরনের। শৈলেশ্বর ঘোষ সব সময়ই হাংরি। তাঁর চলন-বলন হাংরি। তাই তিনি অপূর্ব শক্তি ও মেধা নিয়ে জীবনের অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বাস্তবকে দেখে ছিলেন বলেই কবিতা হয়ে উঠেছে সত্যের তথ্য হিসেবে। তাঁর কবিতাকে বলা চলে— "একজন নঙমানুষের শেষ ইতিবাচক অনুসন্ধান।"[৬৩] যা একজন মানুষকে বেঁচে থাকতে ইন্ধন যোগায়, উঠে দাঁড়াতে উৎসাহ দেয়।

* * * * *

"সভ্যতার রূঢ় প্রকাশ, প্রতিষ্ঠিত মূল্যবোধ, প্রতিষ্ঠান— সমগ্রভাবে জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একে চ্যালেঞ্জ করে এর যথার্থ রূপ দেখার প্রবণতা— হাংরি আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। ইট ওয়াজ অ্যান অ্যাডভেঞ্চার টোয়ার্ডস আননোন।"[৬৪] এই উক্তিটির বমনকাণ্ডের হোতা সুবো আচার্য (১৯৪২ —) তুলনামূলক সাহিত্য নিয়ে স্নাতকোত্তর করার পর হাংরি আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ১৯৬৩-তে হাংরি শরিকের শিরোপা আপন ভালে সাজিয়ে নেন।

হাংরি জেনারেশনের ছত্র-ছায়ায় আসার পর সুবো আচার্য লেখার প্রতি মনোনিবেশ করেন। সচেতন মাতালের মতো চিৎকার করার মধ্যে রিজেনারেশন প্রয়াস তাঁকে দিশেহারা করে তোলে। তাঁর 'মড়ক' গদ্যটির মধ্যে 'বিকৃত মস্তিষ্কের গর্জন' উপলব্ধি করা যায়। তাঁর পাগলামো একটু আলোকপাত করা যাক— "মানুষ এই পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত, ঈশ্বর নামক কোন পরমপুরুষ ঈশ্বরী নাম্নী অশ্লীল রূপসীকে সঙ্গম করে আমাদের জন্ম হয়নি। আমারা কিভাবে কোত্থেকে এলাম কোথায় যাবো জানা যায় না। অগত্যা যূথবদ্ধ মানুষকে নিজেরই ঈশ্বর হতে হলো, বিশৃঙ্খলা ভুলে যেতে, প্রকৃত আত্মপরিচয়ের কথা ভুলে যেতে কিছু কিছু দিব্য মুখোশের দরকার হলো মানুষের প্রথম নির্মাণ ঈশ্বর...।"[৬৫] তবে সুবো আচার্যর কবিতা স্বতন্ত্র। তাঁর কবিতায় নিজস্বতা বর্তমান।

হাংরি কবিরা প্রায় সকলই নতুন মাত্রা সংযোজন করেছেন কবিতার আঙিনায়। সুবো আচার্য তার ব্যতিক্রম নন। যদিও-বা মাঝে মাঝে তাঁর কবিতায় হতাশা, উন্মও আচরণ, প্রলাপধর্মীতা, সন্দেহ, ইত্যাদি প্রবলভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। কিন্তু নিজের প্রতি ছিলেন সচেতন ও বিশ্বাসী। প্রকৃতি ও মানুষ নামক ঈশ্বরে তাঁর অগাধ প্রেম ছিল। তাঁর বিভিন্ন কবিতায় প্রকৃতির নানা উপকরণ হাংরির সকল বৈশিষ্ট্য রক্ষা মারফত হুড় হুড় করে ভিড় করেছে। যেমন—

"সমস্ত বিকেল থেকে সন্ধ্যার বিশাল ছায়ায়
চার হাত-পা তুলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে
ওরাংওটাং-এর মত হাঁটলাম,"[৬৬]...

'সন্ধ্যার বিশাল ছায়ায়' শব্দত্রয় নান্দনিক কাব্য চেতনার উলুধ্বনি দিলেও কবিতাটির সমাপ্তি হাংরি আস্ফালনে। বারোটি চরণে সম্পূর্ণ কবিতাটিতে প্রকাশিত হয়েছে কবির নিজের প্রতি বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচল বৃত্তি। কবি অনুভব করেন, 'প্রকৃতপক্ষে সমস্ত জীবনই এক ভয়ংকর যুদ্ধ'। সেই সঙ্গে তাঁর কবিতায় ভিড় করে এসেছে অশ্লীল অনেক শব্দ। 'নিজস্ব বিস্ফোরণ' (জেব্রা, ১৯৬৫) কবিতাটি তার প্রধানতম উদাহরণ—

"এক পৃথিবীর চেয়ে বড় মহাস্রোতে আমি লাফিয়ে পড়েছি এবং
আমার লিঙ্গ বড় একটা পোকার মত হয়ে গেছে,
জানালায় শুয়ে শুয়ে দেখছি সকাল বেলার রোদ হলুদ শয়ন
বেশ্যাবাড়ির পবিত্র অশ্লীলতা নিয়ে মন্দির ও গির্জা ও মসজিদের দিকে বয়ে
যাচ্ছে কলকাতা শুয়ে আছে, উরুর দ্বিধার মধ্যে মৃত্যু চেপে কলকাতা",[৬৭]

দীর্ঘ ১৯১-টি চরণে অশ্লীল এবং যৌন শব্দ ইচ্ছাকৃত ব্যবহার করে কবিতাটিকে ক্ষুধার্ত প্রজন্মের সাক্ষ্য ভাবনায় গড়ে তোলেন কবি। শুধু তাই নয়, বাক্যে মাঝে মাঝে শব্দের পরিবর্তে গণিত-ও ব্যবহার করেছেন সুবো আচার্য। তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত অশ্লীল ও যৌন শব্দগুলোর কয়েকটি হল— লিংগ, বেশ্যা, উরু, যোনি, ইত্যাদি। হাংরি কবিতার প্রায় সমস্ত বৈশিষ্ট্যই 'নিজস্ব বিস্ফোরণ' পাঠবস্তুটিতে বর্তমান।

হাংরি কবিদের অন্যতম মলয় রায়চৌধুরীর কবিতার অনেক শব্দ এবং ব্যক্তিনাম সুবো আচার্যর কবিতায় লক্ষ্য করা যায়, যেমন— মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাগৈতিহাসিক, রামকিংকর বেইজ, রবীন্দ্রনাথ, ভিয়েৎনাম ইত্যাদি। 'ওরাংওটাং' শব্দটি সুবো আচার্যর প্রিয় বলেই মনে হয়, কারণ উক্ত শব্দটি তাঁর 'নপুংসক একটি' এবং 'নিজস্ব বিস্ফোরণ' দুটো কবিতাতেই বর্তমান।

কবির দুঃখ তিনি খারাপ সময়ে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাই পতনের মধ্যে নিজেকে ডুবতে দেখেন। বিশাল সমাজ মানুষের স্বাধীন চিন্তাকে হত্যা করে 'আত্মাকে অনাহারে রেখে দিতে চায়'। কিন্তু এরা জেনেশুনে সত্যকে অস্বীকার করতে চায় বলে, 'আমরা মাথা ছিঁড়ে জীবনের মধ্যে সোজা ঢুকে গিয়েছি'। তাই কবি মিথ্যার ঘূর্ণিচক্রে পিষ্ট হতে হতে মৃত্যুর দিকে দ্রুত ধাবিত হচ্ছেন। এখন বাঁচার ইচ্ছে, মৃত্যুরই নাম।

সুবো আচার্য হাংরি আন্দোলনে শরিক হয়ে অনেকগুলো দীর্ঘ কবিতা লেখেন। মলয় রায়চৌধুরী সম্পাদিত 'হাংরি জেনারেশন' পত্রিকায় 'প্রতিদ্বন্দ্বীরা' নামে তাঁর যে কবিতাটি প্রকাশিত হয়, সেটি তখন পাঠক মহলে হই-চই ফেলে দেয়। সম্পূর্ণ পাঠবস্তুটিতে কবির রাগবর্ষিত চিৎকার আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। হাংরি আন্দোলনের সকল শরিকদেরকে গালাগালি দিতে থাকেন। কবিতাটিতে যে সমস্ত হাংরি শরিকদের নাম উচ্চারিত হয়েছে তাঁরা হলেন— মলয় রায়চৌধুরী, সুবিমল বসাক, শৈলেশ্বর ঘোষ, সুভাষ ঘোষ, প্রদীপ চৌধুরী, বাসুদেব দাশগুপ্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, এবং তারাপদ রায়। কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়কে হিপোক্রেট ও বদমাস আখ্যা দিয়ে লিখেছেন—

"মেয়ে মানুষের পেছনে হেঁটে যায় কারা
এখনও নরহত্যা করোনি তোমরা,
এখনও তোমাদের লিঙ্গ বেঁকে যায়নি...
পাগল কোলকাতা জানে শক্তির মতো হিপোক্রেসী
পাগল কোলকাতা জানে সন্দীপনের মতো ঠাণ্ডা বদমাসি"[৬৮]

কবি 'শিল্পের পাছায়...দানবিক সংগম' করতে পেরেছিলেন বলেই প্রতিষ্ঠান বিরোধীর তিলক-লেপে ওয়ান্টেড লিস্টেড হয়ে ওঠেন। তাঁর বিখ্যাত কাব্যটি হল 'নিজস্ব ছাই বিস্ফোরণ' (১৯৬৪)। সুবো আচার্যর কবিতায় পালাবদলের উচ্চতম ঘোষণা উপচে পড়ছে বারবার। তাই, বলা যায়, বাংলা কবিতায় নতুন কিছু করার ইতিহাস লিখতে বসে সুবো আচার্যকে বাদ দেওয়া কোনো মতেই সম্ভব নয়। হাংরি কবিদের তালিকাভুক্ত প্রথম সারির রূপকার হিসেবে সুবো আচার্য এক উজ্জ্বলতম ব্যক্তিত্ব।

* * * * *

পৃথক তত্ত্ববিশ্বে সাহিত্যের এসট্যাবলিশমেন্টকে গুরুত্ব না দিয়ে, 'অভিজাত উৎসের বাঁধন' ভাঙা অঘোরপন্থী স্বল্পায়ু এবং বহু আলোচিত কবি হলেন ফালগুনী রায় (১৯৪৫-১৯৮১)। তাঁর লেখায় রয়েছে জীবনের মাত্রাতিরিক্ত সত্যসন্ধানী হিসেব-নিকেশের বিশ্লেষণ।

আন্দোলনের সংহিতা গড়ে তুলতে উত্তর-কাঠামোবাদী মানদণ্ড সাহিত্যের প্রেক্ষিত রচনার সহায়ক হয়। সনাতন পাঠখণ্ডকে চুরমার করে ফালগুনী রায় কাব্যের আঙ্গিকগত আভরণ পালটে দিতে সক্ষম হয়েছেন। অবশেষে ব্যক্তি ও কবি ফালগুনী রায়কে তাঁর রচনার মধ্যে মিশে থাকতে দেখা যায়।

কবি নিজেকে অশিক্ষিত বলেই ঘোষণা করেন। তাই— "আমি পরপর কয়েকটা বই পড়ি যেমন প্রদীপ চৌধুরীর 'চর্মরোগ', সুভাষ ঘোষের 'আমার চাবি', বাসুদেব দাশগুপ্তের 'রন্ধনশালা', মলয় রায়চৌধুরীর 'জখম', শৈলেশ্বর ঘোষের 'জন্মনিয়ন্ত্রণ', সুবিমল বসাকের 'ছাতামাথা',— এই সব কবিতা ও গদ্যের বই ছাড়া কয়েকটি ম্যাগাজিনও পড়ে ফেলি, যেমন— জেব্রা-১, জেব্রা-২, হাংরি জেনারেশন ১-৯৯, ক্ষুধার্ত খবর ১ ও ২, ফুঃ ১,২,৩, প্রতিদ্বন্দ্বী ১,২,৩, ক্ষুধার্ত প্রতিরোধ ১ ও ২, WASTE PAPER ১ ও ২ ইত্যাদি। এইসব ম্যাগাজিনে প্রাগুক্ত কবি লেখক ছাড়া আরো কয়েকজনের লেখা ছিল যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম হচ্ছে সুবো আচার্য, এইসব কবি লেখকদের লেখা পড়বার পর আমার মধ্যে একপ্রকার জন্মান্তর ঘটে যায়, অবশ্য প্রায়শই আমার একপ্রকার অলৌকিক মৃত্যুর মধ্যে চলে যেতে হয় অর্থাৎ চেতনার মৃত্যু, তার ফলে নব জন্ম ঘটে পুনরায় এবং আমি মানে আমার চেতনা, চেতনা প্রতিনিয়ত এই মৃত্যু-প্রতীক চক্রে আবর্তিত হয়— অপরের লেখা পড়ে আমি শিখিনা কিছুই— অন্যের লেখা আমার জড়তাকে নাড়িয়ে দ্যায় শুধু।"[৬৯]

হাংরি আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য কবিদের মধ্যে গণ্য করা হয় ফালগুনী রায়কে। যিনি নিজের জীবনকে অকালে ধ্বংস করে দেন। জ্বালামুখী তাঁর কবিতা। তাঁর পাঠবস্তুতে স্থান পেয়েছে— অশ্লীলশব্দ, যৌনশব্দ, ইতরশব্দ, প্রতিবাদীশব্দ, ধ্বংসময়শব্দ, ইত্যাদি। ফালগুনীর উল্লেখযোগ্য কাব্যটি হল— 'নষ্ট আত্মার টেলিভিসন' (১৯৭৩)। "নিজের দেওয়া প্রতিশ্রুতির চিহ্নায়ণকে নিজেই বিনির্মাণ করতে করতে ফাল্গুনী টেক্সট আর কনটেক্সট অর্থাৎ পাঠকৃতি আর প্রসঙ্গের চিরাগত সম্পর্কও বদলে দিয়েছেন।"[৭০] জীবন অভিজ্ঞতার ক্রোধ, ঘৃণা, যন্ত্রণার ফসল স্বরূপ তাঁর টেক্সট আর কনটেক্সট-এর উপস্থাপন।

ফালগুনী রায় শব্দের শালীনতাকে অভ্যস্ত বাক্-চূর্ণ দ্বারা ধ্বস্ত করে যাবতীয় বয়ানকে গাম্ভীর্য মতলবে উন্মত্ত হয়ে ওঠার চিন্তায় নিয়গ্ন না হয়ে আধুনিকতার বিনির্মাণ ঘটিয়ে আভাঁগার্দ লিখিয়ের পরিচয় দিলেন। যেখানে অধুনান্তিকতার বীজ বপন করতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, সেখানে যৌন বাক্খণ্ড হুংকার ছাড়লেও অন্তর্বয়নে রয়েছে গেরিলা কায়দায় বাককেন্দ্রিকতার অন্তর্ঘাত মূলক আস্ফালন। প্রেমিকা এবং গ্রন্থ— দুইকেই ভালোবেসে ফালগুনী রায় তাঁর পুরুষাঙ্গের ক্ষুধা নিবৃত্তির চেষ্টা করেছেন কিন্তু মানবী তাঁকে ফিরিয়ে দিলেও, গ্রন্থ দিয়েছে প্রেমের মর্যাদা। বাস্তব জীবনে নারীর প্রেম তাঁকে করেছে নিরাশ। হয়তো এই জন্যই তিনি নেসাগ্রস্তভাবে জীবনকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়েছেন। সকল মিথ্যাকে তছনছ করে ফালগুনী রায় সত্যের সন্ধান স্বরূপ সভ্যতাকে স্বীকৃতি দিয়ে নারীর গোপনতাকে অনাবৃত করে উপস্থাপন করেছেন, যাকে অশ্লীল কিংবা যৌনগন্ধীর আরোপ করা হয়। ফালগুনী রায়ের কবিতা পাঠে তার যথাযথ প্রমাণ মেলে ঃ

ক) "একজন ঘরের বউ দেখলুম বহুগামিতায় বেশ্যাদের ছাড়িয়ে গেল
পয়সা ছাড়াই— আমার হাহাকার ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিলুম অট্টহাসি
প্রেমিকার চোখে চোখ রাখতে গিয়ে দৃষ্টি ফেলে একশো বিষাক্ত সাপ
চলে গ্যালো তার দিকে— আমি পুরোহিতের মন্ত্রপূত টিকিতে
গোমাংস ঝুলিয়ে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলুম ধর্মসংস্কারের সহ্যক্ষমতা"[৭১]

খ) "শুধুই রাধিকা নয়— গণিকাও ঋতুমতী হয়
তিন সন্তানের পিতা— পরিবার পরিকল্পনায় আদর্শপুরুষ
কৈশোরে করে থাকে আত্মমৈথুন— করে না কি"[৭২]

গ) "কি রকম বিচ্ছিরি দ্যাখো পেচ্ছাপের কথা
প্রেমের সময়
চুমুর শব্দে
আ হাহা যুবকদের পাইজামায় তাঁবু"[৭৩]

ঘ) "বেলুড় মন্দিরে প্রণামরতা এক বিদেশিনীর স্কার্ট ঢাকা আন্তর্জাতিক
পাইথনপাছা দেখে জেগেছিল আমার সীমাহীন যৌনতা মা তোমার
যৌনতা আমৃত্যু বাবার চিতার সঙ্গে লেপটে থাকবে বলে আমি
তোমায় ঈর্ষা করছি"[৭৪]

ঙ) "বোনের বুকের থেকে সরে যায় আমার অস্বস্তিময় চোখ
আমি ভাইফোঁটার দিন হেঁটে বেড়াই বেশ্যাপাড়ায়
আমি মরে গেলে দেখতে পাবো জন্মান্তরের করিডোর
আমি জন্মাবার আগের মুহূর্তে আমি জানতে পারিনি আমি জন্মাচ্ছি"[৭৫]

কবিতায় জীবনের আনন্দ খোঁজার পক্ষপাতী হওয়ার ফলে ছন্দকে প্রশ্রয় দেন নি কবি। জীবনের সঙ্গে তাঁর কোনো বিরোধ নেই, এমন কি মানুষের সঙ্গেও ফালগুনী রায়ের কোনো বিরোধ নেই। তিনি আন্দাজ মেপে কথা বলতে পারেন না, তাই তাঁর চোখে পড়ে ঘরের বউদের নষ্ট হওয়ার কাহিনি, যারা বহুগামিতায় বেশ্যাদেরও ছাড়িয়ে যায়। কিংবা ধর্মের পাণ্ডারা মানুষকে কীভাবে মিথ্যা দোহাই দিয়ে একঘরে করে রাখে তার সত্যাসত্য বর্ণনায় কবি সাহসিকতার পরিচয় দেন।

ফালগুনী রায় বাস্তব জীবনে নেশাগ্রস্ত দিন কাটালেও তাঁর কবিতায় নেশার কোনো চিহ্ন লক্ষ্য করা যায় না। হয়তো পারিবারিক জীবনে অজানা অশান্তির ফলে তিনি নিজেকে নেশার মাধ্যমে ধ্বংস করে দিতে তৎপর ছিলেন। এই জন্যই তাঁর কবিতার নামকরণে টাইটেল (স্বত্বনাম)-এর পরিবর্তে রুবরিক (শিরোনাম) পাই। তাঁর কবিতায় ঘৃণা, অশ্লীলতা, যৌনতা ইত্যাদির পেছনে রয়েছে আশ-পাশের পরিবেশ। তিনি যে অঞ্চলে বা কলোনিতে বাস করতেন

সেখানে সমকামী, বেশ্যা, মাতাল, নিম্নশ্রেণির কোন্দল, দেশি-বিদেশি মদের দোকান ইত্যাদি বর্তমান ছিল। নিজস্ব উপলব্ধির ঝকঝকে ক্ষুধাময় চিন্তা তাঁর কবিতার বিষয় হয়ে উঠবে, তাতে আর সন্দেহ কী। ফালগুনী রায়ের একমাত্র কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে উৎপলকুমার বসুর মন্তব্য, "'নষ্ট আত্মার টেলিভিসন' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হবার সাথে-সাথেই বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার যুগ শেষ হয়ে যায়।"[৭৬] কথাগুলো যে সম্পূর্ণ সত্য তার প্রমাণ উল্লিখিত ফালগুনী রায়ের গচ্ছিত কাব্যখণ্ড।

'শুধু রাধিকা নয়— গণিকাও ঋতুমতী হয়' কথাটার মাধ্যমে কবি গণিকা এবং রাধিকাকে একই পংক্তিতে মানুষের মর্যাদা দিয়ে দৃঢ়চেতার পরিচয় দেন। রাধিকা নামক নারীটি যেমন রক্ত-মাংসে গঠিত ঠিক তেমনি গণিকাও রক্ত-মাংসের মানবী। শুধু সামাজিক মর্যাদায় তারা ভিন্ন পরিস্থিতির অংশিদার। দুজনেরই ক্ষুধা-তৃষ্ণা-স্বাদ-আহ্লাদ-দুঃখ-স্বপ্ন প্রেম সমান। চিন্তায় ভিন্নতা মানুষ মাত্রেরই স্বাভাবিক। পরবর্তী বাক্যগুলোতে সেই সত্য কথনেরই রূপচিত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় আপনা-আপনি।

প্রকৃতির সৃষ্টি মানুষ, এই মানুষগুলো সৃষ্টির নিয়মের ব্যতিক্রমী হতে পারে না। তাই প্রস্রাব তার স্বাভাবিক ক্রিয়া, কিন্তু কারও সামনে এই অতি প্রয়োজনীয় সত্য ব্যাপারটি (পেচ্ছাপ) বলতেও আমরা সংকোচ কিংবা লজ্জাবোধ করি। কম বয়সের যুবক-যুবতী প্রেম করতে গিয়ে 'চুমু'-র উপলব্ধিতে শরীরে তাদের যৌনক্রিয়া সংগঠিত হয়। এটাও সম্পূর্ণ সত্য ব্যাপার। হাংরি আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্য সমস্ত বাস্তবকে অনভ্যস্ত প্রয়োগে অভ্যস্ত করে তোলা। হাংরি কবি ফালগুনী রায় তার অন্যতম পথপ্রদর্শক বলে আমাদের কাছে প্রমাণিত হয়।

বেলুড় মন্দিরে কোনো বিদেশি যুবতীর শরীরের সঙ্গে লেগে থাকা কাপড় রক্ত মাংসের উঠতি যুবক কবির মনে কাম জাগিয়ে দেয়। এমন ব্যাপার যদি না ঘটে তাহলে ধরে নিতে হবে সেই যুবকটির যৌনতা লুপ্ত হয়ে গেছে অথবা সে অসুস্থ। কবি উপলব্ধি করছেন বাবার মৃত্যুর পর মায়ের যৌনতা ওই শ্মশানেই পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে অর্থাৎ বিধবা নারী তার যৌন ক্ষুধাকে স্বামীর মৃত্যুর পর অবহেলায় অন্তরে পোষণ করবে। যা কবির চোখে প্রকৃতির নিয়মের গলদ মনে হয়েছে।

'বোনের বুকের থেকে সরে যায় আমার অস্বস্তিময় চোখ/আমি ভাইফোঁটার দিন হেঁটে বেড়াই বেশ্যা পাড়ায়'— কথাগুলো হয় তো সাধারণ মানুষের পক্ষে বলা সহজ নয়। যুবতী বোনকে দেখে কোনো ভাই-ই তার মনের গোপন ইচ্ছা চরিতার্থ করতে চাইবে না। তাই বলে বোনের বুকের দিকে কোনো ভাই একবারও তাকায়নি একথা বলার মতো ব্যক্তি একটিও নেই। হ্যাঁ নেই। ভাইফোঁটার দিন কবি বেশ্যা পাড়ায় হেঁটে বেড়ান। বোন ভাইকে ফোঁটা দেবার জন্য, তার মঙ্গল কামনা করার জন্য বাড়িতে কত আয়োজন করেছে, আর সেই ভাই বেশ্যাপাড়ায় কোনো মেয়ের গাত্রসুধা পান করে ঘুরে বেড়ায়, যে কি না অন্য কারো বোন। এমন সত্য কথা বলা অপরাধ ভেবে ফালগুনী রায়কে কবির মর্যাদা দিতে পারেননি অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অর্ধেন্দু চক্রবর্তী, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, জয় গোস্বামী, প্রমুখরা।

সমালোচক লেখেন "'নষ্ট আত্মার টেলিভিসন' এক সম্পূর্ণতা সন্ধানী আপাত-সমাপ্ত প্রতিবেদন। যার প্রতিটি কবিতা আলাদা ভাবে নির্মীয়মান চিহ্নায়ন প্রক্রিয়ার একক। কবিতার প্রচলিত অর্থ যেহেতু পুরোপুরি বিনির্মিত হয়ে গেছে, একে বলা যেতে পারে ফালগুনীর আত্ম বিনির্মাণের আখ্যান। বলাবাহুল্য এই বিনির্মাণ আসলে তাৎপর্যহীনতার বিরুদ্ধে তাঁর সর্বাত্মক যুদ্ধের সন্দর্ভ। বুর্জোয়া প্রতিবিশ্বের দ্বারা আক্রান্ত হয়েও নিজস্ব আখ্যানের মধ্যে বাস্তবতাকে যেন পুনর্নির্মাণ করে নিয়েছেন তিনি। তাঁর ক্রোধের আড়াল থেকে উঠে আসে হাহাকার, আহত কৌতুকের ছায়াঞ্চল থেকে দেখা দেয় তিক্ত ক্রোধ।"[৭৭] আমরাও ফালগুনী রায়ের কাব্য সম্পর্কে সমালোচকের সঙ্গে একমত।

যৌনতা ব্যতীত জীবন হতে পারে না, একথা ফালগুনী রায় তাঁর পাঠকৃতিতে ব্যক্ত করেছেন এবং হাংরি পদ্য-গদ্য রচয়িতারা তারই সংহিতাস্থাপক। নান্দনিক চিন্তাবিশ্বের জল রঙকে লাল করে দিয়েছেন ফালগুনী রায় তাঁর কবিতার ইনকেলাবি ভাষা-চিন্তায়। রবীন্দ্র পরবর্তী সময়ে বঙ্গসংস্কৃতির ভিত কাঁপিয়ে দেওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ফালগুনী রায় এটোম। তাই ফালগুনী রায়ের উওরসূরী হয় না, তিনি আপন প্রতিভায় মানুষের গুহ্যদ্বারের মনোবিকলন হাতিয়ে নকশা তৈরি করেছেন তাঁর কালো অক্ষরে। কবি লেখেন— রবীন্দ্রনাথ কিংবা রঘু-ডাকাত হতে চান না, তিনি, ফালগুনী রায় হতে চান, শুধু ফালগুনী রায়।

* * * * *

১৯৬৩-খ্রিস্টাব্দে হাংরি আন্দোলনের উদ্দেশ্য সফল স্বরূপ বাংলা-ভারত পেরিয়ে পৃথিবীর আনাচে-কানাচে জায়গা করে নিতে লাগল। যুবক কবি-সাহিত্যিকরা মনের কথাকে গোপনতামুক্ত ভাবে প্রকাশের পীঠস্থানে হুড়হুড় করে কবিতা প্রকাশ ও সমর্থনের মাধ্যমে এগিয়ে এলেন। সে সময়ে প্রকাশিত কবিদের অনেকের কবিতাই এখন পাওয়া কষ্টকর। তাদের মধ্যে কারো কারো একটা দুটো কবিতা পাওয়া যায় যেগুলো হাংরি বুলেটিন বা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। যাঁরা হাংরি বুলেটিন বা পত্রিকায় একটা-দুটো কবিতা লিখেছিলেন কিংবা হাংরি আন্দোলনকে সমর্থন করে সঙ্গে ছিলেন তাঁরা হলেন— অমিত সেন, অরনি বসু, অরূপরতন বসু, অশোক চট্টোপাধ্যায়, তপন দাস, ত্রিদিব মিত্র, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র গুহ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, শম্ভু রক্ষিত, ভানু চট্টোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, আলো মিত্র প্রমুখ।

আলো মিত্র নামে একমাত্র যুবতী হাংরি আন্দোলনকে সমর্থন করে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি যদিও হাংরি ইশতিহার বা হাংরি পত্রিকার কোথাও কোথাও দু'একটা লিখেছেন। 'Waste Paper' নামে একটি ইংরেজি পত্রিকা দীর্ঘদিন ত্রিদিব মিত্রের সঙ্গে সম্পাদনা করেন। তিনি একটি গদ্যধর্মী লেখায় লেখেন— "রাস্তার প্রতিটি খণ্ড খণ্ড ভিড়, নিয়ন লাইট, ট্রামবাস ড্রাইভার ফেরীঅলা আধন্যাংটো সন্ন্যাসী— প্রতিটি ঘাড় এখন আমার দিকে— প্রতিটি চোখ এখন খুনী ও ভিখিরী— আমার অন্তর্বাস ভেদ কোরে ছুটে যাচ্ছে রঞ্জনরশ্মি— কুড়িটা impression অর্থাৎ কুড়ি জন্ম, এরপর একুশ, আর প্রতিবারই আমি কিরকম সরে যাচ্ছি ক্রমশঃ— নানা

অজুহাতেই ছুটে আসছে পঙ্গপাল লোভক্ষিধেঘেন্নাক্ষিধেহিংসাক্ষিধেরাগক্ষিধে ও ১ প্রেম ও ১ ঘেন্না ১ লোভ ও ১ ক্রোধ নিয়ে তুমি নির্বিকার তুমি বিশুদ্ধ খ্রীষ্টান বিশুদ্ধ প্রতারক তুমি বিশ্বাসহীন বিশ্বাস, ২০ মাঝামাঝি ২১-এর ১ শরীরের মাংস ফুঁড়ে বেরোচ্ছে তেইশ হাজার কুকুর ও তেত্রিশকোটি শালগ্রাম শিলা—"[৭৮]

আলো মিত্র হাংরি আন্দোলনকে সমর্থন করেন, তিনি যে একজন হাংরি লেখিকা উক্ত উদ্ধৃতি তারই সাক্ষ্য দেয়। আরো একটু তাঁর ভাষ্য শোনা যাক— "নপুংসক কোলকাতার ধ্বজভংগ পালপাল মগজহীন প্রেমহীন জানোয়ারের পাল ছুটছে আমার পিছু পিছু— প্রতিটি পুং-খচ্চর চাইছে প্রতিটি মেয়েকে ব্যবহার কোরতে— প্রতিটি পুং-প্রেমিক আজ পুং-বেশ্যা এবং কোলকাতার পুলিশের আইন-রক্ষার কবচের মধ্যেও পেয়েগেছি ক্রূর নষ্ট অভিসন্ধি— এসব থেকে কে আমায় বাঁচাবে, এসব থেকে কে তোমায় বাঁচাবে কোলকাতা— আমি আলো আর ত্রিদিব বেঁচে আছি প্রচণ্ড অসন্তারের মধ্যে— জলন্ত ক্ষুধার মধ্যে— এক মূর্ত্তিমান চ্যালেঞ্জ।"[৭৯] এই লেখাটিও এক সময় সনাতনী সাহিত্যকে ঝাকুনি দিতে সক্ষম হয়েছিলেন তার প্রমাণ উল্লিখিত বাক্যমালা।

* * * * *

হাংরি ইশতিহার বা হাংরি পত্রিকায় সকলের লেখাই সামান্য। কেননা আন্দোলনের যে উদ্দেশ্য তাকে পদ্য-গদ্য-চিত্রকর-প্রেমী প্রমুখ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে যে সমস্ত সতর্কতা-মূলক ক্রিয়াকাণ্ড করতে হয়েছে, তাতে সাহিত্য-চর্চার সময় ছিল সীমিত। এই অল্প সময়ে ত্রিদিব মিত্র (১৯৪৩ —) নামে একজন রাগী, মেধাবী, বিশ্বাসী এবং মনে প্রাণে হাংরি চিন্তায় আত্মমগ্ন যুবকের আবির্ভাব ঘটেছিল। আলো মিত্র-কে সঙ্গে নিয়ে হাংরি আন্দোলনকে প্রচারমুখী করে তুলেছিলেন তিনি। রাতের অন্ধকারে দেয়াল লিখন ও পোস্টার লাগিয়ে হাংরি শরিকদের অন্যতম হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য 'প্রলাপ দুঃখ'।

হাংরি আন্দোলনের সময় প্রকাশিত ত্রিদিব মিত্রের বিখ্যাত কবিতাটি হল 'ফোকর'। চৌত্রিশ চরণের পাঠবস্তুটিতে হাংরি কবিতার অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের উপস্থাপন বর্তমান। তাঁর কাব্যভাষা খানিক আস্বাদন করা যেতে পারে ঃ

"এই জেনারেশন / ওই জেনারেশন / সেই জেনারেশন ...
হাজার গণ্ডা জেনারেশন চোখ কুঁচকে দাঁত খিঁচিয়ে লিঙ্গ উঁচিয়ে
সব সময়ই যেন তেড়ে আসে
তারই মধ্যে ঘুরঘুর করে ইতিহাসের হাঃ হাঃ কঙ্কাল
আঃ মানুষ আঃ স্ত্রীযন্তর আঃ সভ্যতা আঃ সমাজ আঃ আদর্শ আঃ ছেঁড়া
জুতো এঃ মাগো"[৮০]

'ফোকর' দেশি শব্দ। সমস্ত জেনারেশনই কবির কাছে 'ফোকর' অর্থাৎ গর্ত বা খোপ। এই খোপে পা দিতে না চাইলেও পার্শ্ব পরিস্থিতি মানুষকে আপনা-আপনি টেনে নিয়ে যায়।

অজুহাতেই ছুটে আসছে পঙ্গপাল লোভঙ্ক্ষিধেঘেন্নাক্ষিধেহিংসাক্ষিধেরাগক্ষিধে ও ১ প্রেম ও ১ ঘেন্না ১ লোভ ও ১ ক্রোধ নিয়ে তুমি নির্বিকার তুমি বিশুদ্ধ খ্রীষ্টান বিশুদ্ধ প্রতারক তুমি বিশ্বাসহীন বিশ্বাস, ২০ মাঝামাঝি ২১-এর ১ শরীরের মাংস ফুঁড়ে বেরোচ্ছে তেইশ হাজার কুকুর ও তেত্রিশকোটি শালগ্রাম শিলা—"[৭৮]

আলো মিত্র হাংরি আন্দোলনকে সমর্থন করেন, তিনি যে একজন হাংরি লেখিকা উক্ত উদ্ধৃতি তারই সাক্ষ্য দেয়। আরো একটু তাঁর ভাষ্য শোনা যাক— "নপুংসক কোলকাতার ধ্বজভংগ পালপাল মগজহীন প্রেমহীন জানোয়ারের পাল ছুটছে আমার পিছু পিছু— প্রতিটি পুং-খচ্চর চাইছে প্রতিটি মেয়েকে ব্যবহার কোরতে— প্রতিটি পুং-প্রেমিক আজ পুং-বেশ্যা এবং কোলকাতার পুলিশের আইন-রক্ষার কবচের মধ্যেও পেয়েগেছি ক্রূর নষ্ট অভিসন্ধি— এসব থেকে কে আমায় বাঁচাবে, এসব থেকে কে তোমায় বাঁচাবে কোলকাতা— আমি আলো আর ত্রিদিব বেঁচে আছি প্রচণ্ড অসভ্যারের মধ্যে— জলন্ত ক্ষুধার মধ্যে— এক মূর্ত্তিমান চ্যালেঞ্জ।"[৭৯] এই লেখাটিও এক সময় সনাতনী সাহিত্যকে ঝাকুনি দিতে সক্ষম হয়েছিলেন তার প্রমাণ উল্লিখিত বাক্যমালা।

* * * * *

হাংরি ইশতিহার বা হাংরি পত্রিকায় সকলের লেখাই সামান্য। কেননা আন্দোলনের যে উদ্দেশ্য তাকে পদ্য-গদ্য-চিত্রকর-প্রেমী প্রমুখ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে যে সমস্ত সতর্কতা-মূলক ক্রিয়াকাণ্ড করতে হয়েছে, তাতে সাহিত্য-চর্চার সময় ছিল সীমিত। এই অল্প সময়ে ত্রিদিব মিত্র (১৯৪৩ —) নামে একজন রাগী, মেধাবী, বিশ্বাসী এবং মনে প্রাণে হাংরি চিন্তায় আত্মমগ্ন যুবকের আবির্ভাব ঘটেছিল। আলো মিত্র-কে সঙ্গে নিয়ে হাংরি আন্দোলনকে প্রচারমুখী করে তুলেছিলেন তিনি। রাতের অন্ধকারে দেয়াল লিখন ও পোস্টার লাগিয়ে হাংরি শরিকদের অন্যতম হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্য 'প্রলাপ দুঃখ'।

হাংরি আন্দোলনের সময় প্রকাশিত ত্রিদিব মিত্রের বিখ্যাত কবিতাটি হল 'ফোকর'। চৌত্রিশ চরণের পাঠবস্তুটিতে হাংরি কবিতার অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের উপস্থাপন বর্তমান। তাঁর কাব্যভাষা খানিক আস্বাদন করা যেতে পারে ঃ

"এই জেনারেশন / ওই জেনারেশন / সেই জেনারেশন ...
হাজার গণ্ডা জেনারেশন চোখ কুঁচকে দাঁত খিঁচিয়ে লিঙ্গ উঁচিয়ে
সব সময়ই যেন তেড়ে আসে
তারই মধ্যে ঘুরঘুর করে ইতিহাসের হাঃ হাঃ কঙ্কাল
আঃ মানুষ আঃ স্ত্রীযন্তর আঃ সভ্যতা আঃ সমাজ আঃ আদর্শ আঃ ছেঁড়া
জুতো এঃ মাগো"[৮০]

'ফোকর' দেশি শব্দ। সমস্ত জেনারেশনই কবির কাছে 'ফোকর' অর্থাৎ গর্ত বা খোপ। এই খোপে পা দিতে না চাইলেও পার্শ্ব পরিস্থিতি মানুষকে আপনা-আপনি টেনে নিয়ে যায়।

মানুষ জেনারেশন-গেপ-কে পূর্ণ করতেই ফোকর-কে বেছে নেয়। তারপর চলে প্রতিক্রিয়া। কবিও সেই জেনারেশন-এর ফোকর ভালোবাসা অর্থাৎ আত্মহত্যার কাঠামো খুঁজছেন। কবি অনুভব করছেন তিনি যে জেনারেশনের শরিক সেখানে 'পাকা দালাল গুঁড়িয়ে দাঁতাল পুলিশযন্ত্র / চুরমার কোরে— পায়ের তলায় ভিমরি খেয়ে পড়েছে জ্যাঠাসভ্যতা'। তাই কবি পাগলের মতো হা হা করে হাসছেন। এখন সমস্ত নান্দনিক সভ্যতাকে চুরমার করে দিতে কবি যেন তৎপর।

ত্রিদিব মিত্রের কবিতায় পাওয়া গেছে পাগলামো, সত্যকথন, জেদী-ভাব, উল্লাস, নিজের প্রতি বিশ্বাস, যৌনশব্দ, কলকাতাকে কাঁপিয়ে দেবার ইচ্ছা, শব্দের পরিবর্তে গণিত এবং ছন্দ ভাঙার চিহ্ন। তাই 'আনকোরা' কাপড় পরিধান করে ত্রিদিব মিত্র হাংরির অমর কবির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত।

* * * * *

স্বল্প সময়ের জন্য হাংরি আন্দোলনে একজন মুসলমান কবির আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনি সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ। তাঁর 'ঈশ্বর' নামক একটি কবিতা ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দের হাংরি বুলেটিনে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীতে তিনি হাংরি বুলেটিন বা পত্রিকায় লেখেন নি। মাত্র ছয় চরণের কবিতা। সবেমাত্র তিনি কবিতা লেখায় হাত পাকাচ্ছেন। তবুও হাংরি-র ইতিহাসে কবিতাটির গুরুত্ব অনেক। কবিতাটি সম্পূর্ণ তুলে দেওয়া হল—

"পথটা নদী পেরিয়ে গেছে
নদীটা পেরিয়ে গেছে পথ
ভাবছি কে পেরোলো আগে।
আমরা গড়েছি পথটা
দেখেছি নদীকে
নদীটা ছিলই।"[৮১]

সাধারণ কবিতা। বোধহয় হাংরি আন্দোলনে সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে সংযুক্ত করতেই এই প্রয়াস। নইলে পাঠবস্তুটিতে হাংরি কবিতার কোনো বৈশিষ্ট্যই ধরা দেয় না।

* * * * *

শম্ভু রক্ষিত, অসিত সেন, অরনি বসু, অরূপ রতন বসু, অশোক চট্টোপাধ্যায়, তপন দাস, দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র গুহ, কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়, ভানু চট্টোপাধ্যায়, প্রমুখের হাংরি কবিতা বা গদ্য বর্তমান পাওয়া যায় না এবং এঁদের মধ্যে অনেকের লেখাই হংরি বুলেটিন বা পত্রিকায় প্রকাশ পায়নি। কিন্তু এরা প্রত্যক্ষভাবে হাংরি আন্দোলনের সহযাত্রী। হ্যাঁ, মলয় রায়চৌধুরীর মতে হাংরি আন্দোলন ভেঙে যাওয়ার পূর্ববর্তী সময়ের হাত শক্ত করার অন্যতম ছিলেন এঁরা।

হাংরি জেনারেশনের গোলমাল সংখ্যায় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-এর (১৯৪১—) একটি দীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয়। এর পূর্বে এবং পরে তাঁর কোনো লেখাই হাংরির গণ্ডিতে দেখা যায়নি।

মলয় রায়চৌধুরী, প্রদীপ চৌধুরী, সমীর রায়চৌধুরী, দেবী রায়, শৈলেশ্বর ঘোষ, উৎপলকুমার বসুরা যখন কাব্যে অশ্লীলতা ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে গ্রেপ্তার হলেন তখন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কোথায় উধাও হয়ে গেলেন কেউ জানেন না। তিনি গ্রেপ্তার-ও হলেন না এবং কোনো মুচলেকাও দিলেন না। কিন্তু তাঁর 'মাঝরাতে বিপন্নতা' যে হাংরি বৈশিষ্ট্যের নবরত্নে ঝলসানো তা স্বীকার করতেই হয় ঃ

"একদিন মধ্যরাতে নালীতে পেচ্ছাব করার সময়
অচেনা ভয়ের শব্দে চমকে উঠে বসে পড়ি
ঘৃণায় ও আক্রোশে জ্বলে নিজের মাংসের গন্ধ চতুর্দিকে ছুড়ি।...
ক্রমাগত পাঁচবার যৌনসংযোগের পর
খচ্চর যুবক যেমন রক্তকে বীর্যের ফোয়ারায় দেখে
বুকে হাত রাখে
আমার ক্ষুধার মধ্যে আমার মৃতের সৎকার ডাকাডাকি করে।"[৮২]

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় জীবন অভিজ্ঞতার দুঃখ, বেদনা, আক্রোশ, ঘৃণা ইত্যাদির উপলব্ধি ঘটিয়েছেন সত্যের কারিগর হয়ে। তাই মধ্যরাতে ঘুম ভাঙার পরই অচেনা ভয় কবিকে তাড়া করে। এমন ভয় সকল চিন্তাশীল মানুষের অন্তরে হানা দেয় কিন্তু আমরা বুঝি না কিসের ভয়। সেই ভয় থাকে বলেই আমরা অলৌকিক অন্ধকারে কিছু সময় মুখ গুঁজে শুতে চাই, আর হিসেব করি জীবনে আসা-যাওয়ার দিন নিয়ে। তারই মধ্যে স্বার্থপর যুবক ইন্দ্রিয় সুখে তৃপ্ত হতে সকল কিছুকে ভুলে যখন জীবনের স্বাদ থেকে উঠে দাঁড়ায় তখন সমস্ত কিছুকে মিথ্যা মনে করে 'বুকে হাত রাখে'।

ঈশ্বর জ্ঞানী এবং পাপিষ্ঠ হতে পারেন না। ঈশ্বর নেই। ঈশ্বর মানুষের কোনো কাজের নাম নয়। ঈশ্বর তুমি যদি থাকতে তাহলে পৃথিবীতে প্রয়োজনীয় মানুষের সমস্ত চাওয়াই পূর্ণ করতে। কবি এখন দুহাতে মস্তিষ্ক ছিঁড়ে আনতে চান এবং সেই সঙ্গে জন্মের ইতিহাসটাও। তাই কবি নিজের চিন্তার মধ্যে অর্থাৎ রক্তে পূর্ব পুরুষের সৎচিন্তা আবিষ্কার করেন। যেমন কবি বলেন— 'আমার ক্ষুধার মধ্যে আমার মৃতের সৎকার ডাকাডাকি করে'।

তারপরই কবি লক্ষ্য করেন বাংলার শহরে গলিতে 'গুমগুম', 'ট্রামস্টাইক', 'জলন্ত ডবলডেকার' ইত্যাদি। এমনি পরিস্থিতিতে মাথায় কোনো চিন্তা ঠিকমত আসে না। সিগারেটে টান দিতেই মস্তিষ্ক যেন পাগল হয়ে যাওয়ার মতো নানা ভাবনার বিস্ফোরণ ঘটে। খেতে না পাওয়া কুমারী মেয়েটি জলহীন টিউওয়েলের হ্যাণ্ডেলে চেপে জল বের করার চেষ্টা করে গালাগালি দেয়। কবি শার্ট-প্যাণ্ট খুললেই শরীরে ক্ষতের দাগ দেখেন। তাই 'এসব তির্যক দন্ত দিগ্বিদিক তোলপাড় করে' তোলে কবিকে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের উক্ত পাঠবস্তুটি প্রমাণ করে তিনি একজন শক্তিশালী হাংরি কবি ছিলেন। তাই হাংরি-র ইতিহাস কবিকে স্মরণ করবে চিরকাল।

* * * * *

বর্তমান বাংলা কাব্যাকাশে প্রথম সারির কবিদের মধ্যে বিনয় মজুমদার (১৯৩৪ - ২০০৬) অন্যতম। স্বাধীনচেতা বিনয় মজুমদার জীবনটা কাটিয়েছেন পাগলামোর মধ্যে। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে চাকরি করলেন না। গায়ত্রী নামে এক যুবতীকে ভালোবেসে সংসার থেকে দূরে রইলেন। হাংরি আন্দোলনে যোগদান করে কিছুদিন হাংরি কবি হতে চেয়ে সেখান থেকেও বেরিয়ে এলেন। প্রতিষ্ঠানেরও প্রিয়পাত্র হতে চাইলেন না। বিনয় মজুমদার হাংরি থেকে আলাদা হয়ে ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে একটি ইশতিহার প্রকাশ করেন। তাঁর হাংরি ইশতিহারটি ইতিহাসের সাক্ষ্য স্বরূপ আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য ঃ

“

ঃ ঘোষণা ঃ

১) শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের অনিপুণ নপুংসকরূপ আশা করি এযাবৎ পাঠক-পাঠিকা স্বচক্ষে দেখার সুযোগ পাননি। সরকার পৃষ্ঠপোষকতা করে অবস্থাকে বেশ মজাদার করেছেন। পদলেহী কুক্কুরের নিয়োগকারিণী চালচুলোহীনা এক নারীর আত্মার নির্দেশনা অনুসারে উক্ত কবি নিজেকে মহিলা মনে করে কবিতা লেখেন ; আর কথোপকথনকালে দেখি মহিলার অভিনয় করায় শ্রীমানটির কোনো ভাবলেশ উপস্থিত হয় না ; অথচ ক্রমে ক্রমে আমার দাসীত্ব দিয়ে সেই বেয়াদপ আত্মাটিকে শায়েস্তা করেছি, আর অঙ্কশাস্ত্রে শ্রীমতী এখন মতামত জ্ঞাপনের মতন স্থূলতা দেখাবার বিপদের ঝুঁকি দিতে সক্ষম হবে কি ; কবিটির জন্ম কি কুকুর আর গাধার সঙ্গমজাত ফল ?

২) স্থাপত্য বিদ্যায় ফেল মেরে মেরে অবশেষে এক ছাগলাদ্য বীর্যজাত নির্মল মৈত্রের জীবিকায় হাস্যকর ভিক্ষাবৃত্তি ঝুলে আছে ; তবে ভয় নেই যতক্ষণ তার কচি পায়ু আছে দালালী রয়েছে।

৩) সন্দীপন, হে শ্রীমান, দাস অনুদাস শব্দটি শুনেছিলাম কবে যে প্রথমবার ঠিক মনে নেই। তবে এটা নিশ্চিতই কবুল করতে হবে আজ— দাসী অনুদাস বলে কোনো শব্দ এযাবৎ আমি তো শুনিনি। ফলে যথাযথরূপে তোমার অবস্থা প্রকাশের ভাষার স্বল্পতা, বৎস, ভবিষ্যতে ভেবে দেখা যাবে।

৪) দল পাকাবার আগে, পরেও তাদের রেক্টাম বীট করে দিয়েছি বলেই এইসব কেঁচোবৃন্দ বিটনিক নাম নিয়েছিল।

১০. ৬. ১৯৬৪
রচয়িতা ও প্রকাশক
বিনয় মজুমদার
৬৯ মির্জাপুর স্ট্রীট, কলকাতা-৯

”১৮৩

শক্তি চট্টোপাধ্যায় এবং সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় এই দুজনকে অশ্লীল ভাষায় গালাগালি করেছেন বিনয় মজুমদার। এঁরা দুজন যে অনেক নিরীহ প্রতিভাধর সাহিত্যিকের ক্ষতি করতে চেয়েছেন তার প্রমাণ বিনয় মজুমদারের লিফলেট। কিন্তু মলয় রায়চৌধুরী সম্পর্কে কখনও খারাপ ধারণা রাখতেন না। তাঁকে মৃত্যুর আগে জিজ্ঞেস করলে বলতেন, তিনি কখনও হাংরি আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন না। হয়তো অনেক বেদনা, দুঃখ তাঁকে এমন কথা বলতে বাধ্য করে। তাঁর কবিতায় অশ্লীলতার গন্ধ পাওয়া না গেলেও লিফলেটের মধ্যে অশ্লীল শব্দ স্বরূপ ব্যবহার করেছেন— নপুংসক, পদলেহী, কুক্কুর, বেয়াদপ, সঙ্গম, বীর্যজাত, কচিপায়ু, দালাল, ইত্যাদি। বলাযায় সমস্ত শব্দগুলো রাগের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

হাংরি বুলেটিনে ১৯৬৩-তে বিনয় মজুমদারের একটি ছোট্ট কবিতা প্রকাশ পায়। কবিতাটি পাঠযোগ্য ঃ

"সন্তপ্ত কুসুম ফুটে পুনরায় ক্ষোভে ঝরে যায়
দেখে কবিকুল এত ক্লেশ পায়, অথচ হে তরু
তুমি নিজে নির্বিকার, এই প্রিয় বেদনা বোঝনা।
কে কোথায় নিতে গেছে তার গুপ্ত কাহিনী জানিনা।
নিজের অন্তর দেখি, কবিতার কোনো পংক্তি আর
মনে নেই গোধুলিতে, ভালবাসা অবশিষ্ট নেই।
অথবা গৃহের থেকে ভুলে বহির্গত কোনো শিশু—
হারিয়ে গিয়েছে পথে, জানেনা সে নিজের ঠিকানা।"[৮৪]

বিনয় মজুমদারের উক্ত পাঠবস্তুটি হাংরি বৈশিষ্ট্যের রঙ ফোটাতে ব্যর্থ। তিনি নিজেও বুঝেছিলেন মলয় রায়চৌধুরী, প্রদীপ চৌধুরী, কিংবা অন্যরা যে ধরনের কবিতা লেখেন সে প্রকৃতির চিন্তায় নিজেকে প্রস্তুত করতে পারবেন না কবি। তবুও ইতিহাসের মাঠকাঠিতে বিনয় মজুমদার হাংরি কবি।

* * * * *

হাংরি লেখকদের তালিকায় সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়েরও (১৯৩৩ - ২০০৫) নাম লক্ষ্য করা যায়। হাংরি আন্দোলনে যুক্ত লেখকদের মধ্যে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় শক্তিশালী প্রতিভাধর ছিলেন। পদ্য এবং গদ্য দুধরনের লেখাই হাংরি বুলেটিন এবং পত্রিকায় প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তার কিছুই আবিষ্কার সাধ্য নয়। কারণ সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় নিজে সেগুলো সংরক্ষণ করেননি। কোনো ধরনের বুলেটিন বা পত্রিকা সে সময় রাখার প্রয়াস করা হয়নি। হাংরি আন্দোলনকে সমর্থন করার পেছনে ছিল মলয় রায়চৌধুরী এবং সমীর রায়চৌধুরীর কাছে গুরুত্ব লাভ করা। জীবনের শুরুতে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় লেখা প্রকাশ করার জন্য অনেক চেষ্টা করলেও পাত্তা পান নি। হাংরি আন্দোলনের ক্ষুদ্র পেক্ষাপটে বৃহৎভাবে স্থান লাভ করে তিনি আহ্লাদিত ছিলেন। হাংরি আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য— "আমি হাংরি আন্দোলনের সঙ্গে ভীষণভাবেই

জড়িত ছিলাম। হাংরি আন্দোলনের আদর্শ— আমার ভালোলেগেছিল এবং তা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছিলাম বলেই আমি ওদের সঙ্গে ছিলাম। এ ব্যাপারে আমার কোন দ্বিমত নেই।"[৮৫]

হাংরি আন্দোলন থেকে দূরে সরে যাবার কারণ স্বরূপ বলেছেন— "আমি মুচলেকা দিয়েছিলাম তার দুটো কারণ। এক আমি পুলিশকে ভীষণ ভয় পাই আর দুই, আমার বউ আমাকে জেলে যেতে বারণ করেছিল।"[৮৬] সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় এই ঐতিহাসিক পালাবদলকারী আন্দোলন সম্পর্কে বলেন— "বস্তুত হাংরি জেনারেশন একটা আইডিয়া। হাংরি জেনারেশন মূলত কাব্য আন্দোলন। প্রায় ডজন দুই আনকোরা নতুন নাম নিয়ে আধুনিক বাংলা কাব্যকে এখন উপদ্রুত অঞ্চল বলা চলে। কবিতায় কোনো রূপ নেই রস নেই গন্ধ নেই স্পর্শ নেই সুর নেই— সিমবল ইমজ রূপক বা অলংকার— এমন কী সামান্যতম পয়ার পর্যন্ত ত্যাগ করে বাংলা কবিতা চিরস্তব্ধতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।"[৮৭] সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় হাংরি আন্দোলনে যতক্ষণ ছিলেন তাঁর সমর্থন প্রমাণ করে অন্তরের সদিচ্ছা।

* * * * *

করুণানিধান মুখোপাধ্যায় (১৯৩২/৩৩– ?) এবং অনিল করঞ্জাই (১৯৪০ - ২০০১) নামে দুজন চিত্রকর হাংরি আন্দোলনের প্রত্যক্ষ সমর্থক ছিলেন। করুণানিধান মুখোপাধ্যায়ের শৈশব এবং যৌবন কেটেছে অভাব অনটনের মধ্যে। তিনি মলয় রায়চৌধুরীর 'হাংরি জেনারেশনের কাব্যদর্শন' পড়ে নিজের জীবনকে নতুন ভাবে আবিষ্কার করেন। উপলব্ধি করেন— সাহিত্য, কবিতা, শিল্প, বাঁচার লজিক, সত্যি কথার হাজার বয়ান। মনের মধ্যে নানা বিচার আসতে থাকে। কবিতা, শিল্প, স্বাধীনতা নিয়ে যখন পৃথিবী ব্যাপী নতুন কিছু করার চিন্তায় হুলস্থুল চলছে তখন করুণানিধান মুখোপাধ্যায় আবিষ্কার করলেন হাংরির উলঙ্গ দ্বার। তিনি অনুভব করলেন, হাংরিরা তাঁদের কাব্য-সাহিত্যে যা লিখছেন, সমস্তই যেন মানুষের কথা, নিজের জীবনের কথা, মনের কথা।

হাংরি আন্দোলনের আরো একজন বিখ্যাত চিত্রকর হলেন অনিল করঞ্জাই। ১৯৪৭-এ ভারত-পাকিস্থান ভাগ হয়ে যাবার ফলে যে দাঙ্গা হয়েছিল, তাতে আক্রান্ত হয়ে বর্তমান বাংলাদেশের রংপুর থেকে বাস্তুভিটা ত্যাগ করে বেনারসে এসে বসবাস স্থাপন করলেন। ১৯৬৪-তে মলয় রায়চৌধুরীর হাংরি আন্দোলনে যোগদান করেন তিনি। তাঁর সঙ্গে সুবীর ও বিভাস নামে দুজন যুবক হাংরি আন্দোলনের শরিক হন। তাঁর জীবন ছিল উচ্ছৃঙ্খল। তাঁর ছবিতে পরাবাস্তববাদীদের এক্সকুইজিট কর্পস-এর পরিবর্তে ঔপনিবেশিক ব্যক্তিপ্রতিস্বরাদ থেকে চিত্রাঙ্কনকে মুক্তি দেওয়াই ছিল প্রধান উদ্দেশ্য। তখন ভিজুয়েল আর্টের দিনও শেষ হয়ে গেছে।

হাংরি বুলেটিন পড়ে অনিল করঞ্জাই অভিভূত হন এবং মলয় রায়চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করে জানতে পারেন ইতিপূর্বে হাংরি আন্দোলনের কবিতা, ধর্ম, নাটক, ছোটগল্প, রাজনীতি সমালোচনা ইত্যাদির ম্যানিফেস্টোর আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। তাই অনিল করঞ্জাই উদ্যোগী হয়ে চিত্রাঙ্কন সম্পর্কিত ইশতিহার প্রকাশের দায়িত্ব নেন। তবে ইশতিহারটিতে অনিল করঞ্জাইয়ের সঙ্গে করুণানিধান মুখোপাধ্যায়ও লেখেন।

মলয় রায়চৌধুরী জানাচ্ছেন, 'হাংরিয়্যালিজম' শব্দটি নাকি অনিল করঞ্জাই-ই তাঁকে দিয়েছেন। অনিল করঞ্জাইয়ের মতে— "পেইনটিংকে লোকায়ত কাজের মতন ফ্রেম থেকে এমনভাবে মুক্তি দিতে হবে যাতে তার কোনো ফোকাল বা কোর পয়েন্ট না থাকে, যাতে ক্যানভাসের সর্বত্র বিরাজ করে ছবিটির সার্বভৌমত্ব ; একটি পেইনটিঙে মাল্টি এন্ট্রি ও মাল্টি এগজিট থাকবে ; সুররিয়ালিস্ট, কিউবিস্ট, অ্যাবস্ট্রাকশনিস্ট, ওনারা কেউই ছবিকে ফোকাল পয়েন্ট থেকে মুক্ত করতে পারেন নি।"[৮৮] তাই মুখ্যত ছবিতে 'ইনডিজেনাস কনটিনজেন্সি' থাকতে হবে। আসলে হাংরি আন্দোলনকারী পদ্য-গদ্য রচয়িতা কিংবা চিত্রকর সকলই চেয়েছিলেন 'ঔপনিবেশিক' ক্যানন থেকে মুক্তি। এবং সফলও হয়েছেন নিজ নিজ গণ্ডিতে।

* * * * *

হাংরি জেনারেশন মূলত কাব্য আন্দোলন হলেও, এই আন্দোলনে তিনজন গল্পকারেরও আবির্ভাব ঘটেছিল। শক্তিশালী গল্পকার। এঁরা নতুন আঙ্গিকে, নতুন ভাষায়, নতুন চিন্তায় বাংলা গল্পের ইতিহাসে পালাবদলের হাইপ্রফাইল ট্রেন্ট নিয়ে এলেন। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, প্রেমেন্দ্র প্রমুখের গল্পের চিন্তাবিশ্বে জবরদস্ত ঝাকুনি দিয়ে গল্পকে মুক্তি দিলেন রজঃস্রাবের সত্য কথনে। নান্দনিকতাকে খাঁচায় পুরে প্রাতিষ্ঠানিক মধুকুণ্ডে আগুন লাগিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন এই গল্পকাররা।

হাংরি জেনারেশনের তিন বিখ্যাত গল্পকার হলেন— সুবিমল বসাক (১৯৩৯–), বাসুদেব দাশগুপ্ত (১৯৩৯ - ২০০৫) এবং সুভাষ ঘোষ (১৯৩৯ –)। এঁদের মধ্যে সর্ব প্রথম হাংরি আন্দোলনে যোগ দেন সুবিমল বসাক। গল্প ছাড়া মাঝে মাঝে তাঁর দু-একটি কবিতা হাংরি জেনারেশন পত্রিকাতে এবং ইশতিহারে প্রকাশ পায়। তাঁর মতে "ইররাশনাল অথচ বুদ্ধিদীপ্ত, মগজ হাতে নিয়ে কাগজে নেমে আসাই হাংরি বৈশিষ্ট্য।"[৮৯] হাংরি আন্দোলন সাহিত্যের-আন্দোলন। প্রথম অবস্থায় কবিতা, ধর্ম, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ে ম্যানিফেস্টো প্রকাশ পেলেও এ যে সাহিত্য কেন্দ্রিক আন্দোলন সে-কথা বলার অবকাশ রাখে না।

সুবিমল বসাকের মতে হাংরি আন্দোলন বাংলা সাহিত্যকে অনেকটা এগিয়ে নিয়ে গেছে। হাংরি লেখাকে অশ্লীল আখ্যা দেওয়া, এঁদেরকে নিয়ে আইন, মামলা-মকদ্দমা, স্কাণ্ডালাইজ, ইত্যাদি কত সব কাণ্ড করার পরও হাংরি লেখক ও লেখা নতুন জেনারেশনের কাছে অতিরিক্ত পাওনা। তাই হাংরি আন্দোলনের ইতিহাস ও সাহিত্যচর্চা নিয়ে গবেষণা হচ্ছে ক্ষুদ্র পত্র-পত্রিকা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশ্বজ্ঞানে।

হাংরি জেনারেশনের যে নিষিদ্ধ সংখ্যাটিতে কলকাতার কয়েকজন যুবক কবিতা-সাহিত্যে পালাবদলের নব ধারা রচনায় সক্ষম হলেন সেই সংখ্যায় সুবিমল বসাকের 'ক্রোধ' নামে একটি কবিতা প্রকাশ পায়। তিনি লিখেছেন—

"ছিড়ে ফেলো একটানে সাড়ি সায়া ব্লাউজ বডিস, ফালা ফালা করে,
ন্যাংটো করে উপড়ে ফেলো ওর চোখ জোড়া, বিকৃত করে দাও
সুন্দর মুখখানা,
গায়ের চামড়া ছিঁড়ে ছিটিয়ে দাও নুন, দাগে,
পরিশেষে লিঙ্গের ক্রমাগত আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে
দাও ওর ঐ যোনি,"[৯০]

একটানা গল্পের মতো তাঁর কবিতা সমাপ্তিতে এসে পৌঁছয়। কিন্তু প্রকাশ পায় ক্ষুধা। শারীরিক ক্ষুধা এবং কবিতা রচনার ক্ষুধা। তাই রূপসী-যুবতী মেয়েটিকে উপভোগ করতে করতে আঘাত দ্বারা তার সৌন্দর্য নষ্ট করলেই সেই নারী হবে সৃষ্টি- কারিণী। তেমনি কবিতা রচনা করতে গেলে মনের মধ্যে ক্রোধ সৃষ্টি করতে পারলেই নতুন নতুন কবিতা প্রসব করা সম্ভব। প্রচলিত পথ থেকে দূরে সরে কবিতার বৃষ্টি করতে উৎসাহী সুবিমল বসাক। হাংরি কবিরা নতুনের সন্ধানী এবং সেই নতুনত্বে আছে শব্দের শরীরে আঘাত করা। অশ্লীলতা, যৌনতা, ক্রোধ ইত্যাদি মিশিয়ে হাংরি শরিকরা কবিতা রচনায় নিমগ্ন হন। সুবিমল বসাক তার ব্যতিক্রম নন।

হাংরি আন্দোলনের সবচেয়ে সক্রিয় ও বিশ্বাসী যুবকদের মধ্যে সুবিমল বসাক অন্যতম। পূর্ব পুরুষের বাস্তুভিটা হারানোর ব্যথা হৃদয়ে বহন করে সত্যসন্ধানী হয়ে ওঠেন তিনি। তাঁর গল্পে স্থান পেয়েছে অন্তরের ব্যথা, বাস্তব অভিজ্ঞতা ইত্যাদি। অনেক স্মৃতির রোমন্থন ঘটেছে সুবিমল বসাকের গল্পে। তাঁর গল্পের আঙ্গিক ও ভাষাবয়ন হাংরি আন্দোলনের মতাদর্শে পালাবদলকারী হিসেবে আদর্শ হয়ে ওঠে। লক্ষ্য করা যায়— আঞ্চলিক শব্দে গল্পলেখার প্রচলন। বেশিরভাগ রচনায় গল্পের নায়ক কথক নিজেই। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ- 'ছাতামাখা', 'অযথা খিটক্যাল' ইত্যাদি।

সুবিমল বসাকের গল্প পড়লেই লক্ষ্য করা যায় একটি স্বতন্ত্র ভাষা। এই ভাষায় তখনও পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে কিছুই লেখা হয়নি। তাঁর গল্পে ব্যবহৃত আঞ্চলিক ভাষা সাধারণ পাঠকের বোধগম্যের বাইরে ছিল। তাই সুবিমল বসাক গল্পের জগতে পালাবদলের রূপকার হলেও পরিচিতি পাননি। তিনি কেমন গল্প লিখতেন তার খানিক অংশ উদ্ধৃতি করা যাক— "বুকের উপর হাত রাইখ্যা নিজেরে চিন্তা করি। আমি আছি— এই কথা ভাবনের লগে লগে গাওগতর ঝাড়া দিয়া উঠি। কোঠা থিক্যা সরাসরি বাইরাইয়া পড়ি। কই যামু কুনহানে যামু কার কাছে কেলিগা বাইরইলাম— কিছু আর ঠাউর করতে পারি না। কানের পাশটায় গমগম আওয়াজ শুনতে পাই, ক্যাটা য্যান কয়— বারইয়া পড়। বারইয়া পড়।"[৯১]

হাংরি গল্প লেখক হিসেবে বাসুদেব দাশগুপ্ত এবং সুভাষ ঘোষ দু'জনই পরিচিত নাম। বাসুদেব দাশগুপ্তর— 'বন্ধনশালা' এবং সুভাষ ঘোষের— 'আমার চাবি' ও 'যুদ্ধে আমার তৃতীয় ফ্রণ্ট' অন্যতম। এঁরা দু'জন হাংরি আন্দোলনে যোগদান করেন নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠান বিরোধী লেখক আখ্যা দিয়ে। এঁদের দু'জনেরই লেখা প্রকাশ পেয়েছে হাংরি জেনারেশনের

নিষিদ্ধ সংখ্যায়। বাসুদের দাশগুপ্তর 'বাসুদেবের ডায়েরী' এবং সুভাষ ঘোষের 'হাঁসেদের প্রতি' রচনা দুটি প্রকাশ পায় উক্ত সংখ্যায়। হাংরি জেনারেশনে-র নিষিদ্ধ সংখ্যাটিতে লেখার ফলে ছয়জন কবি ও প্রকাশককে অ্যারেস্ট করলেও ওই দুজন রচয়িতা কারারুদ্ধ হলেন না। তাঁরা হাংরি আন্দোলনের শরিক নন বলে মুচলেকাও দিলেন।

'ক্ষুধার্ত খবর' পত্রিকার এক সাক্ষাৎকারে সুভাষ ঘোষ জানাচ্ছেন— "প্রতিষ্ঠান বিরোধীতা আমাদের কোনো আলগা ব্যাপার ছিল না। আমাদের কাছে খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। সুভাষ ঘোষ 'প্রতিষ্ঠান-বিরোধী লেখক' অ্যাজ সাচ্ নয়, সুভাষ ঘোষ 'হাংরি জেনারেশনের একজন গদ্যকার', এটাই আমার পরিচয়। হাংরি জেনারেশনের কনসেপ্টের মধ্যেই এটা ছিল। প্রতিষ্ঠান বিরোধীতা, অ্যান্টি পেট্রিয়ার্কি, অ্যান্টি হায়ারার্কির কনসেপ্টস্ ছিলই।"[৯২] বাসুদেব দাশগুপ্ত লেখেন— "আমার ক্ষুধা ছিল মানুষের সার্বিক মুক্তির ক্ষুধা— সেই স্বাধীনতার রাজ্য যেখানে আমরা পৌঁছতে চাই।"[৯৩]

তবে একথা ঠিক যে হাংরি আন্দোলনের দুই গদ্য লেখক তেমন প্রচার পাননি। এর মূলে ছিল অন্তর্দ্বন্দ্ব, স্বার্থসিদ্ধি, পুলিশি ভয়, বাঁচার তাগিদ, প্রচারের চিন্তা, অস্তিত্বের লড়াই, ইগো, হিংসা, ইত্যাদি। নইলে বাসুদেব দাশগুপ্ত এবং সুভাষ ঘোষের যে মেধা ছিল তাতে এঁরা একজন শক্তিশালী লেখক হিসেবে বাংলা সাহিত্যে স্থান করে নিতে পারতেন। সেই মেধার পরিচয় মেলে তাঁদের গল্পগাথায়। অসাধারণ এক-একটি গল্প। পালাবদলের যথাযথ নিদর্শন। আঙ্গিকগত, ভাষাগত, ভাবগত, ছন্দগত, সমস্ত কিছুতেই কথনের প্রয়াস নতুনত্বের সন্ধান দেয়। গল্পের পালাবদলের পৃষ্ঠভূমিতে বাসুদেব দাশগুপ্ত এবং সুভাষ ঘোষ ইতিহাস পুরুষ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবেন।

হাংরি আন্দোলন যেহেতু কবিতা ভিত্তিক তাই গল্প কিংবা চিত্র এখানে ততোটা দাবিদার হয়ে দাঁড়াতে পারে না। কিন্তু এঁদের চিত্রে-গল্পে চিৎকারের সুর প্রাতিষ্ঠানিক বাবুদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। দুই গল্পকারের চিৎকারের কন্ঠ সামান্য উপস্থাপন যোগ্য। বাসুদেব তাঁর গল্পে বর্ণনা করছেন— "বনের ধারে ভেড়ার বাচ্চাটাকে একা একা অসহায় ভাবে ঘুরে বেড়াতে দেখে তখনি আমি সেটাকে খপ করে ধরে ফেললুম। আমি বাঁ হাতে ওর পশমী নরমগরম শরীরটাকে ভাল করে পাকড়ে ধরে ডান হাত দিয়ে ওর ঘাড়টা মুচড়ে দিলুম ওকে একটা আওয়াজ করবার বিন্দুমাত্র সুযোগ না দিয়েই। আমার মোচড়ের সঙ্গে সঙ্গে ওর ঘাড়ের কাছের ছোট ছোট কচি কচি হাড়গুলো ভেঙে যাবার শব্দ শুনতে পাই— মুট মুট মুড় মুড় ; আর সেই সঙ্গে খানিকটা রক্ত ছিটকে এসে লাগে আমার মুখে, ঠোঁটে, নাকের ডগায়।"[৯৪] বর্ণিত অংশে চিত্রিত হচ্ছে একটি হিংস্র ছবি। নিজের সুখের জন্য একটি কচি ছাগ-শিশুকে ঘাড় মটকে প্রাণনাশ করা স্বাভাবিক সাংসারিক মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আসলে হিংস্রতার বার্তা একজন ক্ষুধার্ত লেখকের সুখের, উদরের ক্ষুধারই বহুবিধ সংজ্ঞা উপস্থাপন করে। এই সমস্ত রচনায় চিনে নেওয়া যায় একজন হাংরি গল্প লেখককে।

সুভাষ ঘোষের গল্পের মধ্যে রয়েছে চিৎকার। তাঁর গল্প চিৎকার সংযোজনেরই গল্প। গল্পের বিষয় মানুষের কালো হৃদয়কে সত্য কথনে লিপ্যমান করার অধুনান্তিকতা। যন্ত্রণার ছবি

চিত্রিত করছেন সুভাষ ঘোষ ঃ "কোন শনি ও রবিতে ক্যানিং যাই, কথা হয়, মাছের ব্যাপারী, ফড়ে ও চালানদার, সামুদ্রিক মাছের দরদাম চলে, কালোবাজারের গুপ্তযন্ত্র এখানে আবিষ্কার হয়— আবিষ্কার হয় ঠাণ্ডা ঘর, ইলেকট্রনিক ওয়েভ পাঠিয়ে আবিষ্কার— লালবাজার স্টংরুম, হাতের ডায়েগ্রাম, পায়ের ডায়েগ্রাম, চোখের ডায়েগ্রাম দেখি— কে আমার ভুল বুকের ছবি গোপন পায়ে তুলে নিয়ে গেছে।"[৯৫] দালাল এবং কালোবাজারীতে যে দেশ ভরে গেছে তারই গল্প বর্ণিত হয়েছে সুভাষ ঘোষের পাঠবস্তুটিতে। কিন্তু গল্পে চিত্রিত দালাল এবং কালোকারবারী প্রাতিষ্ঠানিক সাহিত্য গোষ্ঠদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন তিনি। যা তাঁর সহ্যাতীত। হাংরি আন্দোলনকারী হিসেবে সাহিত্যে নান্দনিক দুর্গিবাজী যে সুভাষ ঘোষের হৃদয়ে জায়গা পাবে না, তা অবশ্যই স্বাভাবিক। আধুনিকতাকে নস্যাৎ করে উত্তর-আধুনিকতার বীজ বপিত হয়েছে সুভাষ ঘোষের হাংরি আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে লিখিত গল্পগুলোতে।

দেবেশ রায় ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে 'ক্ষুধার্ত' পত্রিকায় হাংরি আন্দোলনকারীদের লেখা সম্পর্কে বলেছেন— "অপরাধবোধ আমার প্রবল হয়ে ওঠে যখন বুঝতে পারি পুলিশ তার দৃষ্টি থেকে সেদিন চিনতে ভুল করেনি। পুলিশ ঠিকই বুঝেছিল, এই লেখাগুলি নৈরাজ্যিক, শব্দের দ্বারা সাজানো সমাজকেও এরা অস্বীকার করছে, ফিরে যেতে চাইছে শব্দের আদিতে— যেখানে শুধুমাত্র একটি স্থূল অর্থেই শব্দ ব্যবহৃত হতে থাকে আর তাই পরোক্ষভাবে বিদ্রোহ ঘোষণা শব্দের তথাকথিত সামাজিক ব্যবহারের বিরুদ্ধেই।"[৯৬] তারপরই লেখেন— "আমরা বুঝতে পারিনি স্বাধীনতার পর প্রায় দুই দশকব্যাপী বঞ্চনা আর মূঢ়তার বিরুদ্ধে অধৈর্যে অস্থির এই লেখাগুলো আঘাত করতে চাইছে এই পুঁজি-সমাজের গায়ে-ভিতে। বুঝতে পারিনি যে-সত্যকথন কথাশিল্পের একমাত্র মাপকাঠি, সেই সত্যকথনের তাড়না এই লেখাগুলোর অক্ষর-বিন্যাস।"[৯৭] হাংরি আন্দোলনকারীদের লেখা নিয়ে যথাযথ মূল্যায়নের চেষ্টা হয়নি। দেবেশ রায়-ই প্রথম সমালোচক যিনি হাংরি সাহিত্য রচনাকারীদের লেখার মানকে যোগ্য দৃষ্টিতে মাপার প্রয়াসী হয়েছিলেন। এবং আজ আমরা লক্ষ্য করছি এঁদের রচনার বহুধা চিন্তাতত্ত্ব, যা বর্তমান উচ্চমানের লেখার পূর্বাভাস হিসেবে বিবেচিত হয়।

শঙ্খ ঘোষ ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দের 'দেশ' পত্রিকায় হাংরি লেখকদের রচনা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তার উর্ধ্বে আর বলার থাকে না। তিনি লিখেছেন— "তাঁরা শুধু কবিতার সুরই পাল্টাতে চাননি ; বাঙালি মধ্যবিত্ত জীবনের বাঁধাধরা সুরটিকেও বদলাতে চেয়েছিলেন। মাপা জীবনের ছক থেকে এক ধরনের বহেমিয়ানিজমে বেরিয়ে আসার উন্মাদনায় চঞ্চল হয়ে উঠেছিল তাঁরা। এই গোষ্ঠীর তাঁরা নিজেরাই নাম দিয়েছিলেন হাংরি জেনারেশন। কিসের ক্ষুধা ? কেনই বা ভবঘুরেপনা ? হয়তো এর পিছনে যৌবনের কিছু চমক ছিল, কিন্তু অন্তরালে ছিল বেঁচে থাকার তীব্র আবেগ আর নতুন কিছু সৃষ্টি করার অস্থিরতা। সেই বয়সের মানসিকতায় কিছু কিছু বাড়তি ব্যাপার থেকে থাকলেও এঁরা সকলেই ছিলেন প্রতিভাধর ; এঁদের ভেতরেই ছিল কবিতা। উচ্চশিক্ষিত এইসব যুবকেরা বিদ্রোহ করতে চেয়েছিলেন প্রথা ও প্রথাবদ্ধতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কিন্তু এঁদের সত্তাকে হরণ করতে পারেনি ; শুধু অপচয়ে নষ্ট হয়ে যায়নি তাঁরা। জীবন ছন্দে মাতাল হলেও কবিতার ছন্দে ছিলেন হিসেবি, সতর্ক লক্ষভেদী।"[৯৮]

আমরা হাংরি কবি-সাহিত্যিকদের সহজেই চিনে নিতে পারি তাঁদের রচিত সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য ও দর্শনকে মস্তিষ্কে সাজিয়ে রেখে। সহজেই চিনিয়ে দেয় তাঁদের ভাষা, বর্ণনা ও বিষয় নির্বাচন। জীবন এবং জীবনের অভিজ্ঞতা যদি সাহিত্য হয়, তাহলে হাংরি আন্দোলনের শরিকরা স্পষ্টভাবে পর্দার আড়াল সরিয়ে খুল্লমখুল্লা তাঁদের চিন্তা কাব্য-সাহিত্যে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন। তাই তাঁরা স্বস্থানেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিচরণ করবেন এই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

উল্লেখপঞ্জি

১. রায়চৌধুরী মলয়, 'হাংরি আন্দোলনের ইশতাহার', প্রকাশক ঃ আবার এসেছি ফিরে, কানাপুকুর, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ-৭৪২১৩৫, প্রথম প্রকাশ ঃ বসন্ত ১৪১৪, পৃষ্ঠা-১৯
২. দাশ উত্তম, 'হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন', প্রকাশক ঃ মহাদিগন্ত, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা-৭৪৩৩০২, দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ২০০২ (লেখকের নিবেদন অংশ)
৩. দাশ উত্তম, 'হাংরি জেনারেশন ঃ একটি সমীক্ষা', হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, তদেব, পৃষ্ঠা-৪৬
৪. রায়চৌধুরী মলয়, 'মলয় রায়চৌধুরীর হাংরি সাক্ষাৎকারমালা', সম্পাদক ঃ অজিত রায়, প্রকাশক ঃ ময়ূখ দাশ, মহাদিগন্ত, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, প্রথম প্রকাশ ঃ এপ্রিল ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১১
৫. দে কুমার বিষ্ণু, 'ক্ষুধার্ত মলয় ও আমার অসীমাংসিত শুভা', স্বপ্ন, সম্পাদক ঃ কুমার বিষ্ণু দে, লামডিং, শরৎ সংখ্যা, বর্ষ ১৫, সংখ্যা-১, ২০০৮ ইংরেজি, পৃষ্ঠা-৬৩, ৬৪
৬. মুখোপাধ্যায় তরুণ, 'কবিতাতন্ত্র ও মলয় রায়চৌধুরী', স্বপ্ন, সম্পাদক ঃ কুমার বিষ্ণু দে, তদেব, পৃষ্ঠা-২৭
৭. রায়চৌধুরী মলয়, 'ধোলাই' শয়তানের মুখ, মলয় রায়চৌধুরীর কবিতা ২০০৪-১৯৬১, আবিষ্কার প্রকাশনী, কলকাতা-৭০, প্রথম প্রকাশ ঃ মার্চ ২০০৫, পৃষ্ঠা-২১৭
৮. সেন বিশ্বজিৎ, 'মলয় রায়চৌধুরীর কবিতা', কবিতীর্থ, সম্পাদক ঃ উৎপল ভট্টাচার্য, তদেব, পৃষ্ঠা-১৬৩
৯. রায়চৌধুরী মলয়, 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার' অ, কবিতা পাক্ষিক, ৩৬ বি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-২৬, প্রথম প্রকাশ ঃ বইমেলা ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-২৬
১০. তদেব, পৃষ্ঠা-২৬
১১. তদেব, পৃষ্ঠা-২৬
১২. তদেব, পৃষ্ঠা-২৭
১৩. তদেব, পৃষ্ঠা-২৭
১৪. তদেব, পৃষ্ঠা-২৪-২৫
১৫. দাশ উত্তম, 'হাংরি জেনারেশন ঃ একটি সমীক্ষা', 'হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন', তদেব, পৃষ্ঠা-৪৭
১৬. রায়চৌধুরী মলয়, 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার', কবিতা সংকলন, মলয় রায়চৌধুরীর কবিতা ২০০৪-১৯৬১, তদেব, পৃষ্ঠা-১৮৭
১৭. তদেব, পৃষ্ঠা-১৮৭
১৮. চৌধুরী শীতল, 'অনুভবের দর্পণে ঃ প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার', তদেব, পৃষ্ঠা-৩৩

১৯. রায়চৌধুরী মলয়, 'প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার', মলয় রায়চৌধুরীর কবিতা ২০০৪-১৯৬১, তদেব, পৃষ্ঠা-১৮৮
২০. তদেব, পৃষ্ঠা-১৮৮
২১. চৌধুরী শীতল, 'অনুভবের দর্পণে ঃ প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ছুতার', তদেব, পৃষ্ঠা-৩৪
২২. রায়চৌধুরী মলয়, 'হাংরি কিংবদন্তী', প্রকাশক ঃ সমীর রায়চৌধুরী, দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ঃ জুলাই ১৯৯৪, পৃষ্ঠা-৭৯
২৩. রায় অজিত, 'মলয় রায়চৌধুরীর হাংরি সাক্ষাৎকারমালা', প্রকাশক ঃ ময়ূখ দাশ, মহাদিগন্ত, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, প্রথম প্রকাশ ঃ বৈশাখ ১৪০৬, এপ্রিল ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-১০৪
২৪. মিশ্র ড০ অশোককুমার ঃ 'আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রকাশ ঃ কলকাতা পুস্তকমেলা, জানুয়ারি ২০০২, পৃষ্ঠা-৩১৮
২৫. ব্রহ্ম শংকর, 'সাহিত্যের বিশিষ্ট আন্দোলন হাংরি জেনারেশন', কবিতা, সম্পাদক ঃ শংকর ব্রহ্ম, ৪/৮১, বিদ্যাসাগর কলনি, কলকাতা-৪৭, ২৬ সংকলন ১৯৮৯, পৃষ্ঠা-৯
২৬. চট্টোপাধ্যায় শক্তি, 'কবিতা বিষয়ক প্রস্তাব', হাংরি বুলেটিন, ৩য় সংখ্যা ১৩৬৯
২৭. রায়চৌধুরী মলয়, 'হাংরি কিংবদন্তী', তদেব, পৃষ্ঠা-২৯
২৮. তদেব, পৃষ্ঠা-৩০
২৯. চট্টোপাধ্যায় শক্তি, 'সীমান্ত প্রস্তাব ১-মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি নিবেদন', স্বপ্ন, সম্পাদক ঃ কুমার বিষ্ণু দে, হরুলংপার কলনি, লামডিং, আসাম-৭৮২৪৪৭, ২০০৭ বর্ষ ১৪ সংখ্যা ১, পৃষ্ঠা-১
৩০. তদেব, পৃষ্ঠা-২
৩১. দাশ উত্তম, 'হাংরি জেনারেশন ঃ একটি সমীক্ষা' 'হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন', পৃষ্ঠা-১১
৩২. রায়চৌধুরী মলয়, 'হাংরি কিংবদন্তী', তদেব, পৃষ্ঠা-২৯
৩৩. চৌধুরী প্রদীপ, 'ফিনাইলের ককটেল', চর্মরোগ, হাংরি জেনারেশন রচনা সংকলন, সম্পাদক ঃ সমীর চৌধুরী, কথা ও কাহিনী, বুকসেলার্স প্রাঃ লিঃ, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রকাশ ঃ এপ্রিল ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-১৯১
৩৪. রায়চৌধুরী মলয়, 'প্রদীপ চৌধুরীর কবিতা', একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যে স্থাপিত ভালবাসা মৃত্যু অমৃত জীবন, প্রকাশক ঃ প্রদীপ চৌধুরী, বিকল্প সাহিত্য, ৭৩ রিজেন্ট এস্টেট, কলকাতা-৯২, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা-১৭৯
৩৫. চৌধুরী প্রদীপ, 'চর্মরোগ', হাংরি জেনারেশন রচনা সংকলন, তদেব, পৃষ্ঠা-১৯০
৩৬. ঘোষ শৈলেশ্বর, 'প্রদীপের চর্মরোগ', একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যে স্থাপিত ভালবাসা মৃত্যু অমৃত জীবন, তদেব, পৃষ্ঠা-১৭৫
৩৭. মাইতি জয়দীপ, 'সৃষ্টির অনন্ত গহ্বরে একা', তদেব, পৃষ্ঠা-১৬৫
৩৮. চৌধুরী প্রদীপ ঃ 'অন্যান্য তৎপরতা ও আমি', হাংরি জেনারেশন রচনা সংকলন, তদেব, পৃষ্ঠা-১৮৭
৩৯. তদেব, পৃষ্ঠা-১৮৭
৪০. তদেব, পৃষ্ঠা-১৮৮
৪১. তদেব, পৃষ্ঠা-১৮৯
৪২. চৌধুরী প্রদীপ, 'বাবা আমার বর্বরতা', হাংরি জেনারেশন, প্রকাশক ঃ সমীর রায়চৌধুরী, ৪৮-এ শংকর হালদার লেন, আহিরিটোলা, কলকাতা, প্রকাশ ঃ ১৯৬৪
৪৩. রায়চৌধুরী মলয়, 'প্রদীপ চৌধুরীর কবিতা', একই তরঙ্গদৈর্ঘ্যে স্থাপিত ভালবাসা মৃত্যু অমৃত জীবন, তদেব, পৃষ্ঠা-১৭৯-১৮০

৪৪. বন্দ্যোপাধ্যায় অলোক, 'মানবিক সম্পর্কের কবিতা', প্রসঙ্গ ঃ দেবী রায়, সম্পাদনা ঃ স্বরাজ সেনগুপ্ত, রেনেসাঁস, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, দ্বিতীয় তল, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ঃ কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারি ২০০৪, পৃষ্ঠা-১১৭
৪৫. রায় দেবী, 'আমি ও কলকাতা', মানুষ মানুষ, প্রকাশক ঃ অশোক দে, উলুবেড়িয়া, হাওড়া, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৭১, পৃষ্ঠা-২
৪৬. তদেব, পৃষ্ঠা-২
৪৭. তদেব, পৃষ্ঠা-২
৪৮. সরকার সুজিত, 'দেবী রায় ও তাঁর কবিতা', প্রসঙ্গ ঃ দেবী রায়, তদেব, পৃষ্ঠা-৮৯
৪৯. রায় দেবী, 'সার্চ', হাংরি জেনারেশন, তদেব।
৫০. দাশ উত্তম, 'হাংরি জেনারেশন ঃ একটি সমীক্ষা' 'হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন', তদেব, পৃষ্ঠা-২৬
৫১. বসু উৎপলকুমার, 'পোপের সমাধি', হাওয়া ৪৯, সম্পাদনা ঃ সমীর রায়চৌধুরী, বি ২৪ ব্রহ্মপুর নর্দার্ন পার্ক, কলকাতা-৭০, বইমেলা ২০০৬, পৃষ্ঠা-১১
৫২. বসু উৎপলকুমার, 'পোপের সমাধি', তদেব, পৃষ্ঠা-১১
৫৩. বসু উৎপলকুমার, 'কুসংস্কার', হাংরি জেনারেশন, তদেব।
৫৪. রায়চৌধুরী মলয়, 'শৈলেশ্বর ঘোষের কবিতা', কারুবাসনা, সম্পাদক ঃ সব্যসাচী সেন, ৫১/২৩ দমদম রোড, বর্ষা এ্যাপার্টমেন্ট, বক্স নং-২ (হরকালী কলনি), কলকাতা-৭৪, প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, ২০০৮, পৃষ্ঠা-২৩
৫৫. ঘোষ শৈলেশ্বর, 'হাংরি জেনারেশন আন্দোলন', ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, এ/৮ লেকভিউ পার্ক, কলকাতা-৩৫, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৫, পৃষ্ঠা-১
৫৬. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৩
৫৭. ঘোষ শৈলেশ্বর, 'ঘোড়ার সঙ্গে ভৌতিক কথাবার্তা', হাংরি জেনারেশন রচনা সংকলন, তদেব, পৃষ্ঠা-৩৬৯
৫৮. তদেব, পৃষ্ঠা–৩৬৭
৫৯. চৌধুরী সমীর, 'হাংরি জেনারেশন রচনা সংকলন' (ভূমিকা), তদেব, পৃষ্ঠা-উনিশ।
৬০. ঘোষ শৈলেশ্বর , 'জনবিরল স্বপ্নে', হাংরি জেনারেশন, তদেব।
৬১. রায়চৌধুরী মলয়, 'শৈলেশ্বর ঘোষের কবিতা', তদেব, পৃষ্ঠা-২৬
৬২. ঘোষ শঙ্খ, 'শব্দ আর সত্য', প্যাপিরাস, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা-৪, তৃতীয় মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৯, পৃষ্ঠা-৩৬
৬৩. রায়চৌধুরী মলয়, 'শৈলেশ্বর ঘোষের কবিতা', পৃষ্ঠা-২৭
৬৪. রায়চৌধুরী মলয়, 'হাংরি কবিতার মূল্যায়ন প্রচেষ্টা', কৌরব, সম্পাদক ঃ সুদেষ্ণা মজুমদার, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৮৪, পৃষ্ঠা-৬৯
৬৫. তদেব, পৃষ্ঠা-৭৫-৭৬
৬৬. আচার্য সুবো, 'নপুংসক একটি', হাংরি জেনারেশন, তদেব।
৬৭. আচার্য সুবো, 'নিজস্ব বিস্ফোরণ', হাংরি জেনারেশন রচনা সংকলন, তদেব, পৃষ্ঠা-১০৬-১০৭
৬৮. আচার্য সুবো , 'প্রতিদ্বন্দ্বীরা', হাংরি জেনারেশন (Vol-II /No-III) সম্পাদক ঃ মলয় রায়চৌধুরী, দরিয়াপুর, পাটনা-৪
৬৯. রায় ফালগুনী ঃ 'একজন অশিক্ষিত ও তিনজন হাংরি গদ্যকার', ফালগুনী রায় সমগ্র সম্পাদক ঃ সমীর রায়চৌধুরী, হাওয়া ৪৯, ২৪ বি, ব্রহ্মপুর নর্দার্ন পার্ক, বাঁশদ্রোনী, কলকাতা-৭০, প্রথম প্রকাশ ঃ বইমেলা ১৯৯৮, পৃষ্ঠা-৫৫

৭০. ভট্টোচার্য তপোধীর, 'ফালগুনী রায়ের প্রত্যাবর্তন : তাঁর দ্রোহ, তাঁর কবিতা', কবিতার রূপান্তর, সাহিত্যলোক, ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ২০০৩, পৃষ্ঠা-৪৩৬

৭১. রায় ফালগুনী, 'ক্রিয়াপদের কাছে ফিরে আসছি', ফালগুনী রায় সমগ্র, তদেব, পৃষ্ঠা-১০

৭২. রায় ফালগুনী, 'ব্যক্তিগত বিছানা', ফালগুনী রায় সমগ্র, তদেব, পৃষ্ঠা-১০

৭৩. রায় ফালগুনী, '০৯৮৭৬৫৪৩২১', ফালগুনী রায় সমগ্র, তদেব, পৃষ্ঠা-১২

৭৪. রায় ফালগুনী, 'নির্বিকার চার্মিনার', ফালগুনী রায় সমগ্র, তদেব, পৃষ্ঠা-১৪

৭৫. রায় ফালগুনী, 'মানুষের সঙ্গে কোন বিরোধ নেই', ফালগুনী রায় সমগ্র, তদেব, পৃষ্ঠা-২২

৭৬. রায়চৌধুরী মলয়, 'অপর রায়রাঞ্জা', ফালগুনী রায় সমগ্র, তদেব, পৃষ্ঠা-৯৪

৭৭. ভট্টাচার্য তপোধীর : 'ফালগুনী রায়ের প্রত্যাবর্তন : তাঁর দ্রোহ, তাঁর কবিতা', তদেব, পৃষ্ঠা-৪৪১

৭৮. মিত্র আলো, ইয়েতি, 'প্রতিদ্বন্দ্বী', সম্পাদক ও প্রকাশক : সুবিমল বসাক, ১৩ বিপিন গাঙ্গুলী রোড, কলকাতা-৩০, ৩য় সংকলন ১৯৬৮

৭৯. তদেব।

৮০. মিত্র ত্রিদিব, 'ফোকর', হাংরি জেনারেশন (Vol-II /No-III), সম্পাদক : মলয় রায়চৌধুরী, দরিয়াপুর, পাটনা-

৮১. সিরাজ সৈয়দ মুস্তাফা , 'ঈশ্বর' , পদ্যগদ্য সংবাদ, সম্পাদক : সুমিতাভ ঘোষাল, কলকাতা, অক্টোবর ১৯৮৬, পৃষ্ঠা-২১

৮২. চট্টোপাধ্যায় রামানন্দ : 'মাঝরাতে বিপন্নতা', হাংরি জেনারেশন, তদেব।

৮৩. মজুমদার বিনয়, 'হাংরি থেকে বিনয়ের আলাদা হবার লিফলেট : ১৯৬৪', তদেব, পৃষ্ঠা-২৬

৮৪. মজুমদার বিনয়, 'কবিতা', গদ্যপদ্য সংবাদ, তদেব, পৃষ্ঠা-১৪

৮৫. চট্টোপাধ্যায় সন্দীপন, 'আমার বউ আমাকে জেলে যেতে বারণ করেছিল', পদ্যগদ্য সংবাদ, তদেব ,পৃষ্ঠা-৮

৮৬. তদেব , পৃষ্ঠা-৮

৮৭. বায়চৌধুরী মলয় , 'হাংরি, অ্যাংরি, বিট : প্রতিসন্দর্ভের বৈভিন্ন্য', হাওয়া ৪৯, তদেব ,পৃষ্ঠা-৯০

৮৮. রায়চৌধুরী মলয়, 'অনিল করঞ্জাই ও পোস্টমডার্ন পেইনটিং', হাওয়া ৪৯, তদেব ,পৃষ্ঠা-১৪

৮৯. রায়চৌধুরী মলয়, 'হাংরি অ্যাংরি, বিট : প্রতিসন্দর্ভের বৈভিন্ন্য' হাওয়া ৪৯, তদেব, পৃষ্ঠা-৯১

৯০. বসাক সুবিমল, 'ক্রোধ' , হাংরি জেনারেশন, তদেব।

৯১. সুবিমল বসাক, 'ছাতামাথা', হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন, তদেব, পৃষ্ঠা-৫২

৯২. বন্দ্যোপাধ্যায় উজ্জ্বল : 'সুভাষ ঘোষের সাক্ষাৎকার', ক্ষুধার্ত খবর, সম্পাদক : সুভাষ ঘোষ, কলকাতা, ৪র্থ সংকলন, প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৬।

৯৩. রায়চৌধুরী মলয়, 'হাংরি, অ্যাংরি, বিট : প্রতিসন্দর্ভের বৈভিন্ন্য', হাওয়া ৪৯, তদেব, পৃষ্ঠা-৯১

৯৪. দাশগুপ্ত বাসুদেব, 'রন্ধনশালা', হাংরি জেনারেশন রচনা সংকলন, তদেব , পৃষ্ঠা-৯

৯৫. ঘোষ সুভাষ, 'যুদ্ধে আমার তৃতীয় ফ্রন্ট', হাংরি জেনারেশন রচনা সংকলন, তদেব, পৃষ্ঠা-১৪০

৯৬. রায় দেবেশ : 'বিলম্বিত সওয়াল', হাংরি জেনারেশন রচনা সংকলন, তদেব , পৃষ্ঠা-ছয়

৯৭. তদেব , পৃষ্ঠা-ছয়

৯৮. চৌধুরী সমীর, সম্পাদিত 'হাংরি জেনারেশন রচনা সংকলন' তদেব , (চতুর্থ মলাট)। □

উপসংহার

চিন্তার দৃঢ় ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে মলয় রায়চৌধুরী সাহিত্যে পালাবদলের গর্জন গাঢ় করে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন নন্দনতত্ত্বের মর্মরে সাহিত্য-কানন। বিভিন্ন তথ্য ও সত্য আলোচনা তার আগুনধরা বার্তা। বুদ্ধিজীবী সমাজ তখন হাংরি আন্দোলন নামক নতুন চিন্তার দিগন্তে হারিয়ে গিয়ে বেসুরো হয়ে আন্দোলনকারীদেরকে দেখে নেবার যে প্রয়াস চালিয়েছিলেন, তার ফলে হাংরি আন্দোলন হয়ে ওঠে আরও প্রচারমুখী। সেই প্রচারে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে পালাবদলের চিন্তামানসে হাংরির কবি-লেখকরা মেধাকে শানিয়ে নিলেন। নান্দনিকতার বেড়াজালকে ভেঙে ঢুকে পড়লেন নতুন নতুন মসি-চিন্তায়। নব-প্রজন্ম সেই স্রোতে ভেসে যেতে যেতে বাংলার বাইরেও তার প্রতিপত্তি বিস্তার করে ফেলল। কিন্তু তবুও সাহিত্যের অগ্রগণ্যরা নতুনকে অস্বীকার করতে নারাজ। তাই নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়ে যায়। প্রবীণের কূট-মস্তিষ্কের মেধা নবীনদেরকে সাময়িক স্তব্ধ করে দিলেও নদীর স্রোতের মতো বাঁধ ভেঙে এক সময় দুকূল ভাসিয়ে দেয় তাঁরা। প্রকৃতির নিয়মকে অবজ্ঞা করলে তার পরিণতি ভয়ঙ্কর রূপ লাভ করে। প্রবীণ নবীনকে ইচ্ছাকৃত তার জায়গা ছেড়ে দিলে কোনো বাধা সৃষ্টি হয় না। এভাবেই এক সময় সকল কিছুকে উপেক্ষা করার ফলে জন্ম নেয় আন্দোলনের। সম্ভবত হাংরি আন্দোলন সেভাবেই তার পূর্ণতা লাভ করে।

বাংলা সাহিত্যে বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে জোরে ধাক্কা দিয়ে যে প্রক্রিয়ার প্রচলন চলল তার নাম হাংরি আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রধান নায়ক মলয় রায়চৌধুরী। সাধারণ লিফলেটের মাধ্যমে পৃথিবী কাঁপানো সাহিত্যিক আন্দোলন করা যায় সেটা হাংরি আন্দোলন প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে। কেননা এই আন্দোলনের যিনি স্রষ্টা তিনি বহু পড়ুয়া এবং মেধারী। যা আমরা আমাদের গবেষণা সন্দর্ভে উপস্থাপন করতে প্রয়াসী হয়েছি।

বাংলা সাহিত্যের ধারা যখন প্রায় স্তব্ধ, অবক্ষয়িত, ঠিক তখনই হাংরি আন্দোলনকারীরা সাহিত্যে প্রাণ দিলেন। বাংলা সাহিত্য আবার নতুন চিন্তায় যৌবন লাভ করল। সৃষ্টি হল অনেকগুলো নতুন নতুন আন্দোলনের। একশ্রেণির মানুষ এই আন্দোলনকে অশ্লীল এবং অপসংস্কৃতি আখ্যা দিলেও এঁদের চিন্তার কাছে অশ্লীল ও ঘৃণনীয় বলে কোনো জিনিস নেই। মানুষের ব্যবহৃত সমস্ত শব্দই হাংরি আন্দোলনকারীদের কাছে পবিত্রতম এবং ব্যবহার যোগ্য। এই চিন্তাবিশ্ব থেকেই বাংলা সাহিত্যে তৈরি হয়েছিল একটা নতুন ভিত্তি ভূমি।

হাংরি আন্দোলনকারীদের ওপর আরোপ করা সমস্ত অভিযোগ যে মিথ্যা সেটা ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। আমরাও যুক্তির নৈষ্ঠিক মাপকাঠিতে আন্দোলনকারীদের কাজ-কর্মকে হিসেবী অংক দ্বারা সঠিক চিহ্নিত করার প্রয়াসে ব্রতী হয়েছি বারবার। অধুনা বাংলা সাহিত্যের মানদণ্ড বিচার করতে হলে হাংরি আন্দোলনের ঋণ স্বীকার না করলে ইতিহাসের শ্যান-দৃষ্টিতে আমরা অপরাধী হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকব। তাই গবেষণায় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য স্বরূপ যথাযথ সাহিত্য সংস্কারের নানা দিক। সাহিত্যে বাঁকবদলের গতিকে থরে থরে সাজানোর চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে নিজের মেধাকে সৌধ করে হাংরি আন্দোলনকারীদের চিন্তাবিশ্বকে ধন্য মনে হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে এমন আন্দোলনের প্রয়োজন ছিলই।

কবিতার ব্যাকরণ ভেদ করার ক্ষমতা পড়ুয়ার না থাকলে তিনি যে কোনো কবি সম্পর্কে যা তা বলবেনই। অনেক সময় কাউকে অবজ্ঞা করতে তার মেধাকেও অস্বীকার করা হয়। এমন উদাহরণ পৃথিবীর সব প্রান্তে জ্বলন্ত। তাই হাংরি আন্দোলন যখন কবিতার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যে পালাবদলের জোয়ার তুলল তখন অনভ্যস্ত পাঠ-আস্বাদনকারী ক্ষুৎকাতর সম্প্রদায়কে— 'অশ্লীল', 'মস্তানিপনা', 'নারকীয়', 'মূল্যবোধহীন', 'অশিক্ষিত' ইত্যাদি বিশেষণে কলুষিত করার চেষ্টা চলল। হাংরি আন্দোলনের পঞ্চাশ বৎসর পূর্তিতে আজ আমরা উপলব্ধি করছি বাংলা সাহিত্যে এই আন্দোলন এক সুস্থ বার্তার ভগীরথ বয়ে এনে দিয়েছে। হাংরি আন্দোলনকে নিয়ে চারদিকে বহুমুখী আলোচনা ও সংকলন প্রকাশ তার যোগ্য দৃষ্টান্ত। এই কৃতিত্বের সিংহ ভাগ একমাত্র মলয় রায়চৌধুরীর।

ভাষার ওপর দখল থাকলেই ইচ্ছে মত শব্দের খেলা সম্ভব, তা প্রমাণিত হয়ে উঠেছে মলয় রায়চৌধুরীর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি কবিতায়। সেই হিসেবে মলয় রায়চৌধুরী তাঁর নির্মাণ শিল্পে অধিগত। কিন্তু হাংরি শরিকরাও তার ব্যতিক্রম নন। তাঁদের কাব্য-সাহিত্যের শরীরও যথাযথ শব্দ ও বাক্যের বয়ন-ক্রিয়ায় অসাধারণত্ব লাভ করেছে। তাই হাংরি আন্দোলন এত চর্চিত হয়েছিল। এঁদের সাহিত্য কীর্তি নিয়ে আজ গবেষণা আলোচনা হচ্ছে। হাংরি আন্দোলন বাংলা সাহিত্যের বুকে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল বলেই বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের সাহিত্যানুরাগী তার গুরুত্ব ভুলে থাকলেও আজ জ্ঞানপিপাসু সাহিত্যপ্রেমী গবেষক উপলব্ধি করছেন তার যোগ্য মূল্যায়ন।

হাংরি আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কবিতায় অশ্লীলতা এবং রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র মামলা হয়। কিন্তু কল্লোল, কৃত্তিবাস কিংবা বিট ত্র্যাংরি বা অ্যাংরিদের বেলায় তো তা ঘটেনি। এখানেই হাংরি আন্দোলন সকল সাহিত্য আন্দোলন থেকে আলাদা, স্বতন্ত্র। হাংরি সাহিত্য আধুনিক কিংবা অধুনান্তিক এই জন্যই যে, এর মূল 'অন্তর্ঘাতমূলক'। কেউবা মলয় রায়চৌধুরী এবং তার শরিক কবিদের কবিতাকে বলেছেন 'আক্রামক'। আমরা লক্ষ্য করেছি— হাংরি আন্দোলনকারীদের কবিতা বাংলা সাহিত্যে নতুন পথ চিহ্নায়ক, কবিতার প্রতিমাকে ইচ্ছেমত সাজাবার স্বাধীনতা দিয়েছেন তাঁরা। বাংলা কবিতা ক্রম-অগ্রসরমান হয়ে আবহমান ঐতিহ্যের সৌন্দর্যকে আরও উজ্জ্বলতর করে দিয়েছে; বাংলা কবিতা তাই আজ এত শক্তিশালী ও বহুমুখী। বাংলা কবিতা ভাণ্ডার এখন ধনপূর্ণ।

সময় ও যুগের সঙ্গে সঙ্গে কবিতার ভাষা ও আঙ্গিক বদলায়। উপমা-রূপকের নানা রূপান্তর ঘটে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। একে অবজ্ঞা করলে সৃষ্টি স্তব্ধ হয়ে যায়। কবিতা শব্দ শিল্প। তাই শব্দের খেলা যিনি যত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পারেন, শব্দ নির্বাচনে যার কৃতিত্ব স্বতন্ত্র তিনিই কালের বিচারে যোগ্য কবির মর্যাদা লাভ করেন। মলয় রায়চৌধুরীর কবিতায় শব্দ ও ব্যঞ্জনার রকমফের আমাদেরকে এক নতুন জগতের সন্ধান দেয়, যা আমরা অনেকে কাব্যভুবনে নিমজ্জিত হয়েও পরিতৃপ্ত হই না।

কবির রচনায় ফুটে ওঠে সময়, পরিবেশ, জীবন, কালপ্রবাহ ইত্যাদি। দুরন্ত গতিবেগে চিন্তার মসিকেতন উড়িয়ে যুবক সম্প্রদায় সব সময়ই ভাঙা-গড়ার খেলায় মেতে চলে। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। সেই নিয়মের ব্যতিক্রম নন হাংরি আন্দোলনকারীরা। চারদিকের সমস্ত দুর্বল সরস্বতী বন্দনাকে সবল করতে বিদ্যায়তনিক চেতনা কেড়ে নিতে চাইলেন দূর মফসসলের মসি যোদ্ধা যুবক বৃন্দ। চিন্তা সকলেরই ভিন্ন। দৃষ্টি শক্তি সবার সমান নয়। অতীত বর্তমানের দোলাচল চিত্তবৃত্তির মধ্যে দাঁড়িয়ে মনের মধ্যে আন্দোলিত হয় নানা বয়ান আর সেখান থেকেই কলম চলে আগ্নেয় স্ফুলিঙ্গের জ্বলন্ত গতিবেগে। যার পরিপূর্ণ রূপ আন্দোলন। সেই চিত্তবৃত্তির রেখা চিহ্নায়িত হয় কবির কবিতায়। তাই কাব্য আর কবিজীবন এক ধারায় এগিয়ে চলে। কবি পরিপার্শ্বকে তুলে আনেন নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া সকল সূচকরেখায়। এইজন্য কবিকে চিনে নিতে পারি তাঁর কবিতায়। কবির সঙ্গে তাঁর সময়কাল ও জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা সকল ঘটনা 'আমি'-র হাঁ-ঘরে খেলা করে। সেই-সঙ্গে উন্মত্ততা, ইতিহাস, স্মরণীয় মুহূর্ত সবকিছু ধরা পড়ে হাংরির সকল শরিক মহল্লায়। তাই ক্ষুধার্ত হয়ে আমরা খুঁজে খুঁজে বেড়িয়েছি আমাদের গবেষণা সন্দর্ভের প্রতি ক্ষুধায়। ক্ষুধার্ত আন্দোলনকারীদের ক্ষুধা খুঁজতে গিয়ে আমাদের জ্ঞানের ক্ষুধা ভবিষ্যতের জন্য আরও ক্ষুধামুখী করে দেয়।

গবেষণা সন্দর্ভের সমাপ্তি পর্যায়ে একথা বলা যেতে পারে, এই কার্যে নিজেকে আত্মনিয়োগ করে কঠোর তপস্যায় এক নতুন অধ্যায় সংযোজন করতে পেরে আমরা আনন্দিত। কারণ এই নিরলস অধ্যয়ন ও অধ্যবসায় বাংলা সাহিত্যের পরবর্তী জ্ঞানপিপাসুর মনকে আলোড়িত করতে পারলে আমাদের হাংরির বহুমুখী ক্ষুধা আবিষ্কার সফল হবে। গবেষণা এমন জিনিস যার সমাপ্তি সম্ভব ঘটে না। বিশেষ করে সাহিত্যে গবেষণার দৃষ্টিকোণ সকল গবেষকেরই ভিন্ন হয় বলে জোর গলায় আমাদের কথাই শেষ কথা এটা বলা কখনও সম্ভব নয়। যুক্তির নৈষ্ঠিক মাপকাঠিতে আমাদের দুঃসাহসী নিরলস প্রয়াস যথাযথ সমাদরে আদৃত হবে বলে আশা রেখে আপাতত গবেষণা সন্দর্ভের পেটরায় চাবি তুললাম। □

ঋণ স্বীকার

গ্রন্থঋণ

১. রায়চৌধুরী মলয়, 'মলয় রায়চৌধুরীর কবিতা ২০০৪-১৯৬১', আবিষ্কার প্রকাশনী, ১২-এ বাঁশদ্রোণী ঘাট রোড, কলকাতা-৭০, প্রথম প্রকাশ ঃ মার্চ ২০০৫

২. রায়চৌধুরী মলয়, 'যা লাগবে বলবেন', কৌরব প্রকাশনী,২৫-এ, এগ্রিকো বাগান, জামশেদপুর-৮৩১০০৯, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৯৬

৩. রায়চৌধুরী মলয়, 'আত্মধ্বংসের সহস্রাব্দ', গ্রাফিত্তি, ২-এ টিপুসুলতান রোড, কলকাতা-২৬, প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ২০০০

৪. রায়চৌধুরী মলয়, 'হাংরি কিংবদন্তী', দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ঃ জুলাই ১৯৯৪

৫. রায়চৌধুরী মলয়, 'হাংরি আন্দোলনের ইশতাহার' , আবার এসেছি ফিরে, কানপুর, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ-৭৪২১৩৫, প্রথম প্রকাশ ঃ বসন্ত ১৪১৪

৬. রায়চৌধুরী মলয়, 'অ', কবিতা পাক্ষিক, ৩৬ বি, হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-২৬, প্রথম প্রকাশ ঃ বইমেলা ১৯৯৮

৭. রায়চৌধুরী মলয়, 'ছোটলোকের ছোটবেলা', কোয়ার্ক পাবলিশার্স, কলকাতা-৩৪, প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারি ২০০৪

৮. রায়চৌধুরী মলয়, 'পোস্টমডার্ন কালখন্ড ও বাঙালির পতন', খনন, ২১৭ বসন্ত বিহার, লাভা রোড, ওয়াড়ি, নাগপুর-৪৪০০২৩, প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর ২০০০

৯. রায়চৌধুরী মলয়, 'আমার অমীমাংসিত শুভা', হাংরি জেনারেশন পাবলিশার্স, দরিয়াপুর, বাকিপুর, পাটনা, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩ মাঘ ১৩৭১

১০. রায়চৌধুরী মলয়, 'জখম', কবিতীর্থ, ৫০/৩ কবিতীর্থ সরণি, কলকাতা-২৩, প্রথম প্রকাশ ঃ ৯ জুন ১৯৬৫, দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৮

১১. ঘোষ শৈলেশ্বর, 'হাংরি জেনারেশন আন্দোলন', এ/৮ লেক ভিউ পার্ক, কলকাতা-৩৫, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৫

১২. গুহ সত্য, 'একালের গদ্য পদ্য আন্দোলনের দলিল', ধৃতি, ১৫০৩/১০ কল্যাণগড়, উত্তর ২৪ পরগণা-৭৪৩২৭২, প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ১৯৭০

১৩. দাশ উত্তম, 'হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন', মহাদিগন্ত, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা-৭৪৩৩০২, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৮৬, দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ২০০২

১৪. দত্ত সন্দীপ, 'বাংলা গল্প কবিতা আন্দোলনের তিন দশক', র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ৪৩ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ঃ মে ১৯৯৩

১৫. রায়চৌধুরী সমীর, 'পোস্টমডার্ন কবিতা বিচার', কবিতা পাক্ষিক, ৩৬ বি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-২৬, প্রথম প্রকাশ ঃ বইমেলা ১৯৯৮

১৬. ঘোষ শৈলেশ্বর, 'প্রতিবাদের সাহিত্য' প্রতিভাস, কলকাতা-২, প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪, প্রতিভাস সংস্করণ ঃ কলকাতা বইমেলা ১৯৯৭,

১৭. রায় অজিত, ‘হাংরি জেনারেশন ঃ গেরো ফাঁসগেরো’ বিনির্মাণ, এইচ.বি.-২১০, সল্টলেক, কলকাতা-৯১, গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ঃ কলকাতা বইমেলা ২০০৫

১৮. ঘোষ শঙ্খ, ‘শব্দ আর সত্য’, প্যাপিরাস, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা-৪, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৫ মার্চ ১৯৮২, তৃতীয় মুদ্রণ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৯

১৯. ঘোষ শৈলেশ্বর, ‘ভাষা বিমোচন’, প্রতিভাস, কলকাতা-২, প্রথম প্রকাশ ঃ কলকাতা বইমেলা ২০০৭

২০. ভট্টাচার্য তপোধীর, ‘কবিতার রূপান্তর’, সাহিত্যলোক, ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৮ সেপ্টেম্বর ২০০৩

২১. ভট্টাচার্য তপোধীর, ‘আধুনিকতা ঃ পর্ব থেকে পর্বান্তর’, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ঃ জুলাই ১৯৯৫

২২. চট্টোপাধ্যায় রাণা, ‘বাংলা কবিতার একশো বছর’, মুর্শিদাবাদ সাহিত্যে আকাদেমি, ৫৪/১/৩ নীলমনি ভট্টাচার্য লেন, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ-৭৪২১০১, প্রথম প্রকাশ ঃ মহালয়া ২০০৬

২৩. মিশ্র ড° অশোককুমার, ‘আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ২০০২

২৪. রায় দেবী, ‘অন্তরঙ্গ কথাবার্তা’, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর ২০০০

২৫. মজুমদার মিহির, ‘কবিতার আলো ও অন্যান্য’, চিরন্তন সাহিত্যর দিন, গুয়াহাটি-৩, প্রথম প্রকাশ ঃ মে ২০০৫

২৬. ভট্টাচার্য তপোধীর, ‘কবিতার বহুস্বর’, প্রতিভাস, কলকাতা-২, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ২০০৯

২৭. ত্রিপাঠী দীপ্তি, ‘আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়’, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ঃ আগস্ট ১৯৫৮, পঞ্চম সংস্করণ ঃ জুন ১৯৯২

২৮. মুখোপাধ্যায় ড° বাসন্তীকুমার, ‘আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা’, প্রকাশ ভবন, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ঃ এপ্রিল ১৯৬৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ জুন ১৯৮১

২৯. ত্রিপাঠী দীপ্তি, ‘বাংলাদেশের আধুনিক কাব্যপরিচয়’ দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ঃ কলকাতা পুস্তকমেলা ১৯৯৪

৩০. সিকদার অশ্রুকুমার, ‘আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়’, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা-৬, প্রথম সংস্করণ ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৮১, চতুর্থ মুদ্রণ ঃ আশ্বিন ১৩৯৮

৩১. চক্রবর্তী সুমিতা, ‘আধুনিক কবিতার চালচিত্র’, সাহিত্যলোক, ৫৭-এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ১৯৯৬, পুনর্মুদ্রণ ঃ নভেম্বর ২০০৮

৩২. চৌধুরী শীতল, ‘আধুনিক বাংলা কবিতার নিবিড় পাঠ’, বামা পুস্তকালয়, ১১-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ঃ শুভ রথযাত্রা ১৪০৯, পুনর্মুদ্রণ ঃ ২০০৪

৩৩. মুখোপাধ্যায় তরুণ, ‘ওপার বাংলার কবি ও কবিতা’, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ঃ বইমেলা ২০০৭

৩৪. বিশ্বাস ড° অচিন্ত্য, ‘কবিতার শৈলী ঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ’, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ , ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ঃ ২২ শ্রাবণ ১৪১৩

৩৫. জানা সুস্নাত, ‘পোস্ট মডার্নিজম ও বাংলা কবিতায় উত্তর আধুনিক চেতনা’, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ৬/২ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ঃ বইমেলা ২০১০

৩৬. বসাক সুবিমল, ‘ত্রিদিব মিত্রের প্রলাপ, ত্রিদিব মিত্রের দুঃখ’, প্রকাশক ঃ অমৃত তনয় গুপ্ত, ১৮ বিবেকানন্দ নগর, কলকাতা-৫৬, ১৯৭২

৩৭. রায়চৌধুরী মলয়, 'মলয়ের প্রবন্ধ সংকলন', অতএব প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ঃ ২০০৪
৩৮. রায়চৌধুরী মলয়, 'প্রতিস্ম পরিসরের অবিনির্মাণ' দাহপত্র, ঘটকবাগান, চন্দননগর, হুগলি, প্রথম প্রকাশ ঃ লিটল ম্যাগাজিন মেলা ২০০৪
৩৯. রায়চৌধুরী মলয়, 'মলয় রায়চৌধুরীর প্রবন্ধ সংকলন', সম্পাদক ঃ শংকর সরকার, অতএব প্রকাশনী, রবীন্দ্রপল্লী, নিমতলা, কলকাতা-৪৯, প্রথম প্রকাশ ঃ কলকাতা বইমেলা জানুয়ারি ২০০০
৪০. ঘোষ শঙ্খ, 'এখন সব অলীক', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ঃ ২২ শ্রাবণ ১৪০১, দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ১ শ্রাবণ ১৪০৫
৪১. ঘোষ শঙ্খ, 'এই শহরের রাখাল', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-২০, প্রথম প্রকাশ ঃ ২৬ জানুয়ারি ২০০০
৪২. বসাক সুবিমল, 'ছাতামাথা', ২-এ টিপুসুলতান রোড, কলকাতা-২৬, প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৬৫, প্রথম গ্রাফিত্তি প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারি ২০০২
৪৩. দাশগুপ্ত বাসুদেব, 'রন্ধনশালা', বিদ্যোৎসাহী, ৩ ম্যাঙ্গো লেন, কলকাতা-১, প্রথম প্রকাশ ঃ মে ১৯৬৫, দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ এপ্রিল ১৯৮৩
৪৪. ঘোষ সুভাষ, 'আমার চাবি', দন্দশূক প্রকাশনী, বড় বাজার, চন্দন নগর-৭১২১৩৩, প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯ - ১৯৬৫, দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯ - ১৯৮৪
৪৫. রায় দেবী, 'উপনরক', প্রকাশক ঃ শ্রীসুবোধ মণ্ডল, কল্পনা প্রেস, কলকাতা-৬
৪৬. বসু শুদ্ধসত্ত্ব, 'বাংলা সাহিত্যের নানা রূপ', বিশ্বাস বুক স্টল, ৮৮ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯, ষষ্ঠ মুদ্রণ ঃ শ্রাবণ ১৪১০
৪৭. বন্দ্যোপাধ্যায় সরোজ, 'বাংলা কবিতার কালান্তর', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, প্রথম দে'জ সংস্করণ ঃ ১৪০৭ আশ্বিন, অক্টোবর ২০০০

সম্পাদিত গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার ঋণ

১. চৌধুরী সমীর, সম্পাদক ঃ 'হাংরি জেনারেশন রচনা সংকলন', কথা ও কাহিনী, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ঃ এপ্রিল ১৯৯৮
২. রায়চৌধুরী সমীর, সম্পাদক ঃ 'ফালগুনী রায় সমগ্র', হাওয়া ৪৯, কলকাতা-৭০, প্রথম প্রকাশ ঃ বইমেলা ১৯৯৮
৩. এ. এম. মুর্শিদ, সম্পাদক ঃ 'মলয়', আবিষ্কার প্রকাশনী, কলকাতা-৭০, প্রথম প্রকাশ ঃ বৈশাখ ১৪০৮
৪. সেনগুপ্ত স্বরাজ, সম্পাদক ঃ 'প্রসঙ্গ ঃ দেবী রায়', দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ২০০৪
৫. রায় অজিত, সম্পাদক ঃ 'হাংরি সাক্ষাৎকারমালা', মহাদিগন্ত, বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৯৯
৬. চৌধুরী প্রদীপ, সম্পাদক ঃ 'একই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে স্থাপিত ভালবাসা মৃত্যু অমৃত জীবন', বিকল্প সাহিত্য-অতিরিক্ত সংযোজন, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ২০০৮

৭. রায়চৌধুরী সমীর, সম্পাদক ঃ 'পোস্টমডার্নিজম ঃ অধুনান্তিকতা', হাওয়া ৪৯, কলকাতা-৭০, প্রথম প্রকাশ ঃ বইমেলা ১৯৯৭

৮. রায়চৌধুরী সমীর, সম্পাদক ঃ 'পোস্টকলোনিয়ালিজম ঃ উত্তর ঔপনিবেশিকতা', হাওয়া ৪৯, কলকাতা-৭০, প্রথম প্রকাশ ঃ শারদ ১৯৯৬

৯. ঋ৳ ০৪ দেবকুমার, সম্পাদক ঃ 'আধুনিক কালের কবিতা পরিচয়', শিলালিপি, ৫১ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি ১৯৯২, তৃতীয় সংস্করণ ঃ জানুয়ারি ২০০২

১০. খাঁ চন্দন, সম্পাদক ঃ 'একালের কবিতা ঃ মননে বিশ্লেষণে', সাহিত্য সঙ্গী, ১১-এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশ ঃ দীপাবলী ১৪১০

১১. মিত্র আলো, সম্পাদক ঃ 'হাংরি জেনারেশন আগ্নেয় চিঠিপত্রের জীবন্ত সংকলন', হাংরি বুকস, ১৮ নস্কর পাড়া লেন, শিবপুর, হাওড়া-২

১২. রায়চৌধুরী সমীর, সম্পাদক ঃ হাওয়া ৪৯, হাংরি আন্দোলন সংখ্যা, আবিষ্কার, কলকাতা-৭০, প্রকাশকাল ঃ বইমেলা ২০০৬

১৩. নন্দী সাত্ত্বিক, সম্পাদক ঃ 'ক্ষুধার্ত সময়', তমালতলা, আগরতলা, প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারি ২০০৪

১৪. হক এবাদুল, সম্পাদক ঃ 'আবার এসেছি ফিরে', কল্যাণপল্লী, ভগবানগোলা, মুর্শিদাবাদ- ৭৪২১৩৫, ২৩ বর্ষ তৃতীয় ও চতুর্থ সংখ্যা ২০০৩

১৫. সেন সব্যসাচী, সম্পাদক ঃ 'কারুবাসনা', শৈলেশ্বর ঘোষ সংখ্যা, ৫১/২৩ দমদম রোড, বর্ষা অ্যাপার্টমেন্ট, বক্স নং-২, কলকাতা-৭৪, বইমেলা ২০০৮

১৬. রায়চৌধুরী মলয়, সম্পাদক ঃ 'জেব্রা', সংখ্যা-২, ১৯ চৌধুরী পাড়া স্ট্রিট, উত্তরপাড়া, পশ্চিমবঙ্গ, সময় ঃ ১৩৭৪

১৭. মিত্র ত্রিদিব ও মিত্র আলো, সম্পাদক ঃ 'উন্মার্গ', পঞ্চম সংখ্যা, সময় ঃ ১৯৬৯

১৮. নন্দী বিশ্বজিৎ, সম্পাদক ঃ 'মিলন', প্রযত্নে ঃ চারুকুঠি, ওয়েস্ট গারো হিলস, তুরা, মেঘালয়-৭৯৪০০১, সময় ঃ ২০০৭

১৯. সরকার বিকাশ, সম্পাদক ঃ 'দৈনিক যুগশঙ্খ', পূজাবার্ষিকী, বৈদ্যনাথ সরণি, রংপুর, শিলচর-৭৮৮০০৯, সময় ঃ ১৪১২

২০. রায় সন্তোষ, সম্পাদক ঃ 'জলজ', নয়াপাড়া, ধর্মনগর, উত্তর ত্রিপুরা-৭৯৯২৫০, সময় ঃ পৌষ ১৪১৫

২১. কুমার দে বিষ্ণু, সম্পাদক ঃ 'স্বপ্ন', হরুলংপার কলনি, লামডিং - ৭৮২৪৪৭, বর্ষ-১৪, সংখ্যা-১, শরৎ ২০০৭

২২. তদেব, বর্ষ - ১৫, সংখ্যা-১, শরৎ ২০০৮

২৩. তদেব, বর্ষ - ১৬, ফেব্রুয়ারি ২০১০

২৪. সেন কাজল, সম্পাদক ঃ 'কালিমাটি', সমীর রায়চৌধুরী সংখ্যা, জলধর স্মৃতি, ৩ অতসী রোড, প্রমথ নগর, জামশেদপুর-৮৩১০০২, একত্রিশ বর্ষ প্রথম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৬

২৫. দত্ত ডলি, সম্পাদক ঃ 'দধীচি', ৯৮ প্যারীমোহন রায় রোড, কলকাতা-২৭, প্রথম প্রকাশ ঃ এপ্রিল ২০০৪

২৬. এ. এম. মুর্শিদ, সম্পাদক ঃ 'হাওয়া ৪৯', অধুনান্তিক প্রবন্ধ সংগ্রহ সংখ্যা, কলকাতা-৭০, ৩৬ তম সংকলন, বইপার্বন ২০০৯

২৭. শাশ্বত সিকদার, সংকলক ঃ 'হরিণাহরিণীর', ৬২৩/১ ডি, ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলকাতা-৩৪, চতুর্থবর্ষ প্রথম সংখ্যা, আষাঢ় ১৪১১
২৮. দাশ উত্তম, সম্পাদক ঃ 'মহাদিগন্ত', বারুইপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা-৭৪৩৩০২, তৃতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪
২৯. তদেব, অষ্টাদশ বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৯
৩০. ঘোষ রবিন, সম্পাদকঃ 'বিজ্ঞাপনপর্ব', ১৪ হেয়ার স্ট্রিট, কলকাতা-১, ২৩ বর্ষ, বার্ষিক সংখ্যা ১৯৯৫
৩১. বসাক সুবিমল, সম্পাদক ঃ 'প্রতিদ্বন্দ্বী', ১৩ বিপিন গাঙ্গুলী রোড, কলকাতা-৩০, তৃতীয় সংকলন, ১৯৬৮
৩২. তদেব, চতুর্থ সংকলন, আগস্ট ১৯৭০
৩৩. ভদ্র বিশাল, সম্পাদকঃ 'কানাকড়ি', সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯, অষ্টাদশ বর্ষ, সংখ্যা-১, জানুয়ারি-মার্চ ২০০৫
৩৪. মণ্ডল সুনীল, সম্পাদক ঃ 'আহবকাল', ব্যক্তি সংখ্যা ঃ মলয় রায়চৌধুরী, দক্ষিণ ২৪ পরগণা-৭৪৩৫০৫, তৃতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন ২০০২
৩৫. মুখোপাধ্যায় জয়, সম্পাদক ঃ 'বিকর্ণ', ধনিয়াখালী, হুগলি-৭১২৩০২, দশম বর্ষ, উৎসব ২০০০
৩৬. চট্টোপাধ্যায় অরুণকুমার, সম্পাদক ঃ 'বোধ', বনবাস, রূপনারায়ণপুর, বর্ধমান-৭১৩৩৬৪, সংখ্যা ৪৮, মে ২০০৭
৩৭. শীল শ্যামল, সম্পাদক ঃ 'কবিস্বর', ৪৮/এল-৬, এগ্রিকো, জামশেদপুর-৮৩১০০৯, একাদশ বর্ষ, জানুয়ারি ২০০৮
৩৮. রায়চৌধুরী সমীর, সম্পাদক ঃ 'হাওয়া ৪৯', ডায়াসপোরিক সংখ্যা, কলকাতা-৭০, আঠাশ নম্বর সংকলন, ডিসেম্বর ২০০৩
৩৯. তদেব, উনত্রিশ সংকলন, জানুয়ারি ২০০৪
৪০. উৎপল ভট্টাচার্য, সম্পাদক ঃ 'কবিতীর্থ', ৫০/৩ কবিতীর্থ সরণি, কলকাতা-২৩, সপ্তদশবর্ষ, আশ্বিন ১৪০৫
৪১. তদেব, মাঘ ১৪১০
৪২. তদেব, পঞ্চবিংশতি বর্ষ, মাঘ ১৪১৩
৪৩. বালী সৌগত, সম্পাদক ঃ 'বিকল্প শরীর', আম্বেদকর লেন, মল্লিকপাড়া, শ্রীরামপুর, হুগলি-৭১২২০৩, সংখ্যা-১, মে ২০০৮
৪৪. রায় অজিত, সম্পাদক ঃ 'শহর', শহর পাবলিকেশন, ১৫০ ইতোয়ারি নগর, তেলিপাড়া, হিরাপুর, ধানবাদ-৮২৬০০১, বত্রিশতম সংকলন, জানুয়ারি ২০০৬
৪৫. রহমান মীজানুর, সম্পাদক ঃ 'মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা', ৩/৩ লালমাটি, ব্লক-বি, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ, পঞ্চদশ বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, জানুয়ারি-মার্চ ২০০০,
৪৬. তদেব, একবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০০৩
৪৭. তদেব, দ্বাবিংশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০০৪
৪৮. কর্মকার সুভাষ, সম্পাদক ঃ 'শুধু কবিতার', আশাদীপ অ্যাপার্টমেন্ট নিউটাউন, ডাক ও জেলা ঃ জলপাইগুড়ি, ষোড়শ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, আশ্বিন ১৪১৬
৪৯. গাঙ্গুলী অমরেশ ও অন্যান্য ঃ 'দিগঙ্গন', বঙ্গভবন ৩, হেইলী রোড, নিউ দিল্লি-১, উৎসব সংখ্যা ২০০৪
৫০. গাঙ্গুলী অমরেশ ও অন্যান্য ঃ 'দিগঙ্গন', বঙ্গভবন ৩, হেইলী রোড, নিউ দিল্লি-১, উৎসব সংখ্যা ২০০৫

৫১. ভট্টাচার্য প্রদীপ ও নাথ শান্তি, সম্পাদক ঃ 'একালের রক্তকরবী', ইস্ট কলকাতা টাউনশিপ, ফেজ-৪, কসবা গোলপার্ক, কলকাতা-১০৭, বর্ষ-১৪, জানুয়ারি ২০০৪

৫২. তদেব, বর্ষ - ১৪, জুন ২০০৪

৫৩. ভট্টাচার্য প্রদীপ, নাথ শান্তি ও চক্রবর্তী গৌতম, সম্পাদক ঃ 'একালের রক্তকরবী', ইস্ট কলকাতা টাউনশিপ, ফেজ-৪, কসবা গোলপার্ক, কলকাতা-১০৭, বর্ষ-১৫, সেপ্টেম্বর ২০০৫

৫৪. তদেব, বর্ষ-১৫, নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০০৫

৫৫. তদেব, বর্ষ-১৬, সেপ্টেম্বর ২০০৬

৫৬. ভট্টাচার্য প্রদীপ ও মুখোপাধ্যায় গৌতম, সম্পাদক ঃ 'একালের রক্তকরবী', ২৮/৫ কনভেন্ট রোড, কলকাতা-১৪, বর্ষ-১৭, অক্টোবর ২০০৮

৫৭. রায় অনিন্দ্য, সম্পাদক ঃ 'দিশা', ২/৩৭ বিজয়গড়, যাদবপুর, কলকাতা-৩২, উৎসব সংখ্যা ২০০৮

৫৮. রায় অনিন্দ্য ও চক্রবর্তী কৃষ্ণেন্দু, সম্পাদক ঃ 'দিশা', পি-১০২, ইউনিক পার্ক, কলকাতা-৩৪, শারদীয় ১৪১০

৫৯. চক্রবর্তী নবনীতা, সম্পাদক ঃ 'উচ্চৈঃশ্রবা', বাংলা বিভাগ, হেরম্বচন্দ্র কলেজ, ২৩/৪৯ গড়িয়াহাট, কলকাতা-২৯, একাদশ সংখ্যা, মাঘ ১৪১৩

৬০. মাইতি প্রগতি, সম্পাদক ঃ 'ইসক্রা', বাদামতলা রোড, কলকাতা-৫৮, ত্রয়োদশ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, শারদীয় ২০০৬

৬১. ভট্টাচার্য উৎপল, সম্পাদক ঃ 'কবিতীর্থ', ৫০/৩ কবিতীর্থ সরণি, কলকাতা-২৩, আশ্বিন ১৪০৭

৬২. মাহমুদ শিমুল, সম্পাদক ঃ 'কারুজ', ঢাকা, বাংলাদেশ, ত্রয়োদশ বর্ষ, সপ্তমখন্ড, ফেব্রুয়ারি ২০০৩

৬৩. ঘোষ শৈলেশ্বর, সম্পাদক ঃ 'ক্ষুধার্ত', ২৮ ঋষি অরবিন্দ সরণি, কলকাতা-৯০, নভেম্বর ১৯৮১

৬৪. তদেব, সপ্তম সংকলন, ১৯৮৪

৬৫. বিশ্বাস দেবাশিস ও গণচৌধুরী বিকাশ, সম্পাদক ঃ 'বিষয়মুখ', ১৯ জুবিলিপার্ক, ব্রহ্মপুর, কলকাতা-৯৬, ২০০৬

৬৬. প্রধান অরবিন্দ, সম্পাদক ঃ 'হাওয়া ৪৯', কলকাতা-৭০, ৩০ তম সংকলন, ২০০৪

৬৭. চট্টোপাধ্যায় বিশ্বদেব, সম্পাদক ঃ 'মানসাই টাইমস', মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, বর্ষ ৬, সংখ্যা ১/২, ১-৩১ মে ২০০৪

৬৮. রায়চৌধুরী মলয়, সম্পাদক ঃ 'হাংরি জেনারেশন', দরিয়াপুর, পাটনা-৪, সংখ্যা ৯৯

৬৯. ব্রহ্ম শংকর, সম্পাদক ঃ 'কবিতা', ৪/৮১ বিদ্যাসাগর কলনি, কলকাতা-৪৭, ২৬ তম সংকলন, ১৯৮৯

৭০. ঘোষ সুভাষ, সংকলক ঃ 'ক্ষুধার্ত খবর', বাউড়িপাড়া, চন্দননগর, পশ্চিমবঙ্গ, মার্চ ১৯৯১

৭১. তদেব, চতুর্থ সংকলন, জানুয়ারি ১৯৯৬

৭২. ঘোষাল সুমিতাভ, সম্পাদক ঃ 'পদ্য গদ্য সংবাদ', কলকাতা, অক্টোবর ১৯৮৬

৭৩. সামন্ত সুবল, সম্পাদক ঃ 'এবং মুশায়েরা', ১৫ শ্যামল দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩, বৈশাখ-আষাঢ় ১৪১০

৭৪. রায়চৌধুরী ড০ শুভব্রত, সম্পাদক ঃ 'সাবর্ণবার্তা', ১৫ শ্মশান কালিতলা রোড, বড়িশা, কলকাতা-৮, চতুর্থ সংখ্যা, অক্টোবর ২০০২

৭৫. ঘোষ গজেন্দ্রকুমার, সম্পাদক ঃ 'উত্তর প্রবাসী', বক্স-২০৬১, এস-৪৪৫০২ সুরটি ২, সুইডেন, পঞ্চম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮৫ বিশেষ সংখ্যা-হাংরি জেনারেশন

৭৬. রায়চৌধুরী ড° শুভব্রত, সম্পাদক ঃ 'সাবর্ণ বার্তা', সাবর্ণ সংগ্রহশালা, সপ্তর্ষি ভবন, বড় বাড়ি, বড়িশা, কলকাতা-৮, দশম বর্ষ, দশম সংখ্যা, অক্টোবর ২০০৮
৭৭. রায় দীপংকর, সম্পাদক ঃ 'পথের পাঁচালী', কলকাতা ১৪, হাংরি জেনারেশন সংখ্যা, মাসিক পত্রিকা, দ্বাদশ সংকলন
৭৮. শইকীয়া প্রদীপ, সম্পাদক ঃ 'বিশ্বকোষ', সপ্তম খণ্ড, অসম সাহিত্য সভা, সি. এইচ. ভবন, যোড়হাট, প্রথম সংকলন, মার্চ ২০০৭
৭৯. রায়চৌধুরী মলয়, সম্পাদক ঃ 'হাংরি জেনারেশন', দ্বিতীয় সংকলন, তৃতীয় সংখ্যা, দরিয়াপুর, পাটনা-৪
৮০. দত্ত কমলকুমার, সম্পাদক ঃ 'দাহপত্র', স্পোর্টসভিউ অ্যাপার্টমেন্টস, টুনু মুখার্জি সরণি, বড় বাজার, চন্দননগর, হুগলি-৭১২১৩৬, জুন ২০০৩
৮১. কুণ্ডু ড° জগবন্ধু, সম্পাদক ঃ 'সাহিত্য সেতু', বাঁশবেড়িয়া, হুগলি-৭১২৫০২, ৩১ বর্ষ ৫ সংখ্যা, ১৬ জুন ১৯৯৭
৮২. তদেব, ৪০ বর্ষ ১৪ সংখ্যা, ১ নভেম্বর ২০০৬
৮৩. ঘোষ শান্তনু, সম্পাদক ঃ 'দৈনিক যুগশঙ্খ', বৈদ্যনাথ সরণি, রংপুর, শিলচর-৯, রবিবার, ১৮ নভেম্বর ২০০৭
৮৪. মণ্ডল অধীরকৃষ্ণ, সম্পাদক ঃ 'বনানী', লিটল ম্যাগাজিন সংখ্যা, যদুরবেড়িয়া, উলুবেড়িয়া, হাওড়া-৭১১৩১৬, এপ্রিল-সেপ্টেম্বর ২০০৬
৮৫. সাহা বীজেশ, সম্পাদক ঃ 'কবিতা প্রতিমাসে', ১৮-এ, গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা-২, বর্ষ-২, সংখ্যা-৩, জুলাই ২০০৬
৮৬. গাঙ্গুলী সুনীল, সম্পাদক ঃ 'কৃত্তিবাস', নবপর্যায়, ০২-৬৭-৬৮ গড়িয়াহাট, মার্কেট কমপ্লেক্স, ব্লক-সি.ডি., কলকাতা-১৯, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৬
৮৭. সরকার সুজিত, সম্পাদক ঃ 'বিশ্বকবিতার সহজপাঠ', প্যাপিরাস, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা-৭০০০০৪, প্রথম প্রকাশ ঃ আগস্ট ২০০০
৮৮. দাস দীপককুমার, সম্পাদক ঃ 'মাহেকীয়া শরাই', অসমীয়া আলোচনী, রিয়া পাবলিকেশন, মির্জা-৭৮১১২৫, কামরূপ, আসাম, প্রথম বছর অষ্টম সংখ্যা, মে ২০০৫
৮৯. পাঠক অতীন্দ্র, সম্পাদক ঃ 'অব্যয়', নবপর্যায়, জি.সি.৬৬, সেক্টর তিন, সল্টলেক সিটি, কলকাতা-১৯, দশম সংকলন, জানুয়ারি ১৯৯৮
৯০. ঘোষ অরুণেশ, সম্পাদক ঃ 'জিরাফ', ঘুঘুমারি, কোচবিহার, সংকলন-১০, জানুয়ারি ১৯৮৫
৯১. দত্ত প্রভাতকুমার, সম্পাদক ঃ 'অতলান্তিক', আমেরিকায় প্রকাশিত প্রথম বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, ৭৬৩০ ডিয়ার ক্রিক ড্রাইভ, ওয়াশিংটন, ওহিও-৪৩০৮৫, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, সংখ্যা - ৬/নং-২, এপ্রিল-জুন ১৯৮৬
৯২. দাস জীবতোষ, সম্পাদক ঃ 'রোবট', ব্যাঙচাতরা রোড, কোচবিহার-৭৩৬১০১, পঞ্চম বর্ষ প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, নভেম্বর-জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারি-এপ্রিল ১৯৮১
৯৩. তদেব, সপ্তম বর্ষ প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, ১৯৮৩
৯৪. চৌধুরী প্রদীপ, সম্পাদক ঃ 'স্বকাল', পি.ডব্লিউ.ডি. কুয়াটার নং-১০, মেলার মাঠ, আগরতলা-৭৯৯০০১, ১-৮০ নং
৯৫. অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পাদক ঃ 'দন্দশূক', কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা-৯, অষ্টম সংকলন, সেপ্টেম্বর ১৯৮১

৯৬. চৌধুরী প্রদীপ, সম্পাদক ঃ 'স্বকাল', ৭৩ রিজেন্ট এস্টেট, কলকাতা-৯২, জুন ১৯৯৫
৯৭. দাশগুপ্ত বাসুদেব, সম্পাদক ঃ 'ক্ষুধার্ত', ক্ষুধার্ত প্রকাশনী, ২৮১-৮, অশোক নগর, ২৪ পরগণা, ১৩৭৬
৯৮. আচার্য সজল রঞ্জন, সম্পাদক ঃ 'ছিটেফোঁটা', ৭৯ - স্টেশন রোড, উদয়পুর, কলকাতা-৪৯, ৫ সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০০৯
৯৯. ঘোষ শৈলেশ্বর, সম্পাদক ঃ 'ক্ষুধার্ত', ১/৮ ওলাইচণ্ডী রোড, কলকাতা-৭৩, মে ১৯৭৮
১০০. চৌধুরী প্রদীপ, সম্পাদক ঃ 'ক্ষুধার্ত সংকলন', ক্ষুধার্ত-স্বকাল, ৭৩ রিজেন্ট এস্টেট, কলকাতা-৯২, ১৯৮৫
১০১. চৌধুরী প্রদীপ, সম্পাদক ঃ 'ফুঃ', ৭৩ রিজেন্ট এস্টেট, কলকাতা-৯২, জানুয়ারি ১৯৯৭
১০২. তদেব, এপ্রিল - জুন ২০০১
১০৩. গোস্বামী অলোক, সম্পাদক ঃ 'ক্রমশ', ২০ আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলেজ পাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪৪০১, জানুয়ারি ১৯৯০
১০৪. বিশ্বাস দেবাশিস ও গণচৌধুরী বিকাশ, সম্পাদক ঃ 'বিষয়মুখ', ১৯ জুবিলি পার্ক, ব্রহ্মপুর, কলকাতা-৯৬, ২০০৬
১০৫. ধর সুশান্ত, সম্পাদক ঃ 'সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে', রজত জয়ন্তী বঙ্গ সম্মেলন, ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডেন, নিউইয়র্ক, জুলাই ২০০৫
১০৬. দত্ত ড° মিলন এবং মুখোপাধ্যায় অমলেন্দু, সম্পাদক ঃ 'শব্দসঞ্চয়িতা', নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, ৮/১ চিন্তামণি দাস লেন, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৯৫
১০৭. চট্টোপাধ্যায় সনৎকুমার, সচিব ঃ 'আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান', পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-২০, প্রথম প্রকাশ ঃ ২০ মে ১৯৯৯, তৃতীয় মুদ্রণ ঃ মে ২০০৯
১০৮. চক্রবর্তী নীরেন্দ্রনাথ, সম্পাদক ঃ 'বাংলা কী লিখবেন কেন লিখবেন', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা-৯, প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৯১, দ্বিতীয় সংস্করণের প্রথম মুদ্রণ ঃ আগস্ট ১৯৯৬
১০৯. Mitra Tridib & Mitra Alo, Ed. WASTE PAPER, 18 Naskar Para Lane, Shibpur, Howrah-2, Vol.-IV, India, September 1969
১১০. Bakken Dick, Ed. SALTED FEATHERS, 3206 N.E. 12th, Portland, Oregon 97212, USA, Vol. IV, Nos.1-2, March 1967
১১১. Bahri U.S., Ed. LANGUAGE NEWS, Delhi, Vol. I, No. 7,8,9, July-Aug-Sep 1988
১১২. Nakamura Joyee, Ed. CONTEMPORARY AUTHORS, Autobiography Series, Gale Research Inc., London, Vol. 14, 1990
১১৩. Nandy Pritish, Ed. THE ILLUSTRATED WEEKLY OF INDIA, Dr. D.N. Road, Bombay-400001, May 15-21, 1988
১১৪. Mitra Tridib, Ed. LETTERS LETTERS, Zebra Books, 18 Naskar Para Road, Howrah-2, 26th January 1968
১১৫. Choudhury Soumitri Ranjan, Ed. THE STORM, Singatala, Malda - 732101, Vol. II, Issue. I-III, Second Year, April 2007
১১৬. Pearsall Judy, Ed. THE CONCISE OXFORD DICTIONARY, YMCA Library Building, Jai Singh Road, New Delhi-110001, 10th edition. □

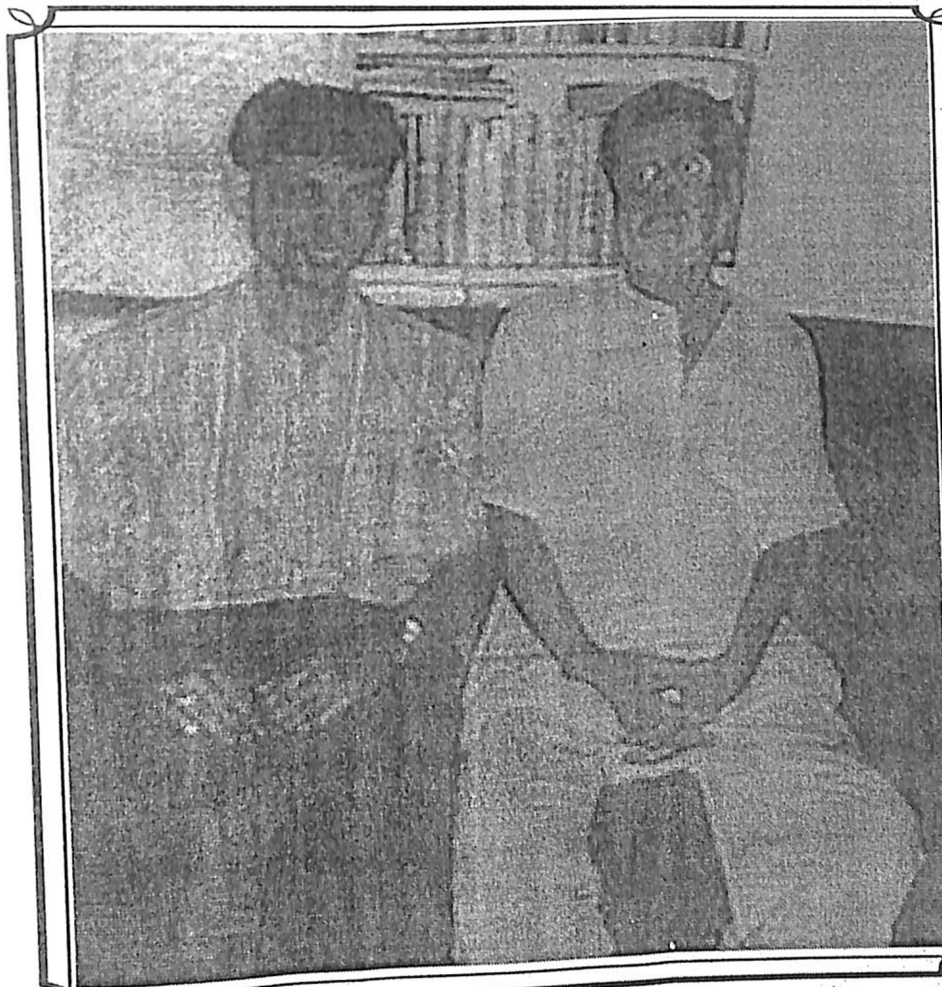

মলয় রায়চৌধুরী ও গবেষক বিষ্ণুচন্দ্র দে ।

১৫২

মলয় রায়চৌধুরীর বাবা রঞ্জিত রায়চৌধুরী
এবং মাতা অমিতা রায়চৌধুরী ।

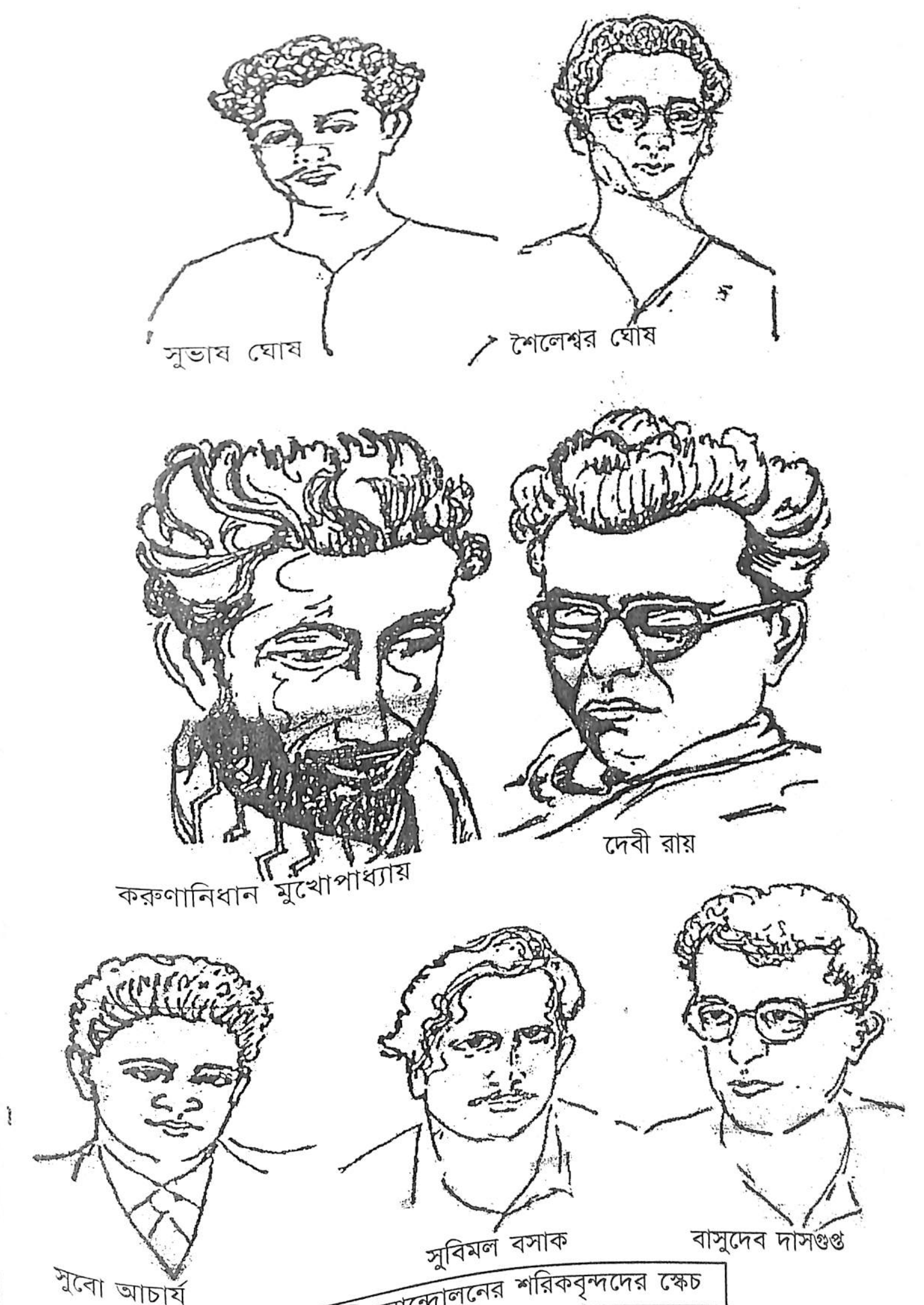

হাংরি আন্দোলনের শরিকবৃন্দদের স্কেচ

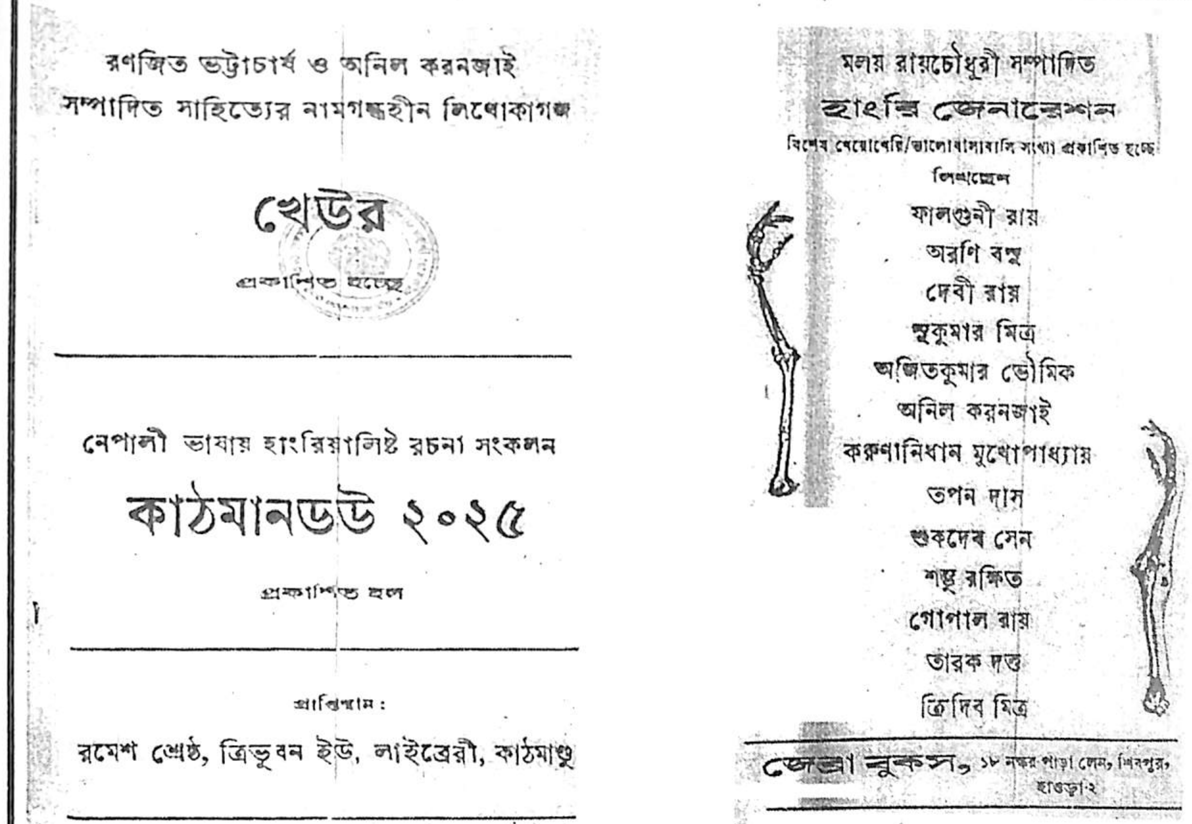

হাংরি আন্দোলনের সময় ব্যবহৃত বিজ্ঞাপনের নমুনা ।

হাংরি জেনারেশন, নিষিদ্ধ সংখ্যার প্রচ্ছদ, ১৯৬৪

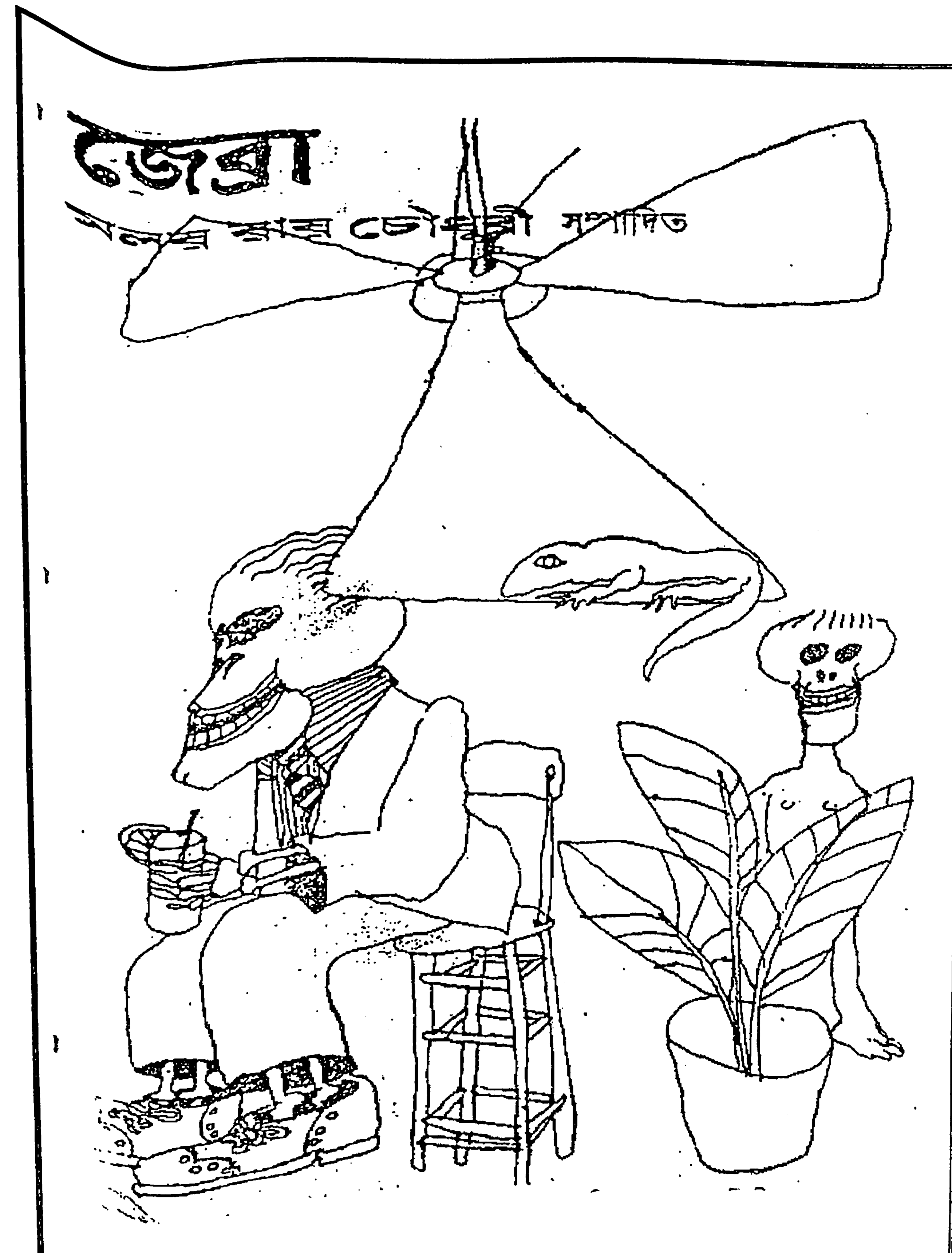

সুবিমল বসাকের আঁকা হাংরি আন্দোলনের পত্রিকা জেব্রা-র দ্বিতীয় সংখ্যার প্রচ্ছদ ।

অনিল করঞ্জাই-এর আঁকা নেপালি পত্রিকা 'কাঠমান্ডী' -র প্রচ্ছদ ।

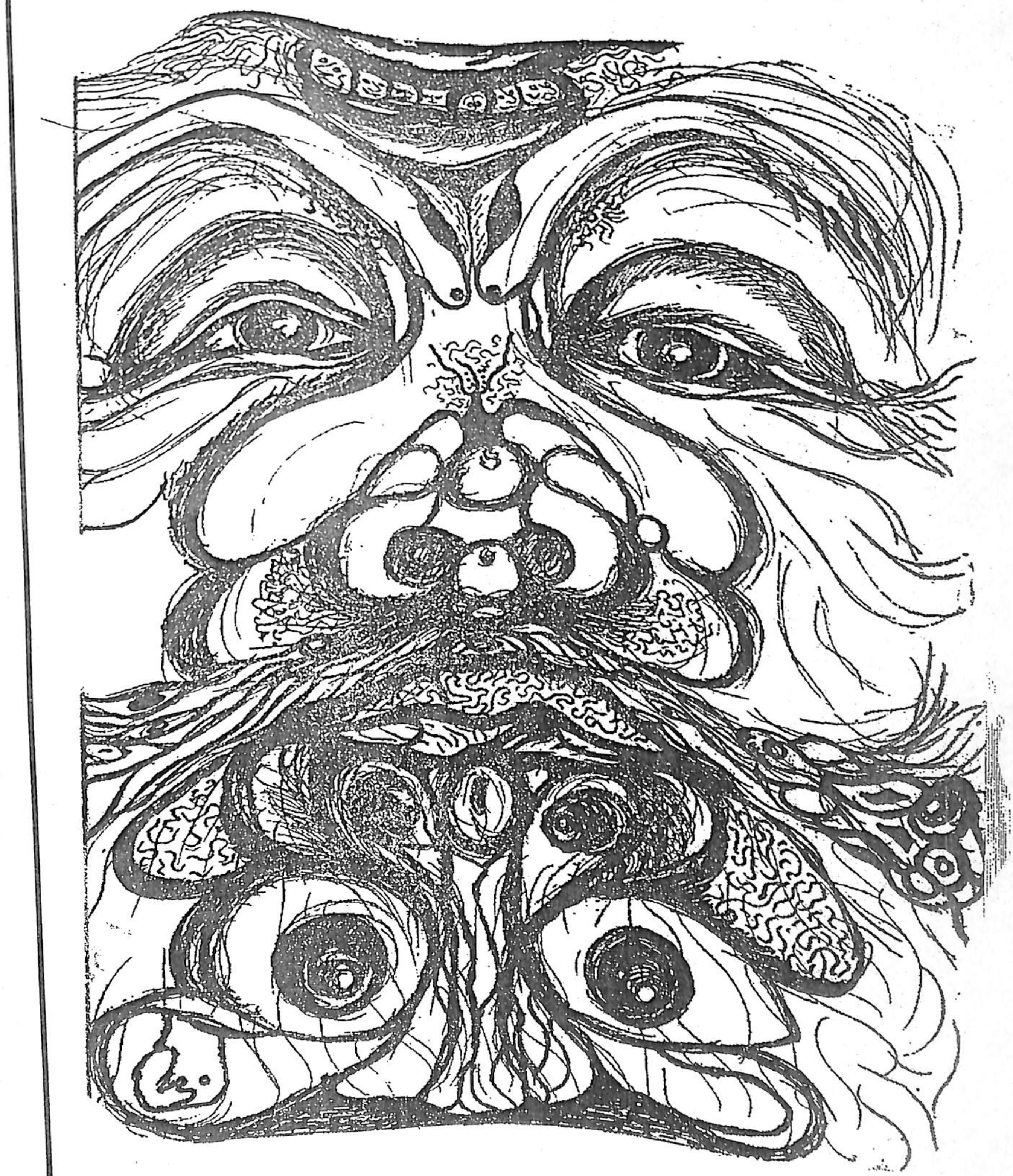

করুণানিধান মুখোপাধ্যায়-এর আঁকা স্কেচ ।

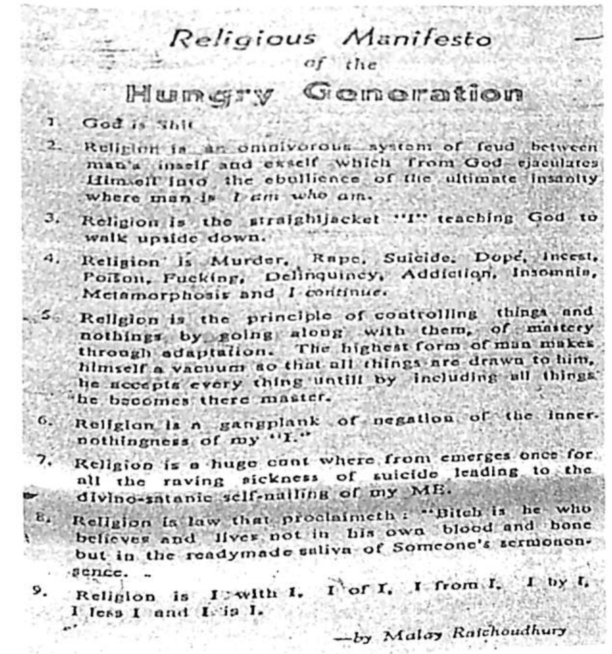

Religious Manifesto of the Hungry Generation

1. God is Shit
2. Religion is an omnivorous system of feud between man's inself and exself which from God ejaculates Himself into the ebullience of the ultimate insanity where man is *I am who am.*
3. Religion is the straightjacket "I" teaching God to walk upside down.
4. Religion is Murder, Rape, Suicide, Dope, Incest, Poison, Fucking, Delinquincy, Addiction, Insomnia, Metamorphosis and *I continue.*
5. Religion is the principle of controlling things and nothings by going along with them, of mastery through adaptation. The highest form of man makes himself a vacuum so that all things are drawn to him, he accepts every thing untill by including all things he becomes there master.
6. Religion is a gangplank of negation of the inner-nothingness of my "I."
7. Religion is a huge cunt where from emerges once for all the raving sickness of suicide leading to the divino-satanic self-nailing of my ME.
8. Religion is law that proclaimeth: "Bitch is he who believes and lives not in his own blood and bone but in the readymade saliva of Someone's sermononsence.
9. Religion is I with I. I of I. I from I. I by I. I less I and I is I.

—*by Malay Raichoudhury*

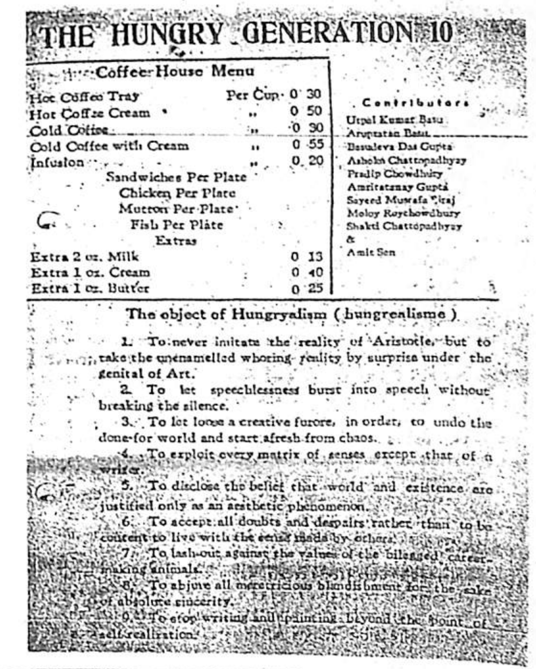

THE HUNGRY GENERATION 10

Coffee House Menu

Hot Coffee Tray	Per Cup	0 30
Hot Coffee Cream	,,	0 50
Cold Coffee	,,	0 30
Cold Coffee with Cream	,,	0 55
Infusion	,,	0 20
Sandwiches Per Plate		
Chicken Per Plate		
Mutton Per Plate		
Fish Per Plate		
Extras		
Extra 2 oz. Milk		0 13
Extra 1 oz. Cream		0 40
Extra 1 oz. Butter		0 25

Contributors

Utpal Kumar Basu
Arupratan Basu
Basudeva Das Gupta
Ashoke Chattopadhyay
Pradip Chowdhury
Amritatanay Gupta
Sayeed Mustafa Siraj
Moloy Roychowdhury
Shakti Chattopadhyay
&
Amit Sen

The object of Hungryalism (hungrealisme)

1. To never imitate the reality of Aristotle, but to take the unenamelled whoring reality by surprise under the genital of Art.
2. To let speechlessness burst into speech without breaking the silence.
3. To let loose a creative furore, in order, to undo the done-for world and start afresh from chaos.
4. To exploit every matrix of senses except that of a writer.
5. To disclose the belief that world and existence are justified only as an aesthetic phenomenon.
6. To accept all doubts and despairs rather than to be content to live with the sense made by others.
7. To lash-out against the values of the bilegged career-making animals.
8. To abjure all meretricious blandishment for the sake of absolute sincerity.
9. To stop writing and painting beyond the point of self-realisation.

হাংরি বুলেটিনের দুটো সংখ্যার প্রচ্ছদের ফ্যাকসিমিলি

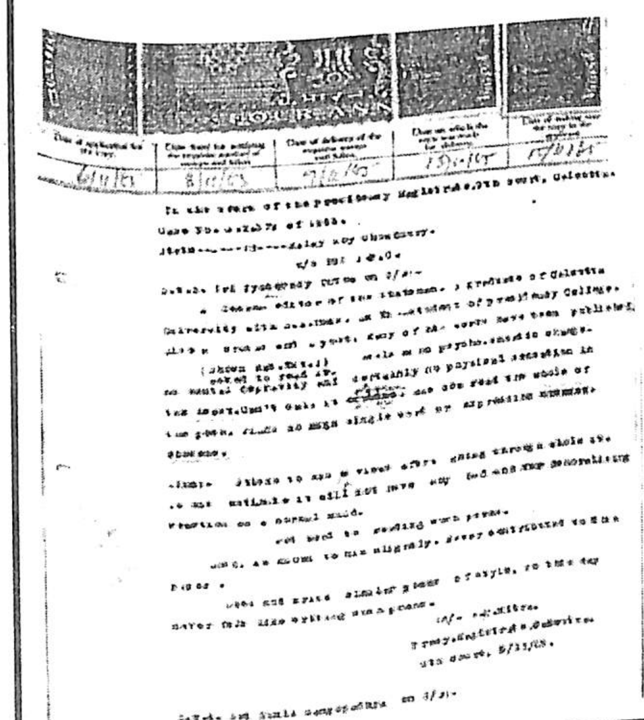

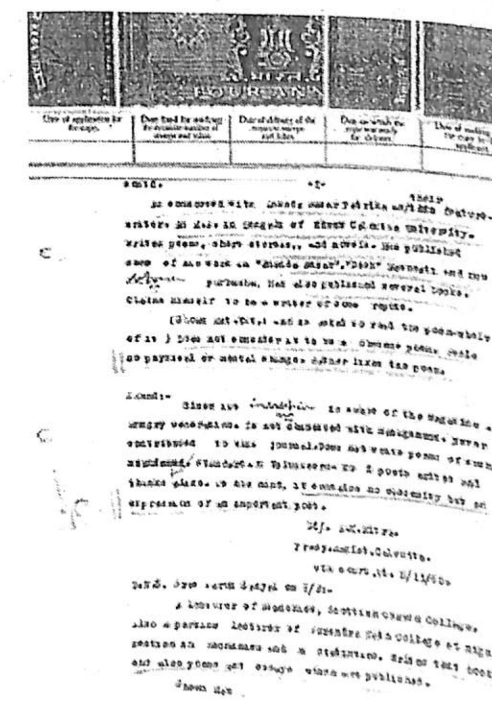

মলয় রায়চৌধুরীর পক্ষে সাক্ষী দেওয়া জ্যোতির্ময় দত্ত এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের বয়ান কপি।

CELEBRATING FIFTY YEARS
(1954-2004)

प्रो. के. सच्चिदानन्दन
सचिव

Prof. K. Satchidanandan
~~Secretary~~

साहित्य अकादेमी
रवीन्द्र भवन, 35 फ़ीरोज़शाह मार्ग, नई दिल्ली-110 001
तार : साहित्यकार दूरभाष : 2338 7064, 2338 6626
फैक्स : 091 - 11 - 2338 2428
ई-मेल : secy@ndb.vsnl.net.in

Sahitya Akademi
(National Academy of Letters)
Rabindra Bhavan, 35 Ferozeshah Road, New Delhi-110 001
Gram : Sahityakar Phone : 2338 7064, 2338 6626
Fax : 091 - 11 - 2338 2428
E-Mail : secy@ndb.vsnl.net.in
Website : http://www.sahitya-akademi.org

<u>Speed Post</u>

SA.61/03/TPW/

29 APRIL 2004

Dear Sri Malay Roy Choudhuri,

Hope you have already received my telegram.

I have much pleasure in confirming that your **SURYER SAPTAM ASVA (BENGALI)** has been selected for the Sahitya Akademi Translation Prize 2003. Please accept my heartiest congratulations.

May I request you to please send me immediately two copies of your latest photograph (along with the negative, if possible) and your detailed bio-data (in the enclosed format) for publicity purpose. A special function to give away the Translation Prizes will be held sometime in August 2004 at New Delhi and a detailed letter about the programme will follow.

With kind regards,

Yours sincerely,

(K. Satchidanandan)

Sri Malay Roy Choudhuri
166-A, Raipur Road
Letter Box Para
Naktala
Kolkata-700 047
Tel: 033-24113606

অনুবাদের জন্য মলয় রায়চৌধুরীকে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারে মনোনয়ন জানিয়ে চিঠি।

সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করলেন মলয় রায়চৌধুরী

মুক্তি ভট্টচট্টোপাধ্যায় : সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করলেন মলয় রায়চৌধুরী। এই বলিষ্ঠ ব্যতিক্রমী লেখককে আমরা যারা ভালোভাবে চিনি তারা কেউই এ খবরে বিস্মিত হইনি, বলা ভালো তা না হলেই যেন অবাক লাগতো। বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত ধ্যান ধারণাকে প্রবলভাবে ঝাঁকুনি দিয়ে যিনি নিজেকে সামনে এনেছিলেন তাঁর সাহিত্য আন্দোলন ঠিক ছিল না বেঠিক ছিল তা নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে। পৃথিবীর বহু দেশে নানাভাবে সাহিত্য আন্দোলন হয়েছে, বিতর্ক সেখানেও কম কিছু হয়নি। গ্রহণ বর্জনের প্রশ্ন নিয়ে ঝড়ও উঠেছে। এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা কিছু নেই। সাহিত্য গতিশীল এবং আধুনিক হয় এতে। মলয় রায়চৌধুরীও তাই চেয়েছিলেন বলে অনেকেই বিশ্বাস করেন। শুরু থেকেই প্রতিষ্ঠান-বিরোধী অবস্থানে নিজেকে আপোষহীন রাখার কারণেই কোন লোভ বা প্রত্যাশার জন্য নিজের মতাদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে সিঁড়িভাঙার খেলায় ব্যস্ত থাকতে হয়নি বলেই নিজের বোধ এবং প্রতিভাকে গভীর এবং [illegible] করে গেছেন আপন মনে। যশ অর্থ প্রতিষ্ঠা পুরস্কারের জন্যে দলেই বুদ্ধিজীবী-তকমা পাওয়ার প্রতিযোগিতায় তাঁকে উন্মত্ত হতে দেখা যায়নি, কাঠি-নাড়ার খেলাতেও তাঁকে ব্যস্ত থাকতে হয়নি। কোন প্রয়োজন বোধ করেননি এসবের। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের নির্লজ্জ [illegible] খেলায় অভিমানাহত হয়েছেন, পীড়িত বোধ করেছেন, দীর্ঘ দিন লেখা-লেখি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন বলেই সর্বভারতীয় পুরস্কার প্রত্যাখ্যানে তাঁর বলিষ্ঠতা এত উজ্জ্বলতা নিয়ে আমাদের সামনে হাজির হয়। যে কোন প্রতিষ্ঠান তাঁকে পেলে সন্তুষ্ট হতে পারত এ বিষয়ে সাহিত্যবোধ বুদ্ধি সম্পন্ন যে কোন মানুষেরই কোন সন্দেহ থাকার কথা নয়। বাঙালি সাহিত্যের বাজারি উৎপাদনের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে দিতে পারলে এবং প্রতিষ্ঠানের কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের বিনিময়ে নিজেকে বাজারি পণ্য হিসেবে ব্যবহারের জন্য বিক্রী করে দিতে পারলে তিনিও একজন বুদ্ধিজীবীচূড়ামণি হিসেবে বহু মঞ্চ আলোকিত করতে পারতেন। তিনি সে পথে হাঁটেননি, নিজের আলোয় তিনি ভণ্ডটাই আলোকিত যন্ত্রটা আমাদের অন্তর্করণের মুগ্ধ করতে পারে।

April 30, 2004

Prof K. Satchidanandan,
Secretary,
Sahitya Akademi,
Rabindra Bhavan,
35, Ferozeshah Road,
New Delhi

Dear Sir, Thanks for your telegram dated 30.4.2004 conveying that my translation work of Dharamveer Bharati's 'Suryer Saptam Asva' has been awarded the Sahitya Akademi Translation prize.

I am constrained to refuse this award. As a matter of principle I do not accept literary and cultural prizes, awards, lotteries, grants, donations, windfalls etc. They deprave sanity.

My decision to refuse the award is in no way to affront late Dharamveer Bharati, who was a great admirer of my work, and had supported me during my literary ordeals in 1960's when most of the Bengali intelligentia had conspired against the Hungryalist Movement. Your magazine, the 'Indian Literature' itself, had never bothered to write about this movement.

Sincerely,

Malay Roychoudhury
Kolkata-7000 47

মানসাই টাইমস্ ২০০৪, ১-৩১ মে প্রকাশিত পত্রিকায় মলয় রায়চৌধুরী
সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার প্রত্যাখানের চিঠির নমুনা